প্রকাশক : সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

প্রথম বাঙলা সংস্করণ
মার্চ—১৯৪৮

মুদ্রাকর : কালিপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস, ৮-ই ডেকার্স লেন,
কলিকাতা ১

পিতৃদেব

উপেন্দ্র কৃষ্ণ দত্তের

স্মৃতির উদ্দেশে

জন্ম—কলিকাতা, ভারতবর্ষ, ১৭ই অক্টোবর, ১৮৫৭
মৃত্যু—লেদারহেড, ইংলণ্ড, ১২ই মে, ১৯৩৮

যাঁহার কাছ হইতে পাইয়াছিলাম রাজনীতির
প্রথম পাঠ—ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম ভারতবর্ষের
মানুষ এবং মুক্তিকামী সংগ্রামী সমস্ত মানুষকে

প্রকাশকের নিবেদন

রজনী পাম দত্তের লেখা "আজিকার ভারত" (ইণ্ডিয়া টু-ডে) ইংরেজিতে একখানা বিরাট গ্রন্থ। বাঙলা অনুবাদ একত্রে ছাপাইলে তাহা অনেক বড় হইয়া যাইবে। সমগ্র অনুবাদের ছাপা শেষ হইতেও দীর্ঘ সময় লাগিবে। এই জন্য আমরা তিনভাগে গ্রন্থখানা প্রকাশ করিব। প্রথম ভাগ বাহির হইল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগেরও ছাপা সুরু হইয়াছে।

আমাদের ছাপানো পুস্তকের দাম আমরা অন্যদের তুলনায় কম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। এই পুস্তকের বেলায়ও তাহাই করিয়াছি।

সূচী

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতে বৃটিশ শাসন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'আজিকার ভারত' প্রথমে ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। বইটি ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ইংলণ্ডে এই বইয়ের যত কপি মজুত ছিল তাহার সবই বিমান-আক্রমণের ফলে নষ্ট হইয়া যায়। যুদ্ধজনিত অবস্থার দরুন ইহার পাণ্ডুলিপিও মার্কিন সংস্করণের জন্য আমেরিকায় গিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। কাজেই বইটি তাড়াতাড়ি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে এবং বহুদিন হইল একেবারেই পাওয়া যাইতেছিল না।

আজ 'পিপ্‌ল্‌স্‌ পাবলিশিং হাউস' উদ্যোগী হইয়া ভারতবর্ষে এই বইয়ের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা আমাকে বইয়ের পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের সুযোগও দিয়াছেন।

১৯৪০ সাল হইতে অনেক কিছুই ঘটিয়া গিয়াছে। সারা দুনিয়াতে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ভারত ও বৃটেনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কেও বিরাট পরিবর্ত্তন আজ ঘটিতে চলিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার দিন ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে। তাহা হইলেও স্বাধীনতা এখনও লাভ হয় নাই। এমন কি ১৯৪৬ সালের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের পরেও ভারতের উপর হইতে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে নাই, অবশ্য উহার রূপ পাল্টাইয়াছে বটে। সাম্রাজ্যবাদের সহিত শেষ নিষ্পত্তি হইতে এখনও বাকি আছে।

কাজেই, ভারতের সামনে প্রথম প্রশ্ন হইতেছে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন—১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে এই প্রশ্নের গুরুত্ব কমে নাই। কিন্তু ভারত যতই স্বাধীনতার কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছে, ততই আজিকার ভারতের অন্যান্য জটিল এবং বহুধাবিস্তৃত আর্থনীতিক সামাজিক রাজনৈতিক ও বহুজাতি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি তীব্রতর বেগে বিস্ফোরণের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; বিকাশের গতি রুদ্ধ হওয়াতে এই সব সমস্যা দীর্ঘকাল যাবৎ অবদমিত থাকার ফলেই আজ এই বিস্ফোরক রূপ ধারণ করিতেছে।

ঐতিহাসিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশেষ ভাবে দুই শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল আধুনিক ভারতের সমস্যাগুলি বুঝা যাইতে পারে। এইজন্যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং সাম্রাজ্যবাদ

ও জাতীয় আন্দোলনের দীর্ঘ বিরোধের ইতিহাস আলোচনা করা এখনও অবান্তর হইয়া পড়ে নাই। ইহার অনেকখানিই ইতিহাসের বিষয়ীভূত, কিন্তু বর্ত্তমানেও তাহার তাৎপর্য্য রহিয়াছে।

বর্ত্তমান সংস্করণে মূল গ্রন্থের সংশোধন করিয়া ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে। বৃটিশ মন্ত্রিমিশনের নূতন শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব, বৃটেন ও ভারতের সম্পর্ক এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তাহার প্রভাবের কথাও এই আলোচনার অন্তর্গত। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মূল ঐতিহাসিক বিবরণী এবং ভারতের মূল সমস্যাগুলির সাধারণ আলোচনার অনেকখানিই পূর্ব্বের ন্যায় রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংখ্যাসূচী ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার কাজে শ্রীযুত প্রেমসাগর গুপ্ত, শ্রীযুত অরুণ বসু ও শ্রীযুত এ. এস. আর. চারি প্রমুখ ভারতীয় বন্ধুগণ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, অনেক পরামর্শও তাঁহারা দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতেছি।

আশা করা যাক, ভারতে যে গভীর বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতেছে তাহার এবং ভারতের গণতান্ত্রিক অন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতি অদূর ভবিষ্যতে এমন গুরুতর পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে যে তাহার ফলে এই বই শুধু ঐতিহাসিক কৌতূহলের বিষয় হইয়া পড়িবে; কিন্তু সে-সময় এখনও আসে নাই।

জুলাই, ১৯৪৬ — **রজনী পাম দত্ত**

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধুনিক জগতে ভারতবর্ষের স্থান

"মানুষের ইতিহাসের গতিপথে যখন এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির সহিত রাজনৈতিক বন্ধন ছিন্ন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রকৃতির ঈশ্বরদত্ত অধিকার বলে পৃথিবীর অন্যান্য শক্তির মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র ও সমমর্য্যাদাসম্পন্ন স্থান অধিকার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন কেন যে তাহারা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল সেকথা মনুষ্যজাতির মতামতের প্রতি ভদ্রোচিত শ্রদ্ধার খাতিরে তাহাদের ঘোষণা করা উচিত।" *

ভারতের ভবিষ্যৎ কী হইবে ইহা আজ বিশ্বরাজনীতির অন্যতম এক বিরাট প্রশ্ন।

ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষ পৃথিবীর মনুষ্যগোষ্ঠীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ। দুই শতাব্দী ধরিয়া তাহারা বিদেশী শাসনের অধীন হইয়া আছে। আজ সেই বিদেশী শাসন শেষ হইতে চলিয়াছে।

বিশ্বের মানদণ্ডে বিচার করিয়া দেখিলেও আধুনিক জগতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রশস্ততম ও সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভিত্তি হইল ভারতবর্ষ। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই বিরাট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও ঐশ্বর্য্যের মর্ম্মস্থলে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র জাঁকিয়া বসিয়া আছে; আততায়ীর বেশে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র এই দেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত ইহার উপর অখণ্ড আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সুতীব্র ভাবে এই দেশকে শোষণ করিয়াছে। এই ব্যবস্থার অবসান শুধু যে পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষের সম্মুখে এক নূতন ভবিষ্যৎ উদ্ঘাটন করিয়া দিবে তাহাই নহে, ইহার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের মাপকাঠিতে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনও আসিবে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা ক্ষীণতর ও দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িবে এবং সারা পৃথিবীতে স্বাধীনতার পথে জনগণের অগ্রগতি

* আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

আরও দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে। স্বাধীন চীনের পাশাপাশি ভারতের মুক্তি এশিয়ার জনগণের এবং সকল ঔপনিবেশিক জনগণের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে।

আধুনিক বিশ্বের সকল সমস্যা ও বিবোধের স্বরূপই ভারতের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আধুনিক কালের বিজতার পাষাণভারে নিষ্পিষ্ট এক সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক সভ্যতা এখানে চাপা পড়িয়াছে, আপনার স্রোতধারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সেই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আধুনিক ব্যাঙ্ক-পুঁজির (ফিনান্স্ ক্যাপিটাল) শোষণের প্রকৃষ্ট বিকশিত রূপের সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করিতেছে আদিম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দারিদ্র্য ও দাসত্বের নিম্নতম স্তর। চিরস্থায়ী কৃষিসঙ্কট, দুর্ভিক্ষ, ঋণের দাসত্ব, জাতি ও জাতিচ্যুতির শৃঙ্খল, শিল্পগত অবাধ শোষণ, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্যের এমন ভয়ানক প্রভেদ যাহা দেশান্তরে চোখে পড়ে না, সামাজিক এবং ধর্ম্মসম্পর্কিত বিরোধ, শ্রেণীসংঘর্ষ, ভারতের ভিতরে আত্মপ্রকাশমান জাতীয় সমস্যা—এই সকলের মধ্যেই পরাধীন দেশের পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা ও নিরুদ্ধ বিকাশ অনেকাংশেই প্রতিফলিত হইতেছে। *বিদেশী শাসনের জন্য এই সমস্যাগুলি আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে; সাম্রাজ্যবাদী* শাসন হাত হইতে মুক্তি লাভের মূল সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে এই সব সমস্যাও আজ পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ এবং পরিস্থিতিকেও ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতবর্ষ আজ এক গুরুতর অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের যুগে উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। সেই বিপ্লবের প্রথম পদপাত শুরু হইবে বিদেশী শাসন হইতে মুক্তি এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে। কিন্তু এই আসন্ন মুক্তি বিরাট আভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং সামাজিক বিরোধের আত্মপ্রকাশের পথই উন্মুক্ত করিয়া দিবে। বহু শতাব্দীর বিদেশী শাসন ও নিরুদ্ধ অগ্রগতির ভিতর এই যে-সব সমস্যা জমিয়া উঠিয়াছে, আজ তাহাদের সমাধান একান্ত জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের জনসাধারণের সম্মুখে আজ জাতীয় এবং সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধনের বিরাট কর্ত্তব্য উপস্থিত।

১ স্বাধীনতার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ

ফাশিস্ট শক্তিবর্গের সহিত যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের জয়ের পর যে নূতন বিশ্ব-পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, তাহার ফলেই ভারতের মুক্তির প্রশ্ন বিশ্বরাজনীতির পুরোভাগে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাহার অনুগামী যে বৈপ্লবিক তরঙ্গ সারা দুনিয়ার উপর দিয়া বহিয়া যায় তাহাই অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও এক বিরাট পরিবর্ত্তনের যুগের সূচনা করিয়াছিল। ১৯১৯-২২ সালে এক শক্তিশালী গণসংগ্রামে ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাপী আর্থনীতিক সঙ্কটের পর ১৯৩০-৩৪ সালে আবার যে-গণআন্দোলন দেখা দিল, তাহার গতিবেগ ছিল আরও তীব্র। (এই আর্থনীতিক সঙ্কটের ফল ভারত মর্ম্মান্তিক ভাবেই ভোগ করে।) পর্য্যায়ক্রমে সংস্কার ও দমননীতির সাহায্যে বৃটিশ শাসন এই জাতীয় আন্দোলনকে রোধ করিতে চেষ্টা করে। ভবিষ্যৎ স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আসিল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার; কিন্তু ক্ষমতা সম্পর্কিত আসল অবস্থার কোনই অদল-বদল হইল না। এই সব শাসন-সংস্কারের ফলে ১৯৩৭ সালে এগারটি প্রদেশের মধ্যে আটটিতে জাতীয় কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু তাহাতে ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তির গতিরোধ তো হইলই না, বরং সেই অশান্তি যেন নূতন উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করিল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় দেখা গেল যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে এক তীব্র মুক্তি-সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কোনরূপ পরামর্শ করা দূরে থাক, লোক-দেখানো আলাপ-আলোচনা পর্য্যন্ত না করিয়াই ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে টানিয়া আনিয়া ফেলা হইল; জনসাধারণের সমর্থনের অপেক্ষা করা হইল না। যুদ্ধেব সময় এক ডিক্টেটরী শাসনব্যবস্থারও প্রবর্ত্তন করা হইল। ইহাতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানই আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার পর ভারতের মুক্তির প্রশ্ন আরও জরুরী হইয়া উঠে। সম্মিলিত জাতিবৃন্দ সরকারী ভাবেই ঘোষণা করে যে, "কে কোন ধরনের গভর্নমেণ্টের অধীনে থাকিবে তাহা বাছিয়া লইবার অধিকার প্রত্যেক জাতিরই আছে।" প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে এবারের যুদ্ধের তফাৎ এই যে, মিত্রপক্ষের পুরোভাগে যে চারিটি শক্তি ছিল তাহার মধ্যে যে কেবল বৃটেন ও আমেরিকার মতো দুইটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই ছিল তাহা নহে, তাহাদের ভিতর এমন দুইটি রাষ্ট্রও ছিল যাহারা সাম্রাজ্যবাদী নহে; তাহারা জাতীয়তাবাদী চীন ও সোশালিস্ট সোভিয়েট ইউনিয়ন। সারা বিশ্ব জুড়িয়া জনগণ যখন নিজের নিজের দেশের জাতীয় মুক্তির জন্য ফাশিজমের বিরুদ্ধে

শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে, তখন বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে ভারতের জনগণও যে পূর্ব্বাপেক্ষা তীব্রভাবে সেই জাতীয় মুক্তিরই দাবী করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। তখন তো বহু জাতিই এই সংগ্রামে যোগ দিয়াছে, ভারতের সৈনিকদেরও মুক্তির জন্যই প্রাণপাত করিবার জন্য আহ্বান জানানো হইয়াছে।

এশিয়ার যুদ্ধের বিশেষ অবস্থা এই তাগিদটাকে আরও বাড়াইয়া দেয়। যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন এতদিন আত্মঘাতী নির্ব্বুদ্ধিতার সহিত পররাজ্য আক্রমণে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে জাপানকে উৎসাহ ও সাহায্য দিয়া আসিতেছিল, এখন পার্ল হারবারে অভিযানের দুর্ব্বার অগ্রগতিতে তাহার ভিৎ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। এক রকম বিনা প্রতিরোধেই যখন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বড় বড় দেশগুলি আক্রমণকারীর সামনে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল, তখন প্রাচীন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার দেউলিয়াপনা ও অন্তঃসারশূন্যতা সকলেরই কাছে ধরা পড়িয়া গেল। বাহির হইতে আমদানী করা সৈন্যদের দ্বারা রাজ্য রক্ষার চেষ্টা সফল হইল না; আর এই সব এলাকার বিদেশী শাসকরাও দেশের জনসাধারণকে শত্রুর বিরুদ্ধে সমাবেশ করিতে আদৌ সক্ষম ছিল না।

ঔপনিবেশিক শাসননীতির এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইবার ফলে ভারতের জনসাধারণের মনে অত্যন্ত গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৃটিশের শক্তি যে অজেয়, এই রূপকথায় বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গেল। তখন জাপানী সৈন্যদল ভারতের সীমান্তে আসিয়া হানা দিতেছে। বাহিরে ভারতের জন্য কপট দরদের আড়ালে ভারত আক্রমণ ও দখলের উদ্দেশ্য লুকাইয়া রাখিয়া অক্ষশক্তিরা তাহাদের হাতের পুতুল হিসাবে প্রাক্তন কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষ বসু ও তাঁহার 'আজাদ হিন্দ ফৌজকে' খুব চালাকি করিয়াই ব্যবহার করিতে লাগিল। স্বাধীন ভারতের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রচার চালাইলে কোনো ফলই হইত না। কিন্তু ভারত পরাধীন দেশ বলিয়া এই প্রচারে যে অনিবার্য্য ভাবে কিছুটা ফল হইবে তাহা জানা কথা।

এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিল যাহাতে শুধু গণতন্ত্রের নীতির খাতিরেই নয়, ভারতরক্ষা ও মিত্রপক্ষের সমগ্র রণাঙ্গনের স্বার্থের খাতিরেও ভারতের দ্রুত মুক্তি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। ভারতের জাতীয় নেতারা প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বব্যাপী ফাশিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক জনসাধারণের স্বার্থের সহিত ভারতের স্বার্থ অভিন্ন। বৃটেনের শাসকেরা যখন ফাশিস্ট আক্রমণকে উস্কাইয়া দিতেছিলেন,

সে-আক্রমণে সাহায্য করিতেছিলেন, তখন হইতেই ভারতীয় নেতারা ফাশিজমকে সমর্থন করার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা ধরিতে পারিয়াছিলেন যে, অক্ষশক্তির সহিত মিত্রপক্ষের এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের ভাগ্য জড়িত হইয়া আছে সেই পক্ষের জয়ের সহিত যে-পক্ষে রহিয়াছে জাতীয়তাবাদী চীন, সোশালিস্ট সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ইওরোপের গণতান্ত্রিক মুক্তি-আন্দোলন ; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ফাশি-জমের পরাজয়ের উপরই ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তাঁহারা এক দাবী জানাইলেন। তাহাদের সে-দাবী স্তায্য। তাঁহারা বলিলেন—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। মিত্রপক্ষের সহিত স্বেচ্ছায় যাহাতে ভারত যোগ দিতে পারে, তাহার জন্ম ভারতের জনসাধারণের সকল শক্তি সমাবেশ কল্পে পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন এক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা চাই। এই দাবী মিত্রপক্ষের স্বার্থের অনুকূল। মিত্রপক্ষীয় সকল দেশের গণতান্ত্রিক জনমতই যে কেবল এই দাবী সমর্থন করিল তাহা নহে, বৃটেনের মিত্রজাতিদের সরকারী কর্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত এই দাবী সমর্থন করেন। সমর্থনকারীদের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মার্শাল চিয়াং কাইশেক সমধিক উল্লেখযোগ্য।

অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষেও ভারতের স্বাধীনতা মিলিল না। বৃটেনে তখন রক্ষণশীলরাই ক্ষমতার আসনে গদীয়ান। ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যেকটি প্রস্তাবের তাহারা বিরোধিতা করিয়াছে। যুদ্ধের সময়টুকুর জন্ম সাময়িক আপোসে ভারতের জননেতাদের হাতে ক্ষমতা যদি চলিয়া যায় সেইজন্ম তাহারা সাময়িক আপোসেরও বিরোধিতা করিয়াছে। চার্চিল তো প্রকাশ্য ভাবেই বলিয়া দিয়াছিলেন, চোখের সামনে বৃটিশ সাম্রাজ্য নয়-ছয় হইয়া যাইবে আর তিনি তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিবেন এজন্ম তিনি প্রধান মন্ত্রী হন নাই। চরম বিপদ ও দুর্দ্দশার দিনেও চার্চিলের এই কথাই বৃটিশের নীতিকে পরিচালিত করিয়াছে। ১৯৪২ সালে ক্রিপ্‌স্‌-আলোচনা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই অবস্থায় যে-সঙ্কট দেখা দেয়, তাহাই জাতীয় আন্দোলনের ভিতর হতাশা সৃষ্টি করে, আগস্ট-প্রস্তাবোত্তর বিপর্য্যয়ের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ভারতের জাতীয় নেতারা কারারুদ্ধ হন। তারপর ইতস্তত যে-আন্দোলন ও হাঙ্গামা দেখা দেয়, তাহা সহজেই দমন করিয়া ফেলা হয়।

যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও দেখা গেল যে ভারত পরাধীনই পড়িয়া আছে, এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেখা দিয়াছে অচল অবস্থা।

কিন্তু ফাশিজমের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়ে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। ১৯১৭ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যত আঘাত হানা হইয়াছে, গত যুদ্ধে ফাশিস্ট শক্তিদের পরাজয় ও পূর্ণ উচ্ছেদ তাহার মধ্যে তীব্রতম আঘাত রূপেই প্রতিপন্ন হয়। সকল দেশেই গণ-আন্দোলনের অগ্রগতি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। সাম্রাজ্যবাদের শক্তি প্রভূত পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া গেল। জার্মান ইতালী ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব পৃথিবীর মানচিত্র হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে রহিয়াছে কেবল বৃটেন ও আমেরিকা, আর তাহার সহিত লেজুড় হিসাবে আছে ফ্রান্স বেলজিয়াম হল্যাণ্ড ও পর্তুগালের ছোট-খাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। ইওরোপে যে সমস্ত রক্ষণশীল গভর্নমেণ্ট ফাশিজমের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বা তাহার সহিত হাত মিলাইয়াছিল, তাহাদের হটাইয়া দিয়া বিভিন্ন দেশে এখন নূতন গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট চালু হইয়াছে। বৃটেনে টোরি রক্ষণশীলেরা নির্ব্বাচনে মর্ম্মান্তিক ভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। টোরি গভর্নমেণ্টের বদলে এই প্রথম সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-গভর্নমেণ্ট কায়েম হইয়াছে। এদিকে সারা এশিয়া জুড়িয়া ঔপনিবেশিক মুক্তি-আন্দোলন জোর কদমে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে; ইন্দোনেশীয় গণতন্ত্র ইঙ্গ-ডাচ সাম্রাজ্যবাদের সামরিক আক্রমণ ও তাহাদের জাপানী সৈন্যদলের আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া বাঁচিয়া রহিল। ভারতবর্ষের ভিতরেও স্বাধীনতার জন্য সকল মানুষের দাবী এবং জাতীয় বিদ্রোহের আন্দোলন ১৯৪৫-৪৬ সালের শীতকালে কূল ছাপাইয়া উঠিল। সে-আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান জনতার মিলিত শোভাযাত্রার মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠিল, রূপায়িত হইয়া উঠিল সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে জাতীয় বিদ্রোহের সম্প্রসারণের ভিতর।

এই পরিস্থিতির দরুন নূতন শ্রমিক-গভর্নমেণ্টের নেতৃত্বে পরিচালিত বৃটিশ নীতি তাড়াতাড়ি মোড় ফিরিতে বাধ্য হইল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রমিকদলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লি ভারতে মন্ত্রিমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। ১৫ই মার্চ মন্ত্রিমিশনের ভারতযাত্রা উপলক্ষ্যে মিঃ এট্‌লি বলিলেন:

> "বর্তমান অবস্থায় পুরাতন যুগের কোনো সূত্র বা নীতি প্রয়োগ করিয়া কোনো কাজ হইবে না। ১৯৪৬ সালের উত্তেজনা আর ১৯২০ বা ১৯৩০ এমন কি ১৯৪২ সালের উত্তেজনা এক রকম নয়।...

"একটা বিরাট যুদ্ধ জনমতের গতি ও বেগ যেমন বাড়াইয়া দেয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। গত দুই যুদ্ধের মধ্যকালীন যুগের প্রথম দিকে যিনিই এই প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন তিনিই জানেন যে, ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের উপর ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শান্তির সময় যে-স্রোতধারা অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে অগ্রসর হয়, যুদ্ধের সময় এবং বিশেষ করিয়া যুদ্ধের অব্যবহিত পরে তাহারই গতি অত্যন্ত দ্রুত হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই যে যুদ্ধের সময় সেই তরঙ্গের গতি কিছুটা রুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমানে জাতীয়তাবোধের তরঙ্গ ভারতে ও এশিয়ার সর্ব্বত্র যে অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।......

"ভবিষ্যতে জগৎসভায় ভারতের কি অবস্থা বা আসন হইবে তাহা ভারতকেই বাছিয়া লইতে হইবে। জাতিসঙ্ঘ বা কমনওয়েলথের ভিতর দিয়া হয়তো মিলন আসিতে পারে, কিন্তু সারা বিশ্বে যে-সব ঘটনা ঘটিতেছে তাহাতে অংশ গ্রহণ না করিয়া কোনো মহান জাতি কেবল একা একাই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

"আমি আশা করি যে ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতরেই থাকিয়া যাইবে। ইহাতে যে সে অনেক সুবিধা পাইবে সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কিন্তু নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই তাহাকে একাজ করিতে হইবে। বৃটিশ কমনওয়েলথ ও সাম্রাজ্য বাহিরের জবরদস্তির শিকল দিয়া গাঁথা নহে। আমাদের সঙ্ঘ স্বাধীন জাতিবর্গের স্বাধীন সংগঠন।

"অন্যপক্ষে ভারত যদি স্বাধীনতা বাছিয়া লয়—এবং আমাদের মতে সে অধিকার তাহার আছে—তখন সে-পরিবর্ত্তন যত দূর সম্ভব সহজে ও নির্বিঘ্নে হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করাই আমাদের কাজ হইবে।"

'স্বাধীনতা'ও যে ভারতের লক্ষ্য হইতে পারে সরকারী ভাবে বৃটিশের মুখে এই কথাটির প্রথম উচ্চারণ সকলেই লক্ষ্য করিলেন।

বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবের পর মন্ত্রিমিশনকে ভারতে পাঠাইবার অর্থই যে স্বাধীনতা—এই সহজ ধারণা ভারতে ও ভারতের বাহিরেও অনেক মহলে ছড়াইয়া পড়িলেও—সে-ধারণা সময়োচিত হয় নাই। মন্ত্রিমিশনের আলাপ আলোচনার ইতিহাস এবং পরবর্ত্তী কালের শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবগুলি লইয়া পরে

আলোচনা করা হইবে। এই আলাপ-আলোচনার বিধিব্যবস্থার ফলাফল কেবল বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে ধরা পড়িবে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে বোধ হয় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে এই সমস্ত প্রস্তাব ভারতের স্বাধীনতার সূচনা নহে, শাসনতান্ত্রিক আপোসের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘকাল ধরিয়া যে-আয়োজন করিয়া আসিয়াছে উহা আসলে সেই চেষ্টারই শেষ প্রকাশ মাত্র।

১৯৪৬ সালে ভারত এখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই অংশ হইয়া আছে। ভবিষ্যতে ইচ্ছা হইলে স্বাধীনতা বাছিয়া লইবার জন্য কথার কথা হিসাবে যে অধিকারটুকু তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, রাষ্ট্রগঠন-পরিষদের পূর্ব্বনির্দ্ধারিত গড়ন ও কার্য্যক্রম তাহাকেও কিন্তু দোষদুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই রাষ্ট্রগঠন-পরিষদ প্রতিনিধিত্বমূলক নহে, অথচ শেষ অধিকারটুকু কিন্তু ইহারই হাতে।

তাই আগামী কালের কিছু দিন ধরিয়া হয়তো সাম্রাজ্যবাদের জীবনের মেয়াদবৃদ্ধিটাই আমাদের চোখে পড়িবে, হয়তো নূতন কোনো রূপে সফল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দিকটাই দেখিতে পাইব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম আজও জয়যুক্ত হয় নাই।

কিন্তু ঐতিহাসিক অগ্রগতির পূর্ণ তরঙ্গ যে আজ ভারতের স্বাধীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, সেই পূর্ণ স্বাধীনতা যে অদূর ভবিষ্যতেই করায়ত্ত হইবে—ইহাতে আজ কাহারও কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আজিকার ভারতকে বিচার করিয়া দেখিবার সময় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শেষ দিন কয়টি, সেই শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসের ফলাফল এবং ভারতীয় জনগণের অভ্যুত্থান ও অগ্রগতি আলোচনার সময় এই পটভূমি স্মরণ রাখিতে হইবে।

২। সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের ও শাসনের প্রধান ভিত্তি হইয়া আছে।

ভারতবর্ষের আয়তন হইল ১, ৮০৮, ৬৭৯ বর্গ মাইল, অর্থাৎ বৃটিশ দ্বীপসমূহের আয়তনের ১৫ গুণ এবং গ্রেট বৃটেনের আয়তনের ২০ গুণ। গত ১৯৪১ সালের আদমশুমারির সময় ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ; হিসাব মতো ইহা এখন ৪০ কোটির কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়া থাকিতে পারে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সমগ্র মানবজাতির জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ।

ভারতবর্ষের ৪০ কোটি মানুষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের জনসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগ, সাগরপারের বৃটিশ সাম্রাজ্যের জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের চার ভাগ, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন উপনিবেশগুলির লোকসংখ্যার দশ ভাগের নয় ভাগ।

গত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার আটটি প্রধান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ১৯৩৮ সালে বৃটিশের অধীন ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বিশ্বের সমস্ত উপনিবেশের জনসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও অধিক, এবং ফরাসী জাপানী ওলন্দাজ মার্কিন বেলজিয়ান ইতালীয় ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্য অর্থাৎ পৃথিবীর বাকি সমস্ত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সমবেত লোকসংখ্যার দেড় গুণেরও অধিক।

সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ যে কেবল বৃহত্তম তাহাই নহে, সাম্রাজ্যবাদী কর্ত্তৃত্ব ও শোষণ এখানে সবচেয়ে বেশী দিন ধরিয়া বহু বংশপরম্পরাক্রমে চলিতেছে। তাই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার কার্য্যক্রম ও ফলাফলের সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখানেই দেখিতে পওয়া যাইবে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তি ভারতবর্ষ ও তাহার ঐশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের প্রচেষ্টায় প্রথম ব্রতী হয়। ভারতবর্ষে আসিবার নূতন জলপথ খুঁজিয়া বাহির করিতে গিয়াই তাহারা পথ ভুলিয়া আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া পৌঁছে। কেবল শেষ দিকেই না আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া চীন ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে তাহাদের সম্প্রসারণ-নীতি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষ যে কি করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল, তাহা মানচিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে।

বিরাট ভারত মহাসাগরের উপর আধিপত্যের কেন্দ্রস্থল হইল ভারতবর্ষ। মহাসাগরের পশ্চিমে আছে পারস্য প্রণালী, নূতন মধ্য-প্রাচ্যসাম্রাজ; এবং আরব দেশ; তারপর লোহিত সাগর ও মিশর, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে সমগ্র আফ্রিকা; পূর্ব্বে আছে ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ; দক্ষিণ-পূর্ব্বে অস্ট্রেলিয়া; তারপর রহিয়াছে সিঙ্গাপুরের ভিতর দিয়া এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ব্রহ্ম-ইউনান পথের ভিতর দিয়া চীনে যাইবার পথ।

ভারতের উত্তরে রহিয়াছে দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের প্রাচীর। (এক উত্তর-পশ্চিম ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়া ইহা ভেদ করিয়া অভিযান চলিবে না)। সাগরের উপর

আধিপত্যের ভৌগোলিক সুবিধাও ভারতের আছে। কাজেই ভারতবর্ষ এই সমস্ত অঞ্চলে শাসনের কেন্দ্রীয় দুর্গ ও ঘাঁটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিকে আবার ভারতবর্ষ নিজেই পরম ঐশ্বর্য্যের উৎস, শোষণ চালাইবার এমন স্থানও আর নাই।

চার শতাব্দীরও আগে ১৫০০ সালে কালিকটে পর্তুগীজদের কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং ১৫০৬ সালে গোয়া বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও ইওরোপীয় পুঁজিবাদীরা মাথা গলাইল। বৃটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাচ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনের তারিখ ১৬০২ সাল; ১৬৬৪ সালে ফরাসী ইস্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হয়। দেশ বিজয়ের প্রথম ঘাঁটি হিসাবে যে-সব ব্যবসা-বাণিজ্যের কুঠি বৃটিশরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেগুলি ছাড়িয়া দিলে এদেশের উপর সরাসরি ভাবে বৃটিশ শাসন আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে। চিরাচরিত প্রথা মতো ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধকে ভারতে বৃটিশ শাসনের আরম্ভ বলিয়া ধরিলেও এখানে বৃটিশ সাম্রাজ্য দুই শত বছর ধরিয়া চলিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতকে জয় করার ফলে ইওরোপে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ লাভ ও বৃটিশের বিশ্বজোড়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অবলম্বন গড়িয়া উঠে, অবলম্বন গড়িয়া উঠে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের পুরা কাঠামোর। দুই শতাব্দী ধরিয়া ভারতের উপর প্রভুত্বের ভিত্তিতে ইওরোপের ইতিহাস যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, সে-কথাটা ঠিকভাবে সব সময় বিচার করিয়া দেখা হয় না। স্পেন ও পর্তুগাল, হলাণ্ড ফ্রান্স রুশিয়া ও জার্মানীর সহিত বৃটেনের পর-পর যে-যুদ্ধ চলিয়াছে তাহারই অন্তরালে রহিয়াছে ভারতে আসিবার পথ ও ভারতে আধিপত্য বিস্তারের কাহিনী। ইংলণ্ডের ভিতরকার রাজনীতির আড়ালে এই আধিপত্য বিস্তারের চালই চলিয়াছে; ইংলণ্ডে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো পরম প্রয়াস ও সঙ্কটের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূলেও ঐ একই খেলা।

ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্ম্মস্থল বলিয়া বহুদিন আগেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভারতে ক্রমপ্রসারমুখী সাম্রাজ্যবাদের শেষ কৃতী রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন। (বড়লাট হইবার পূর্ব্বে) তিনিই ১৮৯৪ সালে লেখেন :

"স্য টক্‌ভিল ঠিকই বলিয়াছিলেন যে ভারত বিজয় ও শাসনের কীর্ত্তিই ইংলণ্ডকে বিশ্বের জনমতের সম্মুখে তাহার আসন রচনা করিয়া দিয়াছে। এশিয়া হইতে পাওয়া বৃটেনের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সম্পদের উপর ভিত্তির্ষ করিয়াইবৃটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। এশিয়া মহাদেশের বুকের মাঝখানে ইংলণ্ড বসিয়া আছে ঠিক সেই সিংহাসনটির উপরে, যাহা চিরকাল ধরিয়া প্রাচ্যকে শাসন করিয়া আসিয়াছে। স্থলভূমি ও সাগর উভয়ের উপরই তাহার শাসনদণ্ড প্রসারিত। ঈশ্বরের ন্যায় তাহার হাতে ত্রিদণ্ড, এবং রাজার ন্যায় মুকুট তাহার মাথার উপর।"*

চারি বৎসর পরে ১৮৯৮ সালে সাম্রাজ্যবাদের এই প্রমত্ত গাথাকার নূতন সুর ধরিলেন :

"ভারতবর্ষ আমাদের কেন্দ্রস্থল।...আমাদের অধিকারভুক্ত অঞ্চলের অন্য কোনো অংশ হারাইলেও আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ভারতবর্ষ হাত হইতে চলিয়া গেলে আমাদের সাম্রাজ্যের সূর্য্যও অস্তমিত হইয়া যাইবে।"

এই বহুল উদ্ধৃত সাড়ম্বর বাকবিস্তারের ভিতরেই কিন্তু ঘনায়মান বিনাশের আশঙ্কা প্রস্ফুট হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বৃটেনের কাছে এবং বৃটিশ ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধি ও গঠনের পাশে ভারতের আর্থিক ও আর্থনীতিক গুরুত্ব ইতিহাসের পাতায় খুবই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। আজ তাহা কমিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু তবু আজও উহার প্রভাব কিছু কম নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় বাজারের পাঁচ ভাগের চার ভাগেরও বেশী ছিল ইংরাজের একচেটিয়া দখলে; এমন কি ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত ভারতীয় বাজারের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল ইংরাজের মুঠির মধ্যে। আজ তাহার অবসান হইয়াছে, সে-দখল আর ফিরিয়াও আসিবে না। ১৯২৯ সাল হইতে ভারতবর্ষ আর বৃটিশ পণ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাজার নহে; ১৯৩৮ সালে উহা তৃতীয় স্থানে নামিয়া আসিয়াছে। তবু কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ের বেশীর ভাগই এখনও বৃটিশের হাতেই আছে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের হিসাব মতো ১৯৩৩ সালে ভারতে বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ হইল একশত কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ বৃটেনের বাহিরে বৃটেনের যে-মূলধন খাটিতেছে তাহার চার ভাগের এক ভাগ। উহার পরিমাণ আজ কমিয়াছে, অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

* মাননীয় জি, এন, কার্জন : "দূর প্রাচ্যের সমস্যা", ১৮৯৪, ৪১৯ পৃঃ

মধ্যে ও তাহার পরে এই পরিবর্ত্তনের ফলাফল কতদূর কি হইয়াছে তাহা নিরূপণের জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো চেষ্টা এখনও করা হয় নাই। যুদ্ধের চাপে অন্যদেশে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন ব্যাপক ভাবে হাতছাড়া হইয়া যায়, অথচ ভারতে সেই মূলধন সযত্নে আঁকড়াইয়া রাখা হইয়াছিল, একথাও লক্ষ্যণীয়। বর্ত্তমানে বৃটেনের মোট যে-মূলধন এখানে খাটিতেছে, কাগজে-কলমের হিসাব মতো যুদ্ধের সময় টাকা না দিয়া ভারত হইতে লওয়া মালপত্রের দরুন জমা স্টার্লিং ব্যালান্সের মূল্য তাহার চেয়ে বেশী। কিন্তু এই স্টার্লিং ব্যালান্সের ভবিষ্যৎ ভাগ্য এখন পর্য্যন্ত অনির্দ্ধারিতই রহিয়া গিয়াছে। ভারত হইতে কর হিসাবে কোন-না-কোন উপায়ে যাহা বছর বছর বৃটেনে চালান দেওয়া হয়, তাহার পরিমাণ হইল পনের কোটি পাউণ্ড। (১৯২১-২২ সালের হিসাব অনুযায়ী শাহ এবং খাম্বাটা, 'ওয়েলথ্ এ্যাণ্ড ট্যাক্সেবল্ কেপাসিটি অফ্ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ২৩৪)। অর্থাৎ উহা ঐ বৎসরের পূরা ভারতীয় বাজেটের চাইতে পরিমাণে বেশী। এই মোট পাওনা বৃটেনের জনসংখ্যার প্রতিটি লোক পিছু বাৎসরিক তিন পাউণ্ডের বেশী; ইহার পরিমাণ ঐ সময়ে বৃটেনে যাহারা অতিরিক্ত ট্যাক্স দিত তাহাদের প্রত্যেকের মাথাপিছু বাৎসরিক প্রায় সতের শ' পাউণ্ড।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে ভারতের সামরিক গুরুত্বও কম নহে। এখান হইতেই সাম্রাজ্য প্রসারের কাজ বহুলাংশে চালানো হইয়াছে। সাগরপারে অসংখ্য বার যুদ্ধ ও অভিযান চালাইবার কাজে ভারতকে অর্থ ও সৈন্য সম্পদের উৎসরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সমরনীতির দিক দিয়াও (যেমন ভূমধ্য সাগর, সুয়েজ খাল, লোহিত সাগর, পারস্য প্রণালী, মধ্য প্রাচ্যের সাম্রাজ্য এবং সিঙ্গাপুর নিয়ন্ত্রণে) ভারতের উপর চোখ রাখিয়াই ইংরাজের সামরিক কলাকৌশল অবিরত পরিচালিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই সামরিক গুরুত্ব যে কতখানি তাহা আবার প্রমাণিত হইল।

৩। ভারতে সাম্রাজ্যবাদের দেউলিয়া রূপ

ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফলাফলটা কি দাঁড়াইয়াছে?

বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষকের সামাজিক এবং রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যতটা পার্থক্যই থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে কিন্তু দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সকলেই একমত। দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসন চলিবার পরেও

> "কিন্তু এই সব পরিবর্ত্তন ভারত ও পাশ্চাত্য জগৎকে অতি বিচিত্র ভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে ভারত ক্রমেই কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিয়া তাহা রফ্‌তানি করিয়া চলিয়াছে এবং তাহার বদলে কাপড়চোপড় লোহা ও ইস্পাতের জিনিস, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য নানাবিধ জিনিস আমদানী করিয়াছে। তাহার উপর ভারতের জনসংখ্যা জিনিসপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই মাথাপিছু যে খুব বেশী জিনিস এখন উৎপাদন হইতেছে এমন কথা বলা চলে না। এই সব বিষয় হইতে এই ধারণাই সমর্থিত হয় যে, ভারতবর্ষের আর্থনীতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ছিল।
>
> "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দেশের জনগণের আর্থনীতিক সমৃদ্ধির উপর বৃটিশ শাসনের ফলাফল ছিল নিঃসন্দেহে হতাশাজনক।" *

মাঝে মাঝে বলা হইয়া থাকে যে আধুনিক কালে অবস্থা পাল্টাইয়া গিয়াছে, এখন শিল্পবিস্তার বেশ ভালো ভাবেই চলিতেছে; কিন্তু এই সময়ের ভিতরেই বা কি হইয়াছে? উপরোক্ত বিশেষজ্ঞ ঐ গ্রন্থেই ১৯৩১ সালের আদমশুমারির হিসাবপত্র ঘাঁটিয়া একটা নেতিবাচক সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন:

> "এই সব হিসাবপত্রের সহিত দ্রুতবর্দ্ধমান শিল্পায়নের কোনও চিত্রকে ঠিক মিলাইয়া দেওয়া শক্ত। কৃষির সহিত তুলনা করিলে যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি যে কেবল অকিঞ্চিৎকর তাহাই নহে, যে-কোনো উন্নত দেশের পক্ষে যে-সমস্ত জিনিস একেবারে অপরিহার্য্য তাহার অনেক কিছুর জন্যই ভারতকে আজও পর্য্যন্ত বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। সুসঙ্গত আর্থনীতিক জীবন এখনও এখানে আয়ত্ত হয় নাই, এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এখনও শোচনীয় ভাবে নিম্নস্তরেই রহিয়া গিয়াছে।"

প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই অসহ ও অবর্ণনীয় দারিদ্র্য কেন? এই প্রহেলিকার কৈফিয়ৎটা কিভাবে দেওয়া যায়? সাধারণ ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় এখানে এই দারিদ্র্য অনেক বেশি। শিল্পবিজ্ঞানের দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী এবং সমধিক শিল্পোন্নত দেশ দুই শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া শাসন চালাইবার পরেও এখানে এই যে স্ববিরোধী প্রহেলিকা দেখা যাইতেছে তাহার কৈফিয়ৎ কী?

* ভি. এ্যানস্টে: 'ভারতের আর্থনীতিক বিকাশ,' ৩য় সংস্করণ, ১৯৩৬, ভূমিকা, পৃঃ ৫
† ঐ, পৃঃ ৮

এই সমস্যা বুঝিতে গেলে ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদের আসল চালচলন কি তাহা আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে জানা আবশ্যক। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে বৃটিশ অভিযানের সময় ব্যাপক ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও বৃটিশ শাসনের জয় হইয়াছিল কেবল বুর্জোয়া বৃটিশ বিজেতার শাসনব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চেয়ে ভালো ছিল বলিয়াই।

আজ তেমনই আবার **ভারতের উৎপাদনের উৎসগুলিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে পারে নাই বলিয়াই তাহার মরণডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে।**

ভারতবর্ষের পুরাতন ব্যবস্থার দেউলিয়াপনা এবং নূতন ব্যবস্থার জন্ম—এই দুইয়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিব্যক্তি দেখিতে পাই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান বিদ্রোহে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতের রঙ্গমঞ্চে এই বিদ্রোহই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

পুরাপুরি একটা অদল-বদল হইবার মতো অবস্থা যে ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে ক্ষয়খিন্ন সাম্রাজ্যবাদের জড়তা দূর করিয়া এই নূতন যুগ উহার বদলে জনসাধারণের আধুনিক উন্নতিশীল ভারত রচনা করিবে।

৪। ভারতের জাগরণ

এই অধোমুখী দেউলিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধেই ভারতের জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। সে-বিদ্রোহ সর্ব্বদাই বৃদ্ধি পাইতেছে; সে-বিদ্রোহ হইল সার্ব্বজনীন বিদ্রোহ।

শতাব্দীকাল ধরিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলন * বহু স্তর ও পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ হইতে আন্দোলনের আধুনিক রূপের সূচনা হয়। আইনসম্মত ও বে-আইনী, নিয়মতান্ত্রিক ও

* নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ যে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে সেই সংগ্রামের ঐক্য বুঝাইবার জন্যই 'ভারতীয় জাতি' ও 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন' এই কথা দুইটি এখানে ও পরে ব্যবহার করা হইয়াছে। স্বাধীন ভারত ভবিষ্যতে কী রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করিবে, এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া সে-বিষয়ে কোনো রায় দেওয়া হয় নাই। ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের বহুজাতিক রূপের যে-চিহ্ন দেখা যাইতেছে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যাহা তাৎপর্য্যপূর্ণ হইতে পারে, সে সম্পর্কেও কোনো মতামত ইহাতে প্রকাশ করা হয় নাই। এই বিশেষ প্রশ্নটি পরে বিবেচনা করা হইবে।

বৈপ্লবিক—বহু রূপে এই আন্দোলন বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহার ভিতর বিভিন্ন স্রোতধারা আসিয়া মিশিয়াছে—রক্ষণশীল ও চরমপন্থী মনোভাব, এমন কি বর্ত্তমান যুগে সোশালিস্ট এবং কমিউনিস্ট ভাবের তরঙ্গও ইহার মধ্যে আছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও আইনসম্মত আন্দোলনের দাবী ছিল সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর ভিতরেই সাদামাটা সংস্কার মাত্র। সংগঠিত আন্দোলন তখন কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার পর হইতে আন্দোলনের লক্ষ্য ও পরিধি ক্রমাগতই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতীয় আন্দোলন পূর্ণ গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করিল, জাতীয় দাবীও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে গিয়া পৌছিল। ১৯২৯ সাল হইতে আবার সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে জানাইয়া দেওয়া হইতে থাকে যে, ভারতের দাবী হইতেছে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক ছেদ।

ভারতবর্ষ জাগিতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে-ভারত বিভিন্ন বিজেতার অভিযানের সম্মুখে বলির পশুর ন্যায় দাঁড়াইয়াছে, আজ সেই ভারতই স্বাধীন জাতি হিসাবে জগতের রঙ্গমঞ্চে নিজের ভূমিকা অভিনয়ের দায়িত্ব লইয়া স্বাধীন জীবন লাভের জন্য জাগিয়া উঠিতেছে। আমাদের জীবনকালেই এই জাগরণ দ্রুত বেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, গত পঁচিশ বৎসরে এক নূতন ভারত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে ভারতকে এখনও যত বাধাই অতিক্রম করিতে হউক না কেন, আজ জগতে সকলেই স্বীকার করে যে স্বাধীনতার পথে ভারতের অগ্রগতি অদূর ভবিষ্যতে সাফল্য লাভ করিতে চলিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই আবার পরাধীন জাতি-সমূহের উপর আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রধান স্তম্ভটিও ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

এতদিন ধরিয়া বৃটিশ কূটনীতি তাহার তূণের সমস্ত তীর দিয়াই জাতীয় আন্দোলনকে প্রতিহত ও ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতে চাহিয়াছে, তাহাকে দোষদুষ্ট করিয়া দিতে চাহিয়াছে, তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। বৃটিশ কূটনীতি এজন্য কখনও বা চরম দমননীতি প্রয়োগ করিয়াছে, কখনও বা কিছু শাসনতান্ত্রিক সুবিধা দিয়াছে; কখনও আভ্যন্তরীণ বিভেদের সুযোগ লইয়া সুকৌশলে চাল চালিয়াছে, আবার কখনও বা আন্দোলনের উর্দ্ধতন নেতৃবর্গের কাছে আসিয়া রফা করিতে চাহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী নীতির সর্ব্বাপেক্ষা সুনিপুণ অভিব্যক্তি হইতেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি; ইহার অভিজ্ঞতাও

সবচেয়ে বেশী, অবস্থা ও সময়ের সহিত ইহা নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেও পটু। বলপ্রয়োগের সহিত সংস্কারের খাদ মিশাইয়া, সকল উপায়ে এই নীতি নূতন অবস্থার সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে, উপরে-উপরে এমন সব সুবিধা দিয়াছে যাহার ফল মনে হয় সুদূরপ্রসারী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহা নিজের আসল ক্ষমতাটুকু বজায় রাখিয়া দিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোর ভিতরে থাকিয়াও ঔপনিবেশিক জাতি যে ক্রমে-ক্রমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে—এই উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী ও সংস্কারপন্থী মতবাদকে এখানে হাতে-কলমে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই বিরোধের চূড়ান্ত ফলাফল ইতিহাসই নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। তাহা শুধু ভারতের জনসাধারণের ভবিষ্যতের দিক দিয়া নহে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের দিক দিয়াও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইবে।

গত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসে দেখা যায় যে, নূতন অবস্থার সহিত মানাইয়া চলিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ হাজারো রকমে চেষ্টা করিয়াছে, কখনও দমননীতি আবার কখনও বা খানিকটা ছাড়িয়া দিবার পদ্ধতির আশ্রয় খুঁজিয়াছে। এই সব কিছুই কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গকে রোধ করিতে পারে নাই, ভারতের সমস্যাকেও সমাধান করিতে পারে নাই।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীন ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ভিতর যে-আত্মবিরোধিতা শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে, তাহাই মাথা চাড়া দিয়া বারবার সমন্বয় ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। এখানে দুইটি স্তর আছে। উপরে আছে ব্যাঙ্ক-পুঁজিপতিদের শোষণ-শাসনের সবচেয়ে উন্নত ও ফালাও ব্যবস্থা, আর নীচে সামাজিক দুর্দ্দশা ও পশ্চাদ্‌পদ অবস্থার সর্ব্বনিম্ন স্তর। এ দুই-ই আবার কার্য্যকারণের জালে একে অপরের সহিত বাঁধা। শোষক ও শোষিতে মিলিয়া গড়া এই পিরামিডের শীর্ষে রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, আর ভিত্তিমূলে রহিয়াছে দুস্থ উৎপাদকের দল। এই দুইয়ের মাঝামাঝি আবার দেখি নানা অন্তর্বর্ত্তী রূপের লীলা। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে ফড়িয়া পরগাছারা—শোষণের অধস্তন যন্ত্র। প্রাচীন যে-সব বিধিব্যবস্থায় পচন ধরিয়াছে সে-সবও এখানে আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আছে নূতন অগ্রগামী শক্তি। এই সবেরই ভিতর দিয়া প্রতি বছরে ভারতের জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় চেতনা এবং ক্ষুধার্ত্ত ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। এখন এমনই

একটা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সামাজিক বিস্ফোরণের বারুদ ঠাসা রহিয়াছে।

ভারতের মূল সমস্যা শুধু জাতীয় সমস্যা নহে, উহা সামাজিক সমস্যাও বটে। ভারতের জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছে; বিদেশী শাসন হইতে জগতের এক-পঞ্চমাংশ মানুষের মুক্তি লাভের দাবীর ভিতরেই ইহা সব চেয়ে প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বাধীনতার দাবীর ভিতরেই উহার রাজনৈতিক মর্ম্মটাও মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবীর অপেক্ষাও এই দাবী আরো গভীরে আঘাত হানিয়াছে। মূলত ইহাতে এমন এক দৃঢ়নিবদ্ধ শোষণব্যবস্থাকে আক্রমণ করা হইয়াছে, যাহার শিকড় গিয়া শেষ পর্য্যন্ত একদিকে লণ্ডনের ব্যবসায়কেন্দ্রে গিয়া পৌছায় এবং অন্যদিকে ভারতের ভিতরে বিশেষ অধিকার ও শোষণের সহিত যাহা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে ধরা ছোঁওয়া যায় না।

এই দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিলে ভারতের সমস্যা শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক সমস্যা। মূল সমস্যা হইল এই যে, ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের বেশীর ভাগই আধপেটা খাইয়া আছে। তাহারা চরম দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত; তাহার উপর আবার তাহারা বিদেশী শাসনের অধীন, সেই বিদেশী শাসনের হাতেই তাহাদের জীবনের কলকাঠি। এই সমস্ত ভয়াবহ অবস্থার জন্য যে সমাজব্যবস্থা দায়ী, বিদেশী শাসন তাহাকেই নিজের জোরে জীয়াইয়া রাখিয়াছে। এই কোটি কোটি মানুষ তাহাদের জীবনের জন্য, জীবন ধারণের উপায়ের জন্য, সামান্যতম স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। তাহাদের সংগ্রাম এবং উদ্দেশ্য সাধনের সমস্যাই হইল ভারতের আসল সমস্যা।

ভারতের জনসাধারণের সংগ্রামের অব্যবহিত লক্ষ্য হইল জাতীয় মুক্তি; জাতীয় স্বাধীনতা, আত্মকর্তৃত্বের গণতান্ত্রিক দাবী সার্থক করিয়া তোলাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু আরও গভীর এক সামাজিক সংগ্রামের প্রথম পর্য্যায়টুকু মাত্র ইহার ভিতর দেখা যাইতেছে, চোখে পড়িতেছে ভারতের মধ্যেও সামাজিক বিপ্লবের সূচনাটুকু। জাতীয় এবং সামাজিক সমস্যাগুলি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত; এবং এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কটি ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলেই ভারতের পরিস্থিতি বুঝিবার মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

সামাজিক রক্ষণশীলতা এখনও ভারতের মাটিতে গভীর ভাবে শিকড় গাড়িয়া আছে, এবং জাতীয় আন্দোলনের সমস্যা ও রূপের উপর উহা এখনও গভীর

প্রভাব বিস্তার করে। এই ধরনের সামাজিক রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা জাতীয় আন্দোলনকে দুর্ব্বল করিয়া দেয় এবং উহার অগ্রগতির পথে বিশৃঙ্খলা ঘটায়। লুটপাটের কাহিনী ঢাকিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ যেমন সভ্যতা বিস্তারের সাধু সঙ্কল্পের রূপকথা প্রচার করে, তেমনই আবার অপর দিকেও অন্য এক ধরনের রূপকথা, মনগড়া ব্যাখ্যা ইত্যাদি প্রচারিত হইতে পারে। সেদিক দিয়াও আমাদের হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।

অর্থাৎ চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী কল্পকথার পিঠো-পিঠি আবার ভারতবাসীদের কিছু কিছু পশ্চাদ্‌পদ অংশও উল্টা এক রূপকথা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে যে ভারতে একেবারে সত্যযুগ বিরাজিত ছিল—এই চিত্রই তাহারা সকলের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কুফলজনিত প্রতিক্রিয়া মাত্র। বৃটিশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে জীর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহার দোষত্রুটিগুলিও ইহারা উপেক্ষা করিতে প্রয়াস পায়। অতীতের যে-সব প্রতিক্রিয়াশীল নিদর্শন আজও ভারতে টিকিয়া আছে, অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া আছে, জনসাধারণের চেতনাকে দাবাইয়া রাখিতেছে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে দিতেছে না, ঐতিহাসিক কারণ দর্শাইয়া ঠিক তাহাদেরই সাফাই গাহিবার চেষ্টাই শুধু পূর্ব্বোক্ত লোকেরা করিতেছে না, বরং তাহদেরই উপর আবার গৌরবের রঙও চড়াইতেছে, বলিতেছে—ঐ সব জিনিসই তো আদর্শস্থানীয়। প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা জাতীয় চেতনা গড়িয়া তুলিতে চাহে। এইভাবে তাহারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সাধারণ ভাবে 'পাশ্চাত্য সভ্যতার' বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত করিতে চাহিয়াছে। তাহারা সম্মুখপানে না তাকাইয়া পিছনের দিকেই চাহিয়া আছে।

ইহাতে কিন্তু জাতীয় ফ্রন্টকে শক্তিশালী করা হয় না, দুর্ব্বল করাই হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসন হইতে যে-সব কুফল দেখা দেয় শুধু তাহার বিরুদ্ধেই নয়, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অতীতের মধ্যে যাহাদের শিকড় গাঁথা এমন অন্যায়ের বিপক্ষেও মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইতে না পারিলে লাভটা কোথায়? সাম্রাজ্যবাদের আসল ভূমিকা এবং তাহার সামাজিক ভিত্তিগত বৈশিষ্ট্যের দরুন সাম্রাজ্যবাদ যে-সব দোষত্রুটি ও অন্যায়ের অস্তিত্ব সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে, এমন কি তাহাদের লালন-পালন পর্য্যন্ত করিয়াছে, সেই সব অন্যায়কেই সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা কঠিনতর হস্তে উচ্ছেদ করিতে পারিলে বরং জাতীয় ফ্রন্টই তো অধিকতর

শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। এই সাফল্যের মানদণ্ডেই তো তাহার শক্তির পরিমাপ। যতদিন অধিকতর প্রগতিশীল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারিবে, ততদিন তাহার শত নিষ্ঠুরতা ও অপচয় সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ যে আধিপত্য করিবে তাহা জানা কথা। আজ ভারতীয় জনগণের অগ্রগামী সামাজিক শক্তির সহিত জাতীয় ফ্রন্টের শক্তি যে-পরিমাণে সুস্পষ্ট রূপে নিজেকে মিশাইয়া দিবে, সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা উঁচু দরের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় ফ্রন্ট যে-পরিমাণে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ভাবে দাঁড়াইতে পারিবে, তাহার ভবিষ্যৎ বিজয় সেই পরিমাণে নিশ্চিত হইয়া উঠিবে।

আজিকার ঘনায়মান সঙ্কটে ভারতের আভ্যন্তরীণ গভীর সামাজিক বিরোধ ও সমস্যাগুলি পুরোভাগে আসিয়া হাজির হইতেছে। এই জন্যই ভারতের জনসাধারণ আজ মানবসমাজের অন্যতম মূল বিপ্লবী কর্ত্তব্যের মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের অনগ্রসরতা, বহু যুগের পরাধীনতার ক্লেদ ও গ্লানি দূরীকরণের কাজ, রক্ষণশীল সামাজিক প্রথা এবং নিরুদ্ধ গতিবেগ—এই সব গভীর সমস্যার সমাধান জাতীয় মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইবে না, বরং তখনই সমস্যা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে, সমস্যা সমাধান করিতে গেলে যে-অবস্থা আসা দরকার, তখনই প্রথম তাহার কাছাকাছি পৌছানো যাইবে। সচেতনতা লাভের দিকে, নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দিকে ভারতীয় জনগণ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিরোধ ও সমস্যা সমাধান করিয়াই ভারতকে তাহার বর্ত্তমান আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা কাটাইয়া উঠিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জাতিবৃন্দের সহিত সমান আসরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ভবিষ্যতে সমগ্র জগতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে উন্নত ও পশ্চাদ্পদ জাতির মধ্যে প্রভেদ দূরীকরণের যে-গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে, ভারতের জনসাধারণের পক্ষে এই দায়িত্ব পালনেও এক প্রধান ভূমিকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ভিতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির যত স্তর থাকিতে পারে তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা আদিম হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত স্তর পর্য্যন্ত ভারতের মধ্যে দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র সামাজিক আর্থনীতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার তীব্রতম অভিব্যক্তি ভারতের মধ্যেই তাই প্রকাশ পাইয়াছে। বিভিন্ন ও বিরোধী জাতি ও ধর্ম্মের সম্পর্ক এবং তাহাদের

একই সঙ্গে বাঁচিয়া থাকার সমস্যা; পুরাতন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, জরাগ্রস্ত সামাজিক বিধিব্যবস্থা এবং চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম; শিক্ষার জন্য লড়াই; নারীমুক্তির আন্দোলন; কৃষির পুনঃসংগঠন; শিল্পের অগ্রগতি এবং শহর ও গ্রামের সম্পর্কের প্রশ্ন; শ্রেণীবিরোধের বিচিত্রতম এবং সূক্ষ্মতম রূপ; জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা;—আধুনিক জগতের এই সব নানা প্রশ্ন ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে। সে-সব প্রশ্নের যেমন তীব্রতা, তেমনই তাহাদের তাগিদ। বিচ্ছিন্ন ভাবে এই সব বিবিধ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না; এই সব সমস্যা জাতীয় মুক্তির কেন্দ্রগত আশু সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। নূতন ভারতবর্ষ সৃষ্টির জন্য যে-বাস্তব শক্তি প্রয়োজন, ভারতের জাতীয় মুক্তি লাভের মারফতেই তাহা আয়ত্ত হইবে। পৃথিবীর জনগণের সম্মুখে তীব্রতম ও জটিলতম যে-সব সাধারণ সমস্যা রহিয়াছে, ভারতের সমস্যা সমাধান হইলে সে-সব সমস্যারও সমাধান হইয়া যাইবে।

বিশ্বের ইতিহাসে ভারতবর্ষের জনসাধারণ ইতিমধ্যেই গুরু দায়িত্ব পালন করিয়াছে—বিজয়ী হিসাবে নহে—সংস্কৃতি, চিন্তা, শিল্প এবং কলার ক্ষেত্রেই ছিল তাহাদের কৃতিত্ব। তাই ভারতীয় জনগণের জাতীয় এবং সামাজিক মুক্তি লাভের ফলে মানবসমাজের ভাণ্ডার মহান নূতন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

প্রথম খণ্ড

ভারতের বর্তমান রূপ ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতের ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্য

"ভারতবর্ষ সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ সত্য হইতেছে এই যে, ভারতবর্ষের মাটি ঐশ্বর্য্যের আকর কিন্তু তাহার অধিবাসী দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত।"*

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় দুইটি বিষয় চোখে না পড়িয়া পারে না।

একটি হইতেছে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য—প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্পদের উৎসের প্রাচুর্য্য। দেশের সকল অধিবাসীর, এমন কি, তাহারও চেয়ে বেশী লোকের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা এখানে রহিয়াছে।

আর একটি হইল ভারতের দারিদ্র্য—দেশের অধিকাংশ লোকের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসী এহেন দারিদ্র্য কল্পনাও করিতে পারিবে না।

এই দুই তথ্যের মধ্যে ভারতের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মূল নিহিত রহিয়াছে।

১। ভারতের ঐশ্বর্য্য

ভারতবর্ষ দারিদ্র লোকের দেশ হইলেও দরিদ্র দেশ নহে। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সম্পদ এত আছে যে কৃষি ও শিল্পের একযোগে উন্নতি করিয়া ভারতবাসী তাহার সাহায্যে সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। এবং ইহাও সত্য যে, বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে ভারতের আর্থনীতিক অগ্রগতির স্থান জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ উচ্চেই ছিল।

পূরাকালে অন্যান্য দেশের লোকের চোখে ভারতের ঐশ্বর্য্য যে রূপকথায় বর্ণিত ঐশ্বর্য্যের মতোই ঠেকিত তাহা সুবিদিত। তখনকার দিনের বর্ণনাকে অবশ্য খানিকটা সন্দেহের সহিত যাচাই করিতে হয়, কারণ সেকালের লোকে

---

* এম. এল. ডার্লিং: "পাঞ্জাবের কৃষকদের সম্পদ ও ঋণ," ১৯২৫, পৃঃ ৭৩

শক্তিশালী বড়লোকদের হাতে ঐশ্বর্য্য জমিয়া উঠার দিকটাতেই নজর দিত, সাধারণ লোকের মধ্যে ঐশ্বর্য্য বণ্টনের দিকে নজর দিত না। এই ধরনের পর্য্যবেক্ষকদের মধ্যে ক্লাইভ একজন। ১৭৫৭ সালে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া তিনি লেখেন :

"এই নগর লণ্ডনের মতোই বড়, জনবহুল এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন ; তবে তফাৎটা হইল এই যে, এখানকার ধনী লোকদের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ লণ্ডনের ধনীদের ঐশ্বর্য্যের চেয়ে ঢের বেশী।"*

এই সব বিবরণীতে যে-ধরনের বর্ণনার ইতর বিশেষ এবং আতিশয্য থাকে তাহা ধরিয়া লইলে এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবের সম্ভাবনাকে মানিয়া লইলেও দেখা যাইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতে আগত পর্য্যটনকারীরা প্রায়ই সাধারণ সমৃদ্ধির কথাই লিখিয়াছেন—এমন কি গ্রামের সম্বন্ধেও তাঁহাদের একই মত ছিল। অথচ আজ সেদিক দিয়া অবস্থার প্রভেদটা চোখে পড়িবেই পড়িবে।[১] সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারত পর্য্যটনের বিবরণীতে টেভারনিয়ার বলিয়াছেন :

"সবচেয়ে ছোট গ্রামগুলিতেও চাউল, ময়দা, মাখন, দুধ, তরিতরকারী, চিনি

* ভারতীয় শিল্প কমিশনের রিপোর্টে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৪৯

১। "আকবরের মৃত্যুর সময় ভারত" (১৯২০) এবং "আকবর হইতে আওরঙ্গজেব" (১৯২৩) এই দুই গ্রন্থে ডব্লিউ. এচ. মোরল্যাণ্ড নানা নেতিবাচক সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতেও ভারতীয় জনসাধারণ দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত ছিল। তবুও "আকবরের মৃত্যুর সময় ভারত"-এর 'ভারতের ঐশ্বর্য্য' শীর্ষক যে-অধ্যায়ে তিনি তাঁহার কাজের ফলাফল চুম্বক করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন, সেইখানে তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছেন :

"সারা ভারতের কথা ধরিলে গ্রামের জনসাধারণের মাথা পিছু আয় যে খুব বেশী পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত ইহা কিছু কমিয়াছে, আরও সম্ভবত ইহা কিছু বাড়িয়া গিয়াছে ; কিন্তু অর্থ নৈতিক অবস্থার একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে একথা বলিবার মতো তফাৎ কোনদিক 'দয়াই হয় নাই।" (পৃঃ ২৮৬)

"মূল উৎপাদনের কথা বলিতে গেলে, কৃষি হইতে গড়পড়তা আয় এখনকার মতোই হইত, বন হইতেও প্রায় তাহাই, মাছের চাষ হইত হয়তো এখনকার চেয়ে কিছু বেশী, ধাতু ইত্যাদি হইত নিশ্চয়ই এখনকার চেয়ে কম। শিল্পাদির দিক দিয়া বলিতে গেলে, কৃষিগত শিল্পের বাস্তবিক কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। নানাবিধ হাতের কাজ, পশম বোনা এবং জাহাজ তৈয়ারী ব্যতীত অন্যান্য যানবাহন উৎপাদনের গড়পড়তা আয় বেশ মোটা রকমই বাড়িয়াছে ; এদিকে সিল্ক বোনার কাজে আয়টা নীচুতে নামিয়াছে।... কিন্তু ধাতু, যানবাহনাদি নির্ম্মাণ ও নানাবিধ হাতের কাজের আয় বৃদ্ধির ফলে যে-লাভ হইয়াছে তাহাতে এই ক্ষতি বেশ ভালো ভাবেই পোষাইয়া গিয়াও লাভ থাকিতেছে।

এবং অন্যান্য শুষ্ক ও তরল মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে।"*

ভিনিসবাসী মানুচি সপ্তদশ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেবের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি প্রদেশের পর প্রদেশ ধরিয়া ভারতের ঐশ্বর্য্যের উচ্ছ্বসিত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ক্লাইভ ও তাঁহার পরের শাসনকর্ত্তাদের আমলে বাংলার সর্ব্বনাশের কথা এবং বর্ত্তমানে তাঁহার অপরিসীম দারিদ্র্যের কথা স্মরণে রাখিয়া তাঁহার বাংলার অবস্থার বিবরণী দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাইতে পারে ঃ

"মুঘলদের সকল রাজ্যের মধ্যে বাংলা দেশকেই ফ্রান্সের লোকে বেশী জানে। এদেশ হইতে যে অতুল ঐশ্বর্য্য ইওরোপে চালান দেওয়া হইয়াছে—তাহাই তাহার উর্ব্বরা শক্তির প্রমাণ। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে এদেশের অবস্থা কোন দিক দিয়াই মিশরের চেয়ে খারাপ নহে। সিল্ক, তুলা, চিনি ও নীল ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্যের দিক দিয়া এদেশ মিশরকেও ছাড়াইয়া যায়। ফল, ডাল, শস্য, মসলিন, সোনা, রূপার কাজ করা কাপড়—এই সবই এখানে প্রচুর পাওয়া যায়।" †

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ফরাসী পর্য্যটক

কিন্তু এই লাভ বেশ মোটা রকমের হইলেও কৃষি হইতে আয়ের বড় অঙ্কটার পাশে দাঁড় করাইলে উহা খুবই ছোট হইয়া যাইবে। (পৃঃ ২৮৭)

"জাহাজ নির্ম্মাণ, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বস্ত্র (পাট ও তুলার) নির্ম্মাণ—আয়ের এই তিনটি উপায় ভালো করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে এই কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে আগে উহা হইতে এখনকার চেয়ে এমন বেশী কিছু আয় হইত না যাহাতে দেশের গড়পড়তা আর্থিক আয় এখনকার চেয়ে খুব বেশী উঁচুতে উঠিয়া যাইতে পারে।" (পৃঃ ২৯৩)

"(আকবরের সময়ে) ভারত এখনকার চেয়ে যে সমৃদ্ধ ছিল না তাহা এক রকম নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়; সম্ভবত ইহারও চেয়ে কিছু দরিদ্রই ছিল।" (পৃঃ ২৯৪)

নানাভাবে খাটিয়া খুটিয়া অপর পক্ষের হইয়া যে-যুক্তি দাঁড় করানো যায়, তাহাই যখন তিন শতাব্দীর পর একটা গতিহীন মরা-মজা অবস্থা ছাড়া অন্য কিছুরই দাবী করিতে পারিতেছে না, তখন বিশ্বের মানদণ্ডের হিসাবে ভারতকে খানিকটা যে পিছু হটিতে হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। (এই তিন শতাব্দীর ভিতর ইওরোপের বিভিন্ন দেশের পরিবর্ত্তনের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন)

* টেভারনিয়ার ঃ "ভারত ভ্রমণ", অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস সংস্করণ, ১৯২৫, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৮

† এফ্. কাক্র ঃ "মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ ইতিহাস; প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আওরঙ্গজেবের প্রধান চিকিৎসক ভেনিসদেশবাসী মানুচির জীবনস্মৃতি হইতে উদ্ধৃত"; ১৭০৯ সালে লণ্ডনে জন বাওয়ার কর্তৃক প্রকাশিত।

বার্নিয়ার দুইবার বাংলায় আসেন। মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ার পূর্ব্বে তিনি বাংলায় যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ঃ

"দুইবার বাংলায় আসিয়া বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার যে-ধারণা হইয়াছে তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় যে, এদেশ মিশর অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী। ইহা প্রচুর পরিমাণে তুলা, সিল্ক, চিনি ও মাখন রফ্‌তানী করে; নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রচুর গম, তরিতরকারী, শস্য, হাঁস, মুরগী, পনীর উৎপন্ন করে। শূকর, ভেড়া ও ছাগলও এখানে প্রচুর। সব রকমের মাছও পর্য্যাপ্ত। রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ইতস্তত অসংখ্য খাল রহিয়াছে। জাহাজ চলাচলের এবং সেচকার্য্যের জন্য অতীতে বহু পরিশ্রম করিয়া গঙ্গা হইতে এই সব খাল কাটা হইয়াছিল।"*

বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত সাধারণ প্রশ্নের আলোচনায় নানা বিতর্কের অবকাশ থাকিলেও তথ্য এবং সাধারণ বিশ্বাসের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিলে মনে হইবে, সাধারণ সমৃদ্ধির পরিধিটা এখনকার চেয়ে বড়ই ছিল।

বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে সমসাময়িক জগতের তুলনায় ভারতের শিল্প-প্রগতি যে বেশ উঁচু দরেরই ছিল, সে-সম্পর্কে কিন্তু তর্কের কোন প্রয়োজন নাই, একথা সর্ব্বজনস্বীকৃত। ১৯১৬-১৮ সালের ভারতীয় শিল্পকমিশনের রিপোর্ট নিম্নলিখিত ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে ঃ

"আধুনিক শিল্পব্যবস্থার জন্মভূমি পশ্চিম ইওরোপ যখন অসভ্যদের বাসভূমি তখনও ভারতের শাসকদের ঐশ্বর্য্য এবং তাহার শিল্পীদের শিল্পকৌশলের জন্য ভারত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহার অনেক পরে পাশ্চাত্যের বণিক ভাগ্যান্বেষীর দল যখন প্রথম ভারতে আসিয়া হাজির হইল, তখনও এদেশের শিল্প-প্রগতি অন্তত ইওরোপের অগ্রসর দেশগুলির চেয়ে নীচু স্তরে ছিল না।"†

এই কমিশনের সভাপতি এবং ভারতের ধাতু-সম্পদ সম্পর্কে সেরা বিশেষজ্ঞ স্যার টমাস হল্যাণ্ড ১৯০৮ সালে বলেন ঃ

* বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত—"বাংলার প্রাচীন সেচব্যবস্থা" সম্পর্কিত বক্তৃতামালায় স্যর উইলিয়ম উইলকক্স কর্তৃক উদ্ধৃত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০, পৃঃ ১৮-১৯

† ভারতীয় শিল্প-কমিশনের রিপোর্ট, পৃঃ ৬

"এদেশের তৈয়ারী লৌহের উৎকর্ষ, উঁচু দরের ইস্পাত তৈয়ারীর জন্য ইওরোপে অধুনা ব্যবহৃত রীতির পূর্ব্বাভাস, তামা ও পিতলের জিনিসের শিল্পোৎকর্ষ ভারতকে ধাতব শিল্পজগতে এক সময়ে এক বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছিল।"*

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতের পদ্ধতি সে-যুগেই এক উচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছিল; কাজেই এই দিক দিয়া আধুনিক শিল্প বিস্তারের অনুকূল অবস্থা তখন বর্ত্তমান ছিল।

বৃটিশ শাসনের আমলে এই অবস্থা নষ্ট হইয়া যাইবার এবং ভারতের আর্থনীতিক অবস্থার অবনতি হইবার কারণ পরে বিচার করিয়া দেখা হইবে।

আধুনিক আর্থনীতিক অগ্রগতির পরাকাষ্ঠার অনুকূল প্রাকৃতিক সম্পদ যে ভারতে রহিয়াছে একথাও সর্ব্বজনস্বীকৃত।

কৃষি সম্পর্কে স্যর জর্জ ওয়াটের কথা ধরা যাইতে পারে। আর্থিক সম্পদের উৎপাদন সম্পর্কে ইনি ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন ঃ

"সেচ কার্য্যের বিস্তার, যানবাহনাদির সুবিধার সর্ব্বাঙ্গীণ প্রসার, কৃষি কার্য্যের উপাদান ও পদ্ধতির উন্নতি এবং কৃষিকর্ম্মে নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে...ভারতের উৎপাদনী শক্তি যে সহজেই শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাড়িয়া যাইবে একথা নিরাপদে বলা যাইতে পারে। সত্যসত্যই, অব্যবহৃত সম্পদের মূল্য ও পরিমাণ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে পৃথিবীর খুব কম দেশেই কৃষির এত চমৎকার উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।"†

শিল্পপ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এখানে যাহা আছে তাহা দেখিয়া আরও চমৎকৃত হইতে হয়। প্রচুর কয়লা, লৌহ, তৈল, ম্যাংগানিজ, সোনা, রূপা, সীসা ও তামা ভারতে রহিয়াছে। (নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় তৈল সরবরাহের বর্ত্তমান কেন্দ্র অবশ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কলকৌশলে ব্রহ্মের তৈলের উপর বৃটিশ কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করার মূলে অনেকখানি আছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হাতের কাছে যে-সব তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে প্রচুর

* "ভারতের ধাতুসম্পদ", টি. এইচ. হল্যাণ্ড প্রদত্ত রিপোর্ট, ১৯০৮ সাল

† স্যর জর্জ ওয়াট ঃ "বৃটিশ ভারতের সম্পদ সম্পর্কিত স্মারকলিপি," কলিকাতা, ১৮৯৪, পৃঃ ৫

তৈলের উৎস আছে ; সব তৈলের খনি হইতে তৈল আদায়ের ব্যবস্থা এ-পর্য্যন্ত আদৌ প্রায় আরম্ভই করা হয় নাই)।

ভারতের শিল্পসম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং ভারতের রণসম্ভারের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য মার্কিন গভর্নমেণ্ট কিভাবে সাহায্য করিতে পারে সে-সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৮২ সালে ভারতে যে-মার্কিণ টেক্‌নিক্যাল মিশন [১] আসে, তাহাদের রিপোর্টে বলা হইয়াছিল।

"বাংলা ও বিহারের কয়লার পরিমাণ ছয় হাজার কোটি টন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে দুই হাজার টন লইয়া কাজ করা সম্ভব। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের সতের শত কোটি টন কয়লার মধ্যে পাঁচশ পনের কোটি টন আদায় করা সম্ভব। ইহা ছাড়া আসামের ল্যাংরিন মালভূমিতে ছয় কোটি হইতে আট কোটি টন, এবং নংস্টয়েনে সাত কোটি টন কয়লা রহিয়াছে ; ধাতব কয়লা প্রস্তুত করিবার জন্য যে-কয়লা আছে তাহাও পঞ্চাশ কোটি টন হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান পদ্ধতিতে খনির কাজ চালাইলে প্রায় উহার অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সমস্ত কয়লা হইতে বাৎসরিক প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন খরচ হইয়া যাইতেছে, তাহাও আবার জ্বালানি তৈয়ারী ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। জ্বালানির জন্য যে-কয়লা উপযোগী কেবল তাহাই যদি এই কাজে খরচ হয়, তাহা হইলে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইলেও কয়লা বহুদিন ধরিয়া চলিবে।" *

মার্কিন টেক্‌নিক্যাল মিশন ভারতে বক্সাইট-এর পরিমাণ পঁচিশ কোটি টন বলিয়া ধরিয়াছিলেন। "সারা পৃথিবীর ম্যাংগানিজ-এর শতকরা ত্রিশ ভাগ", "সারা পৃথিবীর অভ্রের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ" ভারতই যোগান দেয়, "সারা জগতের লাক্ষা উৎপাদনের দিক দিয়াও ভারতই প্রথম স্থান অধিকার করে।"

মাটির নীচে যে-লৌহ রহিয়াছে, তাহা পরিমাণে খুবই বেশী। খুব কম করিয়া ধরিলেও তাহা তিন শত কোটি টন হইবে। গ্রেট বৃটেনে এই জিনিস আছে দুই শত পঁচিশ কোটি টন এবং জার্মানিতে একশত সাঁইত্রিশ কোটি টন।

---

১ পাঠকেরা কৌতুক লাভ করিতে পারেন যে এই কমিশনের রিপোর্ট এবং মন্তব্যাদির উপর বৃটিশ গভর্নমেন্ট 'অত্যন্ত গোপনীয়' বলিয়া ছাপ মারিয়া দিয়াছেন। এই রিপোর্ট প্রকাশিতও হয় নাই, ইহার সুপারিশও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

* মার্কিন টেক্‌নিক্যাল মিশনের রিপোর্ট, আগস্ট ১৯৪২, পৃঃ ২৫

ইহারও বেশী আছে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—নয় শত অষ্টাশি কোটি টন এবং ফ্রান্সে আছে চার শত সাঁইত্রিশ কোটি টন (জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কর্ম্মচারী সিসিল জোন্স—'ক্যাপিটাল' পত্রিকার ক্রোড়পত্র, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯)। "ভারতের ভূগর্ভস্থ লৌহ পরিমাণে এত বেশী এবং তাহাতে আসল লৌহের পরিমাণ এত অধিক যে, এখনই যদি তাহা ব্যবহৃত না হয় তাহা হইলে উহার অপচয় হইতেছে বলিতে হইবে। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রেটবৃটেন জার্মানি সুইডেন স্পেন এবং রুশিয়া প্রভৃতি দেশের গড়ে যে-পরিমাণ লৌহ উৎপাদন হয় ভারতেও ঠিক তাহা হইতে পারিত। ঐ সব দেশের উৎপাদন হইল গড়ে এক কোটি বাষট্টি লক্ষ টন, ভারতের হইল মাত্র আঠার লক্ষ টন। এক কথায় ভারতে যে-পরিমাণ উৎপাদন হওয়া উচিত, আসলে তাহার শতকরা এগার ভাগের কিছু অধিক উৎপাদন হইয়াছে এবং বাকি শতকরা উননব্বুই ভাগকে অপচয় বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।" (আর. কে. দাস : "ভারতের শিল্প সম্পর্কিত যোগ্যতা," ১৯৩০, পৃঃ ১৭)

ভারতের ভূগর্ভস্থ লৌহ উৎপাদনের সর্ব্বশেষ হিসাব মার্কিন টেক্নিক্যাল মিশন দিয়াছেন। মিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে :

"ভারতে ভূগর্ভস্থ লৌহের উপাদান পরিমাণে বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম এবং পৃথিবীর যে-কোন দেশের তুলনায় উহা উৎকৃষ্টতর। এক সিংভূম জিলাতে এমন খনিজ লোহা অন্তত তিন শত কোটি টন আছে যাহার মধ্যে খাঁটি লৌহের পরিমাণ শতকরা ষাট ভাগের অধিক। মোট লৌহ পরিমাণে দুই হাজার কোটি টনে গিয়া দাঁড়াইতে পারে। বস্তার রাজ্যে উচ্চ শ্রেণীর খনিজ লৌহ বাহাত্তর কোটি চল্লিশ লক্ষ টন বলিয়া অনুমিত হয়। মধ্যপ্রদেশের কাছাকাছি জেলাগুলিতেও অনেক লৌহ আছে। তাহার মধ্যে রাজহানা পাহাড়েই পঁচিশ লক্ষ টন এমন খনিজ লোহা আছে যাহার মধ্যে খাঁটি লৌহের পরিমাণ শতকরা সাড়ে সাতষট্টি ভাগেরও বেশী।" *

১৯১৮ সালের শিল্প-কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় :

"জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগ ভারতের সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিয়মিত ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। অবশ্য তদন্ত করিবার টাকা এবং

মার্কিন টেকনিক্যাল মিশনের রিপোর্ট, আগস্ট ১৯৪২, পৃঃ ২৪

উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে খুব বিশেষ বিশেষ অঞ্চল ছাড়া তাঁহারা এমন ভাবে অনুসন্ধান চালাইতে পারেন নাই যাহাতে আরও বিস্তারিত তদন্ত না করিয়াই সেই ধাতুসম্পদ ব্যবসার কাজে লাগানো যাইতে পারে।

"যে-সব শিল্পকে দেশের সম্পদের চাবিকাঠি বলা যাইতে পারে, তাহাদের বেশির ভাগকে চালাইবার মতো ধাতু সম্পদ এদেশে আছে; অবশ্য যে-সব শিল্পে ভ্যানাডিয়াম, নিকেল এবং মলিব্‌ডেনাম লাগে, সেগুলির কথা এখানে বাদ দেওয়া হইয়াছে।...

"ভারতীয় মহাদেশের বহু অংশে লৌহ পাওয়া যায়; তবে যেখানে ভালো লৌহ পাওয়া যায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে খনিগুলিও কয়লা সরবরাহ কেন্দ্রের কাছাকাছি—এমন জায়গার সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবুও বর্ত্তমানের লৌহ ইস্পাতের কারখানাগুলির বহুল প্রসারের পক্ষে ইহাই হয়তো যথেষ্ট।" *

সি. পি. পেরিন নামক একজন মার্কিন খনি-ইঞ্জিনিয়ার ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সহিত পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কাল জড়িত। তাঁহার হিসাব-পত্রের উল্লেখ করিয়া জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ. সি. এস. ফক্স বলিয়াছেন যে, কলিকাতাকে উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হিসাবে ধরিয়া এবং শহরের চার শত মাইল পশ্চিম এবং দুই শত মাইল দক্ষিণে বিস্তৃত এক চতুষ্কোণ আঁকিলে ঐ চতুষ্কোণের ভিতর দুই হাজার কোটি টন উচ্চ শ্রেণীর লৌহ পাওয়া যাইবে। যে-সব স্থানে এই জিনিস পাওয়া যাইবে বাংলার কয়লা-খনি হইতে গড়ে তাহার দূরত্ব হইবে এক শত পঁচিশ মাইল। (ইস্পাত শিল্পের রক্ষামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট, ১৯২৪)

দেখা যাইতেছে যে "টাকা এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবেই" জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ভালো ভাবে অনুসন্ধান চালাইতে পারেন নাই। অথচ এই অনুসন্ধানের সাহায্যে কিন্তু ভারতের এই বিরাট সম্পদের উৎসগুলিকে কাজে লাগানো যাইতে পারিত। জ্যোতির্বিদ যেমন কেবল তারাগুলির স্থান নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হন, এখানেও তেমনি সম্পদের উৎসগুলিকে লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতের সমস্ত "বৈজ্ঞানিক বিভাগের" পিছনে মোট খরচ হইয়াছে সরকারী ব্যয়ের শতকরা

* ভারতীয় শিল্প-কমিশনের রিপোর্ট, পৃঃ ৩৬

এক ভাগের এক-তৃতীয়াংশ এবং সামরিক ব্যয়ের সত্তর ভাগের এক ভাগেরও কম। ইহাও দেখা যাইতেছে যে রিপোর্টটিতে ভাসাভাসা ভাবে শুধু এইটুকু বলা হইয়াছে যে, কয়লা এবং লৌহ এমন পরিমাণে আছে যাহা হয়তো "বর্ত্তমান লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলির বহুল প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট।"

ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার এবং বর্ত্তমানে জলজ শক্তির প্রতি অবহেলাটা আরও তাৎপর্য্যপূর্ণ। পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলিতে জলজ শক্তির পরিমাণই বা কি আর ভারতের তুলনায় কিভাবে তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা নীচের হিসাব হইতে পাওয়া যাইবে (ওয়ার্ল্ড এ্যালম্যানাক, ১৯৩২):

জলজ শক্তির উৎস

দশ লক্ষ অশ্বশক্তি হিসাবে

দেশ	কতটা কাজে লাগানো যাইতে পারে	কতটা কাজে লাগানো হইতেছে	শতকরা কত ভাগ কাজে লাগানো হইতেছে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৫·০	১১·৭	৩৩
কানাডা	১৮·২	৪·৫	২৫
ফ্রান্স	৫·৪	২·১	৩৭
জাপান	৪·৫	১·৭	৩৭
ইটালি	৩·৮	১·৮	৪৭
সুইজারল্যাণ্ড	২·৫	১·৮	৭২
জার্মানি	২·০	১·১	৫৫
ভারতবর্ষ	২৭·০	০·৮	৩

জলজ শক্তির প্রাচুর্য্যের দিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারত; অথচ সুইজারল্যাণ্ড জলজ শক্তি ব্যবহার করিতেছে শতকরা বাহাত্তর ভাগ, জার্মানী পঞ্চান্ন ভাগ, ইটালি সাতচল্লিশ ভাগ, ফ্রান্স এবং জাপান সাঁইত্রিশ ভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্র তেত্রিশ ভাগ। ভারতে তাহাই ব্যবহৃত হইতেছে শতকরা মাত্র তিন ভাগ।

ভারতের অর্থনীতির প্রত্যেক দিকেই যাহা দেখা যাইবে তাহা হইল অসীম ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ এবং বর্ত্তমান শাসকবৃন্দের সেই সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি অপরিসীম অবহেলা। সেই সম্পদকে বাড়াইয়া তুলিতে ইহারা অক্ষম।

সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলেও অবস্থাটা যে ভীতিপ্রদ তাহা সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই বুঝিতে পারিয়াছে। ভারতে ইওরোপীয় স্বার্থের মুখপত্র 'স্টেটস্-ম্যান'-এর প্রাক্তন সম্পাদক এবং 'টাইমস্' পত্রিকার কলিকাতার সংবাদদাতা স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন ১৯৩৩ সালে রয়াল এম্পায়ার সোসাইটিতে নিম্নলিখিত সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন :

"স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন বলেন, শিল্পের দিক দিয়া ধরিতে গেলে ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে সুযোগ ক্রমাগতই হারানো হইয়াছে।...ইহার জন্য দোষ বেশীর ভাগ বৃটিশদেরই। শিল্পপ্রধান বড় দেশের পক্ষে যাহা যাহা দরকার ভারতে তাহার সবই প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও অর্থনীতির দিক দিয়া ভারত জগতের পশ্চাদ্পদ দেশগুলির একটি এবং শিল্পের দিক দিয়া সে তো অত্যন্ত পিছাইয়াই আছে।...শিল্পসমৃদ্ধির দিক দিয়া যে-ক্ষমতা ভারতের নিঃসন্দেহে আছে তাহার অগ্রগতির সমস্যাটা আমরা কোন কালেই তেমন ভালো করিয়া মিটাইবার চেষ্টা করি নাই।...

"আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত যদি তাহার বিরাট জনসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান দাবীর ভিত্তিতে শিল্পের এক অভূতপূর্ব্ব বিস্তার সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে এই দেশের জীবন নির্ব্বাহের যে-স্তর এখনই ভয়াবহ রূপে নীচু তাহা অনাহারের স্তরেরও নীচে নামিয়া যাইবে।" *

২। ভারতের দারিদ্র্য

ভারতের এই প্রকৃত সম্পদ এবং তাহার উন্নতি সাধনের ব্যর্থতার পটভূমিকাকে আশ্রয় করিয়াই ভারতের জনসাধারণের ভয়াবহ দারিদ্র্য ও তাহার গুরুতর তাৎপর্য্যের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শাসনযন্ত্র চালাইবার জন্য ভারতে ঝুড়ি ঝুড়ি হিসাবপত্র তৈয়ারী হয় বটে, কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার প্রশ্ন লইয়া যে-সব হিসাব তাহা মোটেই পর্য্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য নহে। জাতীয় আয় বা গড় আয়ের কোন প্রামাণ্য হিসাবপত্রই নাই (সরকারী ভাবে যে-সব অনুসন্ধান করা হইয়াছিল,

* রয়াল এম্পায়ার সোসাইটিতে স্যার আলফ্রেড ওয়াটসনের বক্তৃতা ; 'দি টাইমস্'' ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩৩

তাহার ফলাফল সবই গোপন রাখা হইয়াছে)। তেমনি আবার ভারতের বা সমগ্রভাবে বৃটিশ ভারতের মোট উৎপাদন, মজুরির হার, বা গড়ে মজুরির হার, খাটুনির সময় অথবা শ্রমিকদের অবস্থার বিশেষ কোন হিসাব নাই, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থান সম্পর্কিত হিবাবপত্রের বেলাতেও ঐ একই কথা।

মাথা পিছু গড় আয়ের হিসাব কয়েকবার করা হইয়াছে, তাহা লইয়া তীব্র তর্ক-বিতর্কও চলিয়াছে। ১৮৬৮ সাল হইতে যুদ্ধের পর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত হিসাব পাওয়া যায়।

মাথা পিছু জাতীয় আয়ের হিসাব

হিসাব প্রস্তুতকারী	সরকারী বা বেসরকারী	হিসাব কষার বৎসর	কোন বৎসরের হিসাব	মাথাপিছু বাৎসরিক আয় টাকা	শিলিং
দাদাভাই নৌরজী[১]	বেসরকারী	১৮৭৬	১৮৬৮	২০	৪০
বারিং ও বারবর	সরকারী	১৮৮২	১৮৮১	২৭	৪৫
লর্ড কার্জন	„	১৯০১	১৮৯৭-৯৮	৩০	৪০
ডব্লিউ ডিগ্‌বি[২]	বেসরকারী	১৯০২	১৮৯৯	১৮	২৪
ফিণ্ডলে শিরাস[৩]	সরকারী	১৯২৪	১৯১১	৪৯	৬৫
ওয়াদিয়া এবং জোশী[৪]	বেসরকারী	১৯২৫	১৯১৩-১৪	৪৪½	৫৯
শহ্‌ এবং খাম্বাটা[৫]	বেসরকারী	১৯২৪	১৯২১-২২	৭৪	৯৫
সাইমন রিপোর্ট	সরকারী	১৯৩০	১৯২১-২২	১১৬	১৫৫
ভি. কে. আর. ভি. রাও[৬]	বেসরকারী	১৯৩৯	১৯২৫-২৯	৭৮	১১৭

১। দাদাভাই নৌরজী: "দারিদ্র্য এবং ভারতে অ-বৃটিশ শাসন", ১৮৭৬
২। ডিগবি: "সমৃদ্ধ বৃটিশ ভারত", ১৯০২
৩। জি. ফিণ্ডলে শিরাস: 'দি সায়ান্স অফ্ পাব্‌লিক ফিনান্স', ১৯২৪
৪। ওয়াদিয়া ও জোশী: 'দি ওয়েলথ্ অফ্ ইণ্ডিয়া', ১৯২৫
৫। শাহ্ ও খাম্বাটা: 'ওয়েল্‌থ এ্যাণ্ড ট্যাক্সেবল্ কেপাসিটি অফ্ ইণ্ডিয়া', ১৯২৪
৬। ভি. কে. আর. ভি. রাও: 'ইণ্ডিয়াজ ন্যাশনাল ইনকাম,' ১৯৩৯

হিসাব প্রস্তুতকারী	সরকারী বা বেসরকারী	হিসাব কষার বৎসর	কোন বৎসরের হিসাব	মাথাপিছু বাৎসরিক আয় টাকা	শিলিং
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান-কমিটি (কেবল কৃষিজীবী জনসংখ্যা)	সরকারী	১৯৩১	১৯২৮	৪২	৬৩
ফিণ্ডলে শিরাস[৭]	সরকারী	১৯৩২	১৯৩১	৬৩	৯৪½
স্যার জেমস গ্রীগ[৮]	সরকারী	১৯৩৮	১৯৩৭-৩৮	৫৬	৮৪
ভি. কে. আর. ভি. রাও[৯]	বেসরকারী	১৯৪০	১৯৩১-৩২	৬২	৯৩

হিসাব করিবার ভিত্তির প্রভেদ বশত এবং মূল্যমানের গুরুতর পরিবর্ত্তনের জন্য এই হিসাবগুলির একের সহিত অপরের তুলনা চলে না। ১৮৭৩ সালের হিসাবকে একশত ধরিলে ভারতের দর-দামের নির্ঘণ্টসূচী ১৯০০ সালের মধ্যে একশ' ষোলতে, ১৯১৩ সালের মধ্যে একশ' তেতাল্লিশে এবং ১৯২০ সালের মধ্যে দুইশ' একাশিতে উঠে। তাহার পর ১৯২১ সালে দুইশ ছত্রিশ, ১৯২৫ সালে দুইশ সাতাশ, ১৯৩০ সালে একশ' একাত্তর এবং ১৯৩৬ সালে একশ পঁচিশে নামিয়া যায়। (এখানে উনচল্লিশটি জিনিসের দাম ধরা হইয়াছে, কিন্তু ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত খাদ্যশস্যকে তালিকায় ধরা হয় নাই।)

হিসাবপত্রের ভিত্তিতেও নানা রকমফের রহিয়াছে। এগুলিকে কেবল একটা মোটামুটি হিসাব বলিয়া ধরিতে হইবে। মোট কৃষিজাত দ্রব্যের সহিত তাহার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অ-কৃষিজাত আয় যোগ করিয়া পূর্ব্বেকার সরকারী হিসাব তৈয়ারী করা হইত। শেষোক্ত হিসাবে যে নিশ্চয়ই বেশী ধরা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ডিগবীর হিসাবে কাজকর্ম্ম

৭। জি, ফিণ্ডলে শিরাস ঃ 'পভার্টি এ্যাণ্ড কিন্‌ড্রেড ইকনমিক প্রব্লেম্‌স্ ইন ইণ্ডিয়া', ১৯৩২

৮। ভারত সরকারের অর্থবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জেমস গ্রীগের কেন্দ্রীয় এসেম্বলীতে প্রদত্ত বাজেট বক্তৃতা, এপ্রিল ১৯৩৮

৯। ভি. কে. আর. ভি. রাও ঃ 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ার জাতীয় আয়', ১৯৪০

করিয়া যে-আয় হয় তাহা ধরা হয় নাই। পূর্ব্বেকার হিসাবের মধ্যে নিম্নোক্ত গুলিই সকলে জানে, উহা সাধারণত মানিয়াও চলা হয়। নৌরজীর ১৮৬৮ সালের হিসাব—ইহাতে মাথা পিছু দুই পাউণ্ড আয় ধরা হইয়াছে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত মেজর বারিংয়ের (পরে লর্ড ক্রোমার) হিসাব—ইহাতে মাথাপিছু ২ পাউণ্ড ৫ শিলিং আয় ধরা হইয়াছে। লর্ড কার্জন বড়লাট থাকার সময় ১৯০১ সালে এক বক্তৃতাতে বলেন যে মাথাপিছু আয় ২ পাউণ্ড। এক শতাব্দীরও উপর বৃটিশ শাসনের পরেও ভারতের অবস্থা কি সে কথা এই সব সরকারী হিসাবপত্রই ভালো করিয়া বলিয়া দিতেছে।

পরবর্ত্তী কালের হিসাবপত্রের ভিতর নানা প্রভেদ আরও অনেক বেশী। দরদামের তখন কিছুই ঠিকঠাক ছিল না; খানিকটা সেই অস্থায়িত্বই ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে। ১৯১২-২০ সালের মধ্যে দরদাম প্রায় দ্বিগুণ চড়িয়া যায়, আবার তাহার দশ বৎসর পর ১৯৩১ সাল হইতে দরদাম কমিয়া প্রথম যুদ্ধের পূর্ব্বেকার দরদামের চেয়েও নামিয়া যায়। অধ্যাপক ফিণ্ডলে শিরাস ১৯১৪ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ভারত সরকারের সংখ্যাতত্ত্বের পরিচালক ছিলেন, তিনি যুদ্ধের পর যে-হিসাব করেন তাহাতে আবার ধরা হইয়াছে যে যুদ্ধের পর অ-কৃষিজাত আয়ের অনুপাত বাড়িয়াছে।

ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মোটামুটি কৈফিয়ৎ হিসাবে সাইমন কমিশনের ১৯৩০ সালের রিপোর্টের প্রথম খণ্ড চতুর্দ্দিকে প্রচারের মতলব করা হয়। তাহাতে মাথাপিছু বাৎসরিক আয়কে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া প্রায় একশ' ষোল টাকা দাঁড় করানো হয়। এই হিসাব পরে আবার বেশ বাজার-চালু হইয়া গিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত যে-সব হিসাবপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে এইটিতেই আয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী করিয়া দেখানো হইয়াছে; কাজেই কেমন করিয়া এই আয়ের হিসাব কষা হইল তাহা বিচার করিয়া দেখা ভালো।

সাইমন কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিতেছেন ১৯৩০ সালে, ইঁহারা বাছিয়া বাছিয়া দশ বৎসর আগের প্রথম যুদ্ধের ঠিক পরবর্ত্তী যে বৎসরগুলি লইলেন সে-সময় দরদাম খুবই ফাঁপিয়া গিয়াছে। ১৯১৯-২০, '২০-২১, '২১-২২ সালের গড় আয়ের যে-সব ফিরিস্তি তাঁহারা দিলেন তাহাতে চুয়াত্তর টাকা হইতে একশ' ষোল টাকা আয়ের হিসাব দেখানো হইল, তাহারও মধ্যে সবচেয়ে চড়া আয়টিই ইঁহারা শেষ পর্য্যন্ত বাছিয়া লইলেন। "সব হিসাবের মধ্যে এইটিই যে সবচেয়ে আশাজনক" তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪)। সংখ্যাটি

যুদ্ধোত্তর সুদিনের শীর্ষদেশের কাছাকাছি সময়ের হিসাব হইলেও তাহার পর পরবর্ত্তী হিসাবপত্রে তাঁহারা উহাকেই এমনভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন যেন উহাই ঐ সময়কার প্রকৃত পরিচায়ক। ("ইতিমধ্যে দরদাম পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আজ হিসাব আর উঁচু অঙ্কে চড়ানো যাইতে পারে না"—২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৭ ;—প্রকৃতপক্ষে মূল্যমান ১৯২০ সালের দুইশত একাশি হইতে ১৯৩০ সালে একশত একাত্তরে নামিয়া যায় এবং ১৯৩৪ সালের মধ্যে আরও নামিয়া একশত উনিশে গিয়া ঠেকে।) সাইমন কমিশন এই স্ফীত অঙ্কটিকেই একশ' ষোলো টাকা বা একশ' পঞ্চান্ন শিলিং বা প্রায় আট পাউণ্ডের ("কম") সমান সাধারণ ভারতীয়ের আয় বলিয়া চালাইয়া দিলেন। সাধারণ একজন ইংরাজের সে-সময় গড়ে আয় ছিল পচানব্বুই পাউণ্ড।

তাহা হইলেও সরকারী সাইমন কমিশন টানা হেঁচড়া করিয়া ভারতীয়দের গড়ে আয়ের যে "অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক" হিসাব খাড়া করিলেন, তাহাতে ১৯২১-২২ সালেও একজন ভারতীয়ের দৈনিক আয় দাঁড়াইল মাত্র পাঁচ আনা।

আসল ঘটনা জানিতে গেলে কিন্তু যে-সব জিনিস হিসাবের মধ্যে ধরাই হয় নাই তাহা ঠিক করিয়া বিচার করিতে হইবে।

ভারতের দরদামের সরকারী মূল্যমান ১৯২১ সালের দুইশত ছত্রিশ হইতে ১৯৩৬ সালে একশ পঁচিশে নামিয়া আসে—ইহা প্রায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি। ইহাতে ভারতের আয়ের মূল ভিত্তি কৃষিজাত দ্রব্যের দরের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।—১৯২১ সাল হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে খাদ্যশস্যের খুচরা দরের মান নীচে নামিয়া আসিয়াছে—চাউলের তিনশত পঞ্চান্ন হইতে একশত আঠাত্তর, গমের তিনশত ষাট হইতে একশত বাহান্ন, ছোলার চারশত ছয় হইতে একশত পাঁচ, বার্লির তিনশত পঁচিশ হইতে একশত চৌত্রিশ; মোটমাট দরদাম অর্দ্ধেকেরও উপর পড়িয়া গিয়াছে।

কাজেই কৃষিজাত দ্রব্যের এই দর কমার কথা মনে রাখিলে ১৯২১-২২ সালে সাইমন কমিশন কথিত দিন মাথাপিছু পাঁচ আনা এই যুদ্ধের পূর্ব্বেকার সময়ের দিনে দশ পয়সায় গিয়া দাঁড়ায়।

ইহা আবার একটা মোটামুটি গড় আয়, দেশের বেশীর ভাগ লোকের আসল আয় নহে। ইহা হইতে মোটা হোম চার্জ এবং সাম্রাজ্যবাদের কর (ঋণের সুদ, বৃটিশ মূলধনের ডিভিডেণ্ট, ব্যাঙ্কের কমিশন ও অন্যান্য কমিশন ইত্যাদি) বাদ দিতে হইবে। এইগুলি ভারত হইতে চালান দেওয়া হয়, তাহার পরিবর্ত্তে আমদানী মাল আসার কোনও কথা নাই। শাহ্ এবং খাম্বাটার মতে এই যে-সম্পদ বাহিরে চলিয়া যায় তাহা মোট জাতীয় আয়ের এক-দশমাংশের কিছু অধিক। কাজেই আগেকার ঐ দশ পয়সা নয় পয়সায় আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

তাহার পর গড়ে যে-আয় দেখানো হইয়াছে, তাহারও মধ্যে বৈষম্য আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—বৃটেনের একজন সাধারণ অধিবাসীর পচানব্বুই পাউণ্ড আয়ের কথা সাইমন কমিশন বলিয়াছেন। ইহাই যদি সাধারণ সত্য হইত তাহা হইলে বৃটেনের একজন সাধারণ শ্রমিক তাহার স্ত্রী এবং তিনটি ছেলেমেয়ে লইয়া বছরে চারশত পঁচাত্তর পাউণ্ড পাইত। প্রকৃত পক্ষে যদি কোনো শ্রমিক ইহার অর্দ্ধেকও পায়, তাহা হইলে সে খুব ভালোই আছে বলিতে হইবে। সাধারণ শ্রমিক খুব বেশী পাইলেও ইহার এক-তৃতীয়াংশ পাইয়া থাকে, সচরাচর সে এক-তৃতীয়াংশেরও কম পায়। আয় ভাগের এই বৈষম্য ভারতেও আছে। অধ্যাপক কে. টি. শাহ্ এবং কে. জে. খাম্বাটা "ওয়েল্‌থ্ এ্যাণ্ড ট্যাক্সেব্‌ল্ কেপাসিটি অফ্ ইণ্ডিয়া" (১৯২৪) গ্রন্থে দেখাইয়াছেন মোট জনসংখ্যার শতকরা একভাগ জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ পাইয়া থাকে, আর শতকরা ষাট জনের কপালে ঐ আয়ের শতকরা ত্রিশ ভাগ মিলে। ইহার অর্থ এই যে শতকরা ষাট জনের বা বেশীর ভাগ লোকের ভাগ্যে জাতীয় আয়ের-যে অংশটা তাহাদের প্রাপ্য বলিয়া হিসাবে দেখানো হয়, তাহার ঠিক অর্দ্ধেক করিলে তবে তাহার আসল আয়টা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।[১]

১। ১৯৩৯ সালে এপ্রিল মাসের 'টাইম্‌স্' পত্রিকার ভারতীয় ব্যবসায় ও ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত ক্রোড়পত্রে 'ভারতীয় বাজারের' ব্যবসায়ের যে হিসাব করা হয়, তাহা ভারতে আয় বিভাগ এবং আয়ের স্বল্পতার উপর কিছু আলোক সম্পাত করিয়াছে। বৃটিশ পুঁজিপতিদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যই এই বে-সরকারী হিসাব। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের একটা বর্ণাঢ্য চিত্র আঁকিয়া তাহার সাহায্যে স্বার্থান্বেষী প্রচারের চেষ্টা ইহাতে নাই। যাহারা মাল কিনিবে তাহাদের কেনা কাটার ক্ষমতার পরিধি বিচার কল্পে ইহাতে শুধু ব্যবসায় সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সব তথ্যাদি যে-ছবি দিতেছে তাহা সাইমন কমিশনের দেওয়া হিসাব হইতে একেবারে আলাদা। এই ক্রোড়পত্রে ভারতীয় গৃহস্থালীর আয়ের কথাটা এই ভাবে বলা হইয়াছে:

কাজেই পরবর্ত্তী কালের দর-দাম হ্রাস এবং হোমচার্জ ও কর বাবত বিলাতী চালান ধরার পর সাইমন কমিশনের 'খুব আশাব্যঞ্জক' হিসাবের উপর ভারতে আয় ভাগের নীতি প্রয়োগ করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, অধিকাংশ ভারতবাসীর মধ্যে সাধারণ লোকের আজ দিনে গড়ে আয় হইতেছে এক আনা হইতে পাঁচ পয়সা মাত্র।

সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অনুকূল সমস্ত তথ্য স্বীকার করিয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের নিজের গড়া হিসাবের উপর নির্ভর করিয়াই এই সিদ্ধান্ত করা হইল।

এই সাধারণ অনুমান (সঠিক হিসাব না থাকায় অনুমান ছাড়া আর কী বলা যাইতে পারে) যে ঠিক, একথা সরকারী মহল হইতে পাওয়া আর দুইটি সাম্প্রতিক হিসাবের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। ১৯৩১ সালে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি বলেন :

"প্রাদেশিক কমিটিগুলির রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রকাশিত হিসাবপত্র হইতে মনে হয় যে ১৯২৮ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে বাৎসরিক কৃষিজাত দ্রব্যের মোট দর দাঁড়াইবে বারো শত কোটি টাকা। ইহার ভিত্তিতে অন্যান্য পেশা হইতে প্রাপ্ত আয় (উহা কৃষি-আয়ের শতকরা কুড়ি ভাগ বলিয়া ধরা হইয়াছে) ও গত দশ বৎসরের ভিতর জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ১৯২৯ সাল হইতে মূল্য হ্রাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া বলা যাইত যে বৃটিশ ভারতে একজন সাধারণ কৃষকের গড়ে আয় বিয়াল্লিশ টাকার (বা তিন পাউণ্ডের অল্প কিছু বেশীর) উপরে যাইবে না।"*

ইহাতে কৃষিজীবী জনসাধারণের দিন মাথা পিছু দুই আনা করিয়া পড়িতেছে। এই হিসাব আবার ১৯২৮ সালের মূল্যবানের ভিত্তিতে কষা। ১৯২৮ সাল

আয় (টাকার হিসাবে)	ইংরাজী মুদ্রার হিসাবে	গৃহস্থালীর সংখ্যা
এক লক্ষের উপর	৭,৫০০ পাউণ্ড	৬০০০
গড় পড়তা ৫,০০০	৩৭৫ পাউণ্ড	২৭০,০০০
গড় পড়তা ১,০০০	৭৫ পাউণ্ড	২৫০,০০০
গড় পড়তা ২০০	১৫ পাউণ্ড	৩৫,০০০,০০০
গড় পড়তা ৫০	৩পাঃ ১০ শিলিং	বাকী সব

বৃটিশ পুঁজিপতিদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য এই হিসাবের কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে কি?

* ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট, ১৯৩১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯

হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে মূল্যসূচী দুইশত এক হইতে একশত পঁচিশে নামিয়া আসে। ইহাতে দৈনিক দুই আনা আরও কমিয়া গেলে যুদ্ধের আগেকার পাঁচ পয়সায় দাঁড়ায়।

১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকারের অর্থবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যর জেম্‌স্ গ্রীগ হিসাব করিয়া বলেন যে, ভারতের মোট জাতীয় আয় হইতেছে ষোলশত কোটি টাকা অথবা একশত কুড়ি কোটি পাউণ্ড। জাতীয় আয়ের সহিত সরকারী ট্যাক্সের তুলনামূলক পরিমাণ নির্দ্দেশ করার জন্যই এই কথাটা বলা হয়। ইহা শুধু বৃটিশ ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া (সারা ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য হইলে মাথা পিছু আয়ও তেমনি কমিয়া আসিবে) এবং ১৯৩৮ সালের হিসাব মতো বৃটিশ ভারতের আটাশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ জনসংখ্যা দিয়া ভাগ দিয়া আমরা মাথা পিছু গড়ে ছাপ্পান্ন টাকা বা চুরাশি শিলিং আয়— এই হিসাব পাই। আয় ভাগের সংখ্যাতাত্ত্বিক নীতি প্রয়োগ করিলে (অর্থাৎ শতকরা ষাট জন লোক শতকরা ত্রিশ ভাগ আয় পাইতেছে এই কথা মানিয়া লইলে) আমরা আবার দেখিতে পাইব যে বৃটিশ ভারতের অধিকাংশ লোকের কপালেই গড়ে মাত্র ১·৩৮ পেনী বা দৈনিক পাঁচ পয়সার কিছু বেশী জুটিতেছে। ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও বাৎসরিক আয় মাথাপিছু বাষট্টি টাকা বা তিরানব্বুই শিলিং এই হিসাব দিয়াছেন [১]। অধ্যাপক শাহ্ ও খাম্বাটা অনুপাত সম্পর্কিত যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রয়োগ করিলে আমবা আবার দেখিতে পাইব, দিন মাথা পিছু বেশীর ভাগ ভারতবাসীরই ভাগে ছয় পয়সা পড়িতেছে।

১। ডাঃ রাওয়ের মতে শহর অঞ্চলে মাথা পিছু আয় গ্রামের লোকের মাথাপিছু আয়ের তিনগুণ, গ্রামের লোকের আয় হইল একান্ন টাকা বা সাতাত্তর শিলিং, শহরের লোকের আয় হইল একশত ছেষট্টি বা দুইশত উনপঞ্চাশ শিলিং। শহরের ও গ্রামের সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থার মধ্যে বড় তফাৎ আছে, আবার সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের অবস্থার মধ্যে আছে আসমান-জমিন ফারাক।

গ্রামে প্রায় পুরা ফসলটাই জমিদার ও মহাজনের পেটে যায়।

শহর এলাকাতেও প্রায় অর্দ্ধেক আয় মোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশের হাতেই থাকে। যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো, গড়ে দুই হাজার টাকা যাহাদের বাৎসরিক আয়, তাহাদের মধ্যে শতকরা আটত্রিশ ভাগ মোট আয়ের মাত্র সতেরো ভাগ পাইয়া থাকে, এবং শতকরা একভাগের অল্প কিছু বেশী লোকের হাতেই মোট আয়ের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ গিয়া পড়ে। (ভি. কে. আর, ভি. রাও.: 'বৃটিশ ভারতের জাতীয় আয়, ১৯৩১-৩২", পৃঃ ১৮৯)

ভারতের মানুষের দারিদ্র্য যে কত গভীর এবং ব্যাপক তাহার একটা প্রাথমিক ধারণা দেয় বলিয়াই শুধু এই সব হিসাবপত্রের মূল্য আছে।

সাধারণ জীবন যাপনের অবস্থার দিক দিয়া বিচার করিলে এই সব তথ্যগুলির অর্থ কি? ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ শাহ্ এবং খাম্বাটা বলিতেছেন:

> "গড়ে একজন ভারতীয়ের যাহা আয় তাহাতে হয় প্রতি তিনজন লোকের মধ্যে দুইজনের কোনো মতে খাওয়া চলিতে পারে, নয় তো তাহাদের দিন তিনবার খাইতে না দিয়া দুইবার খাইতে দেওয়া যাইতে পারে,—তবে তাহাও এই শর্ত্তে যে তাহাদের উলঙ্গ থাকিতে এবং সারা বৎসর ঘরের বাহিরে খোলা জায়গায় থাকিতে রাজি হইতে হইবে। তাহারা কোন আমোদ প্রমোদ চাহিবে না। এক খাদ্য ব্যতীত, তাহাও আবার নিকৃষ্টতম, এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম পুষ্টিকর খাদ্য ব্যতীত তাহারা আর কিছুই চাহিবে না।"*

জেল কোড এবং দুর্ভিক্ষ কোডের তুলনা করিলে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাইবে। ১৯৩৯ সালে ভারতে একজন কয়েদীর ভরণ-পোষণের জন্য বছরে ১১৬,৬৭ টাকা লাগিত। ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটি ভারতীয় কৃষকের আয়ের যে-হিসাব কষিয়াছেন, এই টাকার পরিমাণ তাহার প্রায় তিনগুণ। ১৯২৩ সালে বোম্বাইয়ের শ্রমিক শ্রেণীর সংসার-খরচ সম্পর্কে যে সরকারী তদন্ত হইয়াছিল তাহাতে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান এবং জেল কোড ও দুর্ভিক্ষ কোডে বর্ণিত মানের মধ্যে একটা তুলনামূলক হিসাব করা হইয়াছে:

* শাহ্ এবং খাম্বাটা: "দি ওয়েলথ এ্যাণ্ড ট্যাক্সেব্‌ল্ কেপাসিটি অফ্ ইণ্ডিয়া", ১৯২৪, পৃঃ ২৫৩

পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ

	বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের বাজেট	বোম্বাইয়ের জেলে প্রদত্ত খাদ্যের পরিমাণ		বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষ কোড
		গুরু পরিশ্রমকারী কয়েদীর জন্য	লঘু পরিশ্রমকারী কয়েদীর জন্য	
মূল খাদ্যশস্য	১·২৯ পাউণ্ড	১·৫ পা:	১·৩৮ পা:	১·২৯ পা:
ডাল	০·০৯ „	০·২৭ „	০·২১ „	হিসাব
মাংস	০·০৩ „	০·০৪ „	০·০৪ „	পাওয়া
লবণ	০·০৪ „	০·০৩ „	০·০৩ „	
তৈল	০·০২ „	০·০৩ „	০·০৩ „	যায় নাই
অন্যান্য	০·০৭ „	—	—	
	১·৫৪	১·৮৭ „	১.৬৯ „	

(বোম্বাইয়ের শ্রমিক শ্রেণীর সংসার-খরচ সম্পর্কে তদন্তের রিপোর্ট, বোম্বাই শ্রমদফ্তর, ১৯২৩)

বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের অবস্থা গ্রামের সাধারণ লোকের চেয়ে ভালো, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় যে-পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে সে মাত্র সেইটুকুই কোন রকমে পায়, জেলের কয়েদীদের চেয়েও তাহার খাওয়া দাওয়া খারাপ। [১]

১। এই তদন্তের বিস্ময়কর ফল সম্বন্ধে পরে নানা সমালোচনা করা হয়। বলা হয়, শ্রমিকেরা যে সস্তা মিষ্টান্ন, মাছ, তরিতরকারী, ফলফুলুরী খাইয়া থাকে তাহার কোন হিসাব এখানে দেখানো হয় নাই। এই সমালোচনার পরে ১৯২৫ সালে আবার সরকারী ভাবে সতর্কতার সহিত তদন্ত করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে এই সব উপরি জিনিসের পরিমাণ উপরোক্ত মোট হিসাবের শতকরা মাত্র ৪·৬ ভাগ, অথবা পূর্ব্বের হিসাবের ২৪৫০ ক্যালরির উপর আরও ১১৩ ক্যালরি। ইহা হইতে দেখা যায় যে বোম্বাইয়ের পূর্ণবয়স্ক শ্রমিক দৈনিক মোট ২৫৬৩ ক্যালরি পাইতেছে (বোম্বাই লেবার গেজেট, এপ্রিল, ১৯২৫, পৃঃ ৮৪১-৪২)। বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের পুষ্টি সম্পর্কিত সাব-কমিটি ন্যূনতম ক্যালরির পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে লোকের দৈনিক ৩৩৭০ ক্যালরি প্রয়োজন। অধ্যাপক আর. মুখার্জী ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'চল্লিশ কোটির জন্য খাদ্য পরিকল্পনা' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে ভারতের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এখানে ন্যূনকল্পে ২৮০০ ক্যালরি চাই-ই চাই। এই সব হিসাবের সহিত উপরোক্ত হিসাব তুলনা করা যাইতে পারে।

জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে বছরের পর বছর সরকারী দফ্তর হইতে যে-সব রিপোর্ট বাহির হয়, তাহাতেও ঐ একই চিত্র পাওয়া যাইবে :

"ভারতের এক সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ শ্রমিক ছাড়া অন্য সকলে এমন মজুরি পায় যে তাহাতে হয়তো কোন রকমে কায়ক্লেশে ভাত কাপড় জুটিতে পারে। সব জায়গাতেই বাসস্থানের চেয়ে মানুষ বেশী ; ইহার উপর জায়গাগুলি নোংরাও খুব, লোকের দুর্দ্দশারও অন্ত নাই।"

("১৯২৭-২৮ সালের ভারতবর্ষ")

"ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে একটা বড় অংশ এমন দারিদ্র্য-জর্জ্জরিত যে পাশ্চাত্য দেশে তাহার কোন তুলনা পাওয়া যাইবে না ; খাওয়া না খাওয়ার সীমানায় তাহারা রহিয়াছে।"

("১৯২৯-৩০ সালের ভারতবর্ষ ")

"জনসংখ্যার শতকরা সত্তর হইতে আশি ভাগ কোন রকমে বাঁচিয়া রহিয়াছে মাত্র।"

(স্যার আলফ্রেড চ্যাটারটন, জার্নাল অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন, জুলাই ১৯৩০)

১৯৩৩ সালে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর মেজর-জেনারেল স্যার জন মীগ জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক রিপোর্ট লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন যে শতকরা উনচল্লিশ জন বেশ পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়া থাকে, শতকরা একচল্লিশ জনের পুষ্টির অভাব এবং শতকরা কুড়ি জনের পুষ্টির অত্যন্ত অভাব—অর্থাৎ যে-পরিমাণ পুষ্টির প্রয়োজন তাহা একষট্টি জন বা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোকের কপালে জুটে না। তাঁহার মতে বাংলায় ঐ হিসাবই দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে শতকরা বাইশ জন, সাতচল্লিশ জন এবং একত্রিশ জন—অর্থাৎ বাংলায় শতকরা আটাত্তর জন অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চার ভাগ লোকের পুষ্টির অভাব। তিনি আরও বলেন যে "সারা ভারতে রোগ বেশ ভালো-ভাবেই ছড়াইয়া আছে," এবং উহা "দৃঢ় ভাবে বেশ দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে।"

পুষ্টি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাঃ একরয়েড বলিয়াছেন যে, ভারতে "সব সময়েই এক-তৃতীয়াংশ লোকের মধ্যে পুষ্টির গুরুতর অভাব লাগিয়াই আছে" (১৯৪৩ সালের খাদ্যশস্য নীতি কমিটির রিপোর্টে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৩)।

১৯২৬ সালে গভর্নমেণ্ট ভারতের কৃষি সম্পর্কে এক রয়াল কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের নিয়োগের শর্ত্ত অনুযায়ী জমির মালিকানা, জমির বিলি বন্দোবস্ত ও কর, ভূমিরাজস্ব ইত্যাদি দারিদ্র্যের মূল কারণ সম্পর্কে কিছু বলিবার অধিকার ইহার ছিল না বটে, কিন্তু কৃষকদের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মচারীরাই যে-সাক্ষ্য তথ্যাদি দিলেন তাহাতেই তো কমিশন ভাসিয়া যাইবার জোগাড়। প্রথম সাক্ষী ভারত সরকারের কৃষি বিষয়ক পরামর্শ-দাতা ডাঃ ডি. ক্লুস্টন বলিলেন যে, "গ্রামের লোকজনের শারীরিক অবস্থা খারাপ এবং মহামারী ইহাদের সহজেই কাবু করিয়া ফেলে।" কর্নেল গ্রেহাম কমিশনের সমক্ষে বলিলেন, "কৃষির উন্নতির একটি সবচেয়ে বড় বাধা হইতেছে পুষ্টির অভাব।" কুন্নুরে পাস্তর ইনস্টিটিউটে পুষ্টির অভাব জনিত রোগের তদন্তের ভার ছিল লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্নেল আর. ম্যাকহ্যারিসনের উপর। তিনি আরও জোর দিয়া বলিলেন ঃ

> "ভারতের জনসাধারণের বোধ হয় সবচেয়ে বড় **অক্ষমতা** হইতেছে পুষ্টির অভাব।...ভারতবাসীদের রোগের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী কারণ হইতেছে পুষ্টিহীনতা।"*

১৯২৯ সালে গভর্নমেণ্ট ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক রয়াল কমিশন বসান। এই কমিশন দেখিলেন যে, "প্রায় সব শিল্পকেন্দ্রেই যে-সব পরিবারের বা ব্যক্তির ঋণ আছে তাহাদের সংখ্যা মোট পরিবার বা ব্যক্তির দুই-তৃতীয়াংশের কম হইবে না।...ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঋণের পরিমাণ তিন মাসের মজুরিকেও ছাড়াইয়া যায় এবং প্রায়ই তাহা উহারও ঢের বেশী" (পৃঃ ২২৪)। কমিশন দেখিলেন যে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের পুরুষ শ্রমিকের গড়ে আয় মাসিক প্রায় বিয়াল্লিশ টাকা ও নারী শ্রমিকের আয় সাড়ে উনিশ টাকা, বোম্বাইয়ের অদক্ষ শ্রমিক পায় মাসে সাড়ে বাইশ টাকা; ঝরিয়ার খনি এলাকায় কয়লা খনির শ্রমিক পায় গড়ে মাসে সোয়া এগার টাকা হইতে সাড়ে ষোলো টাকা। যে-সব কারখানা বছরের একটা বিশেষ সময়ে চালু থাকে সেখানে পুরুষ শ্রমিকের মজুরি হইল দিন ছয় আনা হইতে বারো আনা; নারী শ্রমিকের চার আনা

* লেঃ কর্নেল আর. ম্যাকহ্যারিসন: 'ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শারীরিক অযোগ্যতা ও খারাপ স্বাস্থ্যের কারণ হিসাবে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব সম্পর্কে স্মারকলিপি', কৃষি সম্পর্কিত রয়াল কমিশনের সমক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্য, ১ম খণ্ড, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ৯৫।

হইতে নয় আনা। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার অদক্ষ পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি হইল নয় আনা, নারী শ্রমিকের ছয় আনা, আর বালক-বালিকাদের চার আনা। মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশে পুরুষ শ্রমিকদের মজুরিই আবার নামিয়া দাঁড়াইয়াছে পাঁচ আনা। কমিশন আরও দেখিতে পাইলেন যে, যে-সব কারখানা বা শিল্পে "আইন কানুনের কোন বালাই নাই", তাহাতেই ভারতের অধিকাংশ শিল্পশ্রমিক কাজ করে; এই সব কারখানায় বা শিল্পে কোন আইন-কানুন চলে না। "এসব কারখানায় অনেক সময় দেখা যাইবে পাঁচ বছরের শিশু পর্য্যন্ত কাজ করিতেছে। তাহাদের খাইবার পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হয় না, সপ্তাহে বিশ্রামের সময়ও তাহাদের নাই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহারা দিন দশ বার ঘণ্টা খাটিতেছে; এবং যাহাদের বয়স সবচেয়ে কম, তাহারা এই পরিশ্রমের বিনিময়ে দিন পিছু মজুরি পাইতেছে দুই আনা মাত্র।" (পৃঃ ৯৬)

ঘরবাড়ির কথা বলিতে গেলে, একটা সাধারণ শ্রমিক পরিবার একটি ঘরও পায় না, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটা ঘরের ভিতর তাহারা অপরের সহিত ভাগাভাগি করিয়া থাকে। ১৯১১ সালে বোম্বাইয়ের মোট জনসংখ্যার শতকরা উনসত্তর জন বাসা বা বস্তির ঘর লইয়া বাস করিতেছিল; (ঐ বৎসর লণ্ডনের শতকরা ছয় জন এইভাবে থাকিত)। এই ধরনের ঘরে ঘর পিছু গড়ে সাড়ে চার জন লোক মাথা গুজিয়া থাকিত। ১৯৩১ সালের আদমশুমারির পরে দেখা গেল যে বোম্বাইয়ে শতকরা চুয়াত্তর জন এই ভাবে একখানা ঘর লইয়া দিন কাটাইতেছে, অর্থাৎ বিশ বৎসর পরে দেখা গেল যে পূর্ব্বের চেয়ে বাসস্থানের অভাব বাড়িয়াছে। মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এক-একটি ঘরে গড়ে পাঁচ জন করিয়া থাকিতেছে। ঘর পিছু ছয় হইতে নয় জন করিয়া আছে—দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিন শত উনআশী জন। ঘর পিছু দশ হইতে উনিশ জন করিয়া আছে—আট হাজার একশত তেত্রিশ জন। ঘর পিছু কুড়ি এবং তাহারও চেয়ে বেশী লোক আছে—পনেরো হাজার চার শত নব্বুই জন। শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা একটা 'গড় অবস্থার' সহিত না মিশাইয়া আলাদা ভাবে দেখিলে বাসস্থানের এই ভয়ঙ্কর অভাবটা আরও ভালো করিয়া চোখে পড়িবে।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কাপড়ের কলের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে-কমিটি বসাইয়াছিলেন, সেই কমিটির ১৯৪০ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হইয়াছে:

"বোম্বাইয়ের ই, এফ ও জি ওয়ার্ডের ভিতরেই তদন্তকার্য্য সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এইগুলিই শহরের প্রধান শ্রমিক এলাকা। যে-সব তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, যে-সব পরিবার সম্পর্কে তদন্ত করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯১·২৪ পরিবার একটি করিয়া ঘর লইয়া থাকে, এবং এইরূপ এক-একটি ঘরে গড়ে ৩·৮৪ জন করিয়া লোক থাকে। এই ধরনের লোক পিছু এবং ঘর পিছু স্থানের পরিমাণ হইল যথাক্রমে ২৬·৮৬ এবং ১০৩·২৩ বর্গ ফুট।" *

হুইট্‌লি রিপোর্টে দেখা যায় যে, করাচিতে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঘর পিছু গড়ে ছয় জন হইতে নয় জন করিয়া থাকিত। আহ্‌মদাবাদে শ্রমিক শ্রেণীর শতকরা তিয়াত্তর ভাগের যে-বাসা ছিল তাহাতে ঘর বলিতে মাত্র একখানি।

১৯৩১ সাল হইতে, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের সময় হইতে, ঘরবাড়ীর অবস্থাটা আরও ঢের খারাপ হইয়াছে। ১৯৪৫ সালে বোম্বাইয়ের জনসংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে তেইশ লক্ষ। ১৯৩১ সালে এখানকার জনসংখ্যা ছিল এগার লক্ষ, ১৯৪১ সালে ছিল পনেরো লক্ষের কম (১৪·৮৯ লক্ষ); অথচ ১৯৩১ সাল হইতে ঘরের সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র তিরাশি হাজার আট শত আটাশ। গড়ে বাসা পিছু লোকের সংখ্যা মোট দাঁড়াইতেছে আটেরও কম (৭·০১)। ১৯৩১ সালে উহাই ছিল পাঁচেরও নিচে (৪·০১)। অবশ্য যে-সব বাসাতে একটি মাত্র ঘর সেখানে ঠাসাঠাসিটা অপেক্ষাকৃত বড় বাসার চেয়ে বেশী।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হাউসিং প্যানেল বলেন যে, বোম্বাইয়ে মাথাপিছু স্থানের পরিমাণ হইতেছে সাড়ে বারো বর্গ ফুট, অথচ "বোম্বাই জেল ম্যানুয়াল অনুযায়ী একজন কয়েদীর জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের পরিমাণ হইল চল্লিশ বর্গ ফুট" (হাউসিং প্যানেলের রিপোর্ট, জানুয়ারী, ১৯৪৬)।

ইহার উপর, বোম্বাইয়ের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা তেরো জন আজ রাস্তায় শয্যা গ্রহণ করিতেছে, যুদ্ধের পূর্ব্বে এইরূপ লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা পাঁচজন মাত্র।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের অন্যান্য বন্দোবস্ত সম্পর্কে হুইট্‌লি কমিশন বলেন :

---

* টেক্সটাইল লেবার এন্‌কোয়ারী কমিটি রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, ১৯৪০, পৃঃ ২৭৩

"পচা আবর্জ্জনার স্তূপ এবং নর্দ্দমার ময়লা ইতস্তত জমিয়া রহিয়াছে। স্বাস্থ্যের নিয়মের প্রতি অবহেলা ইহা হইতেই প্রমাণ হইয়া যায়। এদিকে পায়খানার অভাবে মাটি ও বাতাসের অশুচিতা বাড়িয়াই চলে। অনেক বাড়ীতেই ভিং, জানলা ও আলোহাওয়া চলাচলের বন্দোবস্ত নাই। সাধারণত বাড়ীতে একটিমাত্র ছোট ঘর, ঘরে ঢুকিবার জন্য একটিমাত্র দরজা, তাহাও আবার এত ছোট যে নীচু না হইয়া ঢোকা যায় না। যাহাতে একটু আধটু আবরু বজায় থাকে তাহার জন্য কেরাসিন তৈলের পুরানো টিন, চট ইত্যাদি দিয়া পর্দা তৈয়ার করা হইয়াছে। উহাতে আলো-হাওয়া ঢুকিবার পথ আরও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ধরনের ঘরবাড়ীতে মানুষ জন্মে, বাড়িয়া উঠে, খায় দায় ঘুমায়, দিন কাটায়, মরে।" (পৃঃ ২৭১)

১৯৩২-৩৩ সালে শ্রমিক শ্রেণীর আয়ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে বোম্বাই লেবার অফিস যে-তদন্ত করেন তাহা হইতে দেখা যায় যে শতকরা ছাব্বিশটি বাসাবাড়ীর আট অথবা তাহারও কম বাড়ীর পিছু একটি করিয়া জলের কল আছে। শতকরা চুয়াল্লিশটি বাসায় প্রতি নয় হইতে পনেরোটির সম্বল একটিমাত্র কল। ষোল অথবা তাহারও বেশী বাসায় একটি কল। শতকরা উনত্রিশটি বাসস্থানের অবস্থা হইল এই (বোম্বাইয়ে শ্রমিক শ্রেণীর আয়ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কিত তদন্তের রিপোর্ট, ১৯৩৫)। আট বা তাহার চেয়ে কম সংখ্যক বাসা পিছু একটি করিয়া পায়খানা আছে এমন বাসার সংখ্যা শতকরা পঁচাশিটি। নয় হইতে পনেরোটি বাসা পিছু একটি করিয়া পায়খানা আছে শতকরা বারোটি বাসার। ষোলো বা তাহারও চেয়ে বেশী সংখ্যক বাসা পিছু একটি করিয়া পায়খানা আছে শতকরা চব্বিশটি বাসার। ১৯৩৫ সালে আহ্মেদাবাদে টেক্সটাইল লেবার ইউনিয়ন শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বাসস্থান সম্পর্কে এক তদন্ত চালান। এই তদন্তে যে তেইশ হাজার সাত শত ছয়টি বাসাবাড়ী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়, তাহার মধ্যে পাঁচ হাজার ছয় শত উনসত্তরটির তো কোন রকম জলের কল ছিল না; যে-সব জায়গায় বন্দোবস্ত ছিল, সেখানেও দুই শত বা তাহারও বেশী পরিবার পিছু মাত্র একটি বা দুইটি জলের কল ছিল। পাঁচ হাজার বাসাবাড়ীতে পায়খানার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। নর্দ্দমা ইত্যাদিও মোটেই ছিল না।

শিল্প-কমিশনের সমক্ষে একজন সাক্ষী বলেন:

"আমার জীবনে বহু দেশে বহু দারিদ্র্য আমি দেখিয়াছি, দারিদ্র্যের কথা আমি অনেক পড়িয়াছিও বটে...কিন্তু বোম্বাইয়ের দরিদ্র শ্রেণীর তথাকথিত 'ঘরবাড়ী' পরিদর্শন করার পূর্ব্বে আমি দারিদ্র্যের তীব্রতা এবং তজ্জনিত চরম দুর্দ্দশাটা বুঝিতে পারি নাই।...কোনো শ্রমিককে তাহার বাড়ীতে তাহার পরিবারের মধ্যে দেখিলেই মনে প্রশ্ন জাগিবে—এ কি মানুষ, না, নরক হইতে আগত আত্মাহীন কোনো কল্পনার জীবকে আমি দেখিতেছি ?

"দশ ফুট লম্বা দশ ফুট চওড়া এই রকম একখানি ঘর। তাহার মধ্যে নড়িবার চড়িবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই। ইহারই ভিতর কয়েকটি গোটা পরিবার ঘুমায়, বংশ বৃদ্ধি করে, তীব্রগন্ধ শুষ্ক গোময়ের সাহায্যে তাহাদের খাদ্য পাক করে এবং গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে। সকলের ব্যবহৃত সাধারণ পায়খানাটি কেবল বাড়ী হইতে আলাদা। পুরানো বাসাবাড়ীগুলির উপরতলার তথাকথিত ঘরগুলি ঢালু ছাদের তলার গর্ত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহাতে একজন মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও পারে না। পিছনের ঘরগুলি সাধারণত নিরানন্দ ও অন্ধকার, এবং চোখে অন্ধকার সহিয়া আসিবার পর ভালো করিয়া দেখিলে তবেই ঘরের অধিবাসীগুলিকে চোখে পড়িবে।" *

বোম্বাই গভর্নমেণ্ট একজন মহিলা চিকিৎসককে তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। ইনি বলিতেছেন ঃ

"আমি দেখিলাম একটি বাসাবাড়ীর তিন তলার পনেরো ফুট লম্বা বারো ফুট চওড়া একটি ঘরে ছয়টি পরিবার বসবাস করিতেছে। এই কথাটি যে সত্য তাহা ঘরের ভিতর ছয়টি উনান হইতেই প্রমাণ হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এই ঘরে শিশু ও পূর্ণবয়স্ক মিলাইয়া ত্রিশ জন লোক থাকে।...ঘরে যে ছয়জন নারী বাস করে তাহাদের মধ্যে তিনজন আসন্নপ্রসবা।...ছয়টি উনানের ধোঁয়া এবং অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর জিনিস মিলিয়া রাত্রে ঘরটিতে যে-আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তাহাতে আসন্নপ্রসবা বা সদ্যপ্রসূতী যে-কোন নারী এবং তাহার সন্তানের স্বাস্থ্যের উপর কুফল অবধারিত। এ-ধরনের বহু ঘর আমি দেখিয়াছি, ইহা তাহার মধ্যে

* এ. ই. মিরাম্স্ ঃ "ভারতীয় শিল্প-কমিশনের সমক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্য", ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫

একটি মাত্র। বাড়ীর নীচের তলায় যে-সব ঘর আছে, সেগুলির অবস্থা আরও খারাপ। তাহাতে দিনের আলো হয়তো কোনমতে কায়ক্লেশে ঢুকিতে পারিলেও সূর্য্যের আলো কোনো মতেই ঢুকিতে পারে না।"*

১৯৪৬ সালের ২১শে এপ্রিল বোম্বাইয়ে আমি লাল ঝাণ্ডার কেন্দ্র প্যারেলে কাপড়ের কলের শ্রমিকদের আবাসস্থল দেখিতে যাই। এখানে সারির পর সারি এক ঘরওয়ালা কুড়ে ঠাসাঠাসি করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। যেভাবে কুড়েগুলি তৈয়ারি তাহা আর বলিবার নয়; লম্বায় ঘরগুলি বারো ফুট, চওড়ায় দশ ফুট। সেখানে না আছে আলো, না আছে হাওয়া। ঘরে জানালারও বালাই নাই। আমরা যখন ঘরে ঢুকিলাম, তখন তেলের মিটমিটে আলোয় ঘরের অন্ধকার কিছুটা কাটিল। এদিকে জ্বলন্ত উনানের তাপে ঘরের ভিতর টেঁকে কার সাধ্য। আমরা প্রথম যে-ঘরটিতে যাই, সেখানে থাকে দশজন। ঘরের ভাড়া মাসে সাত টাকা। আর একটি ঘরে গিয়া দেখিলাম যে সেখানে তেরোটি চুলা ও উনান রহিয়াছে। ইহাতেই বুঝা গেল যে এখানে মোটমাট তেরোটি সংসার বাসা পাতিয়াছে। আমাকে যিনি সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া দেখাইতেছিলেন তিনি এখানকারই লোক। তিনি বলিলেন যে এই ঘরে কুড়ি বা তাহারও চেয়ে বেশী লোক বাস করে। তবে যদি ঘরের ভাড়া বাড়িয়া যায় এই ভয়ে লোকে আসলে কতজন ঘরে থাকে তাহা বলিতে চায় না। প্রথম তিনটি সারির ঘরে মোটমাট তিনশ' জন লোকের বাস হইবে। এই তিনশ' জন লোকের জন্য মাত্র তিনটি জলের কল, সে-কলেও আবার সকালে বিকালে অল্প ছির ছির করিয়া জল পড়ে। তোড়ে জল কলে আসে না। পায়খানা বলিতে তিনটি। ঠিক নর্দ্দমার উপরে মাটিতে গর্ত্ত করিয়া পায়খানাগুলি তৈয়ারী। তাহাও তিনটির মধ্যে একটি ভরিয়া গিয়াছে বলিয়া আর ব্যবহার করা চলে না। পরের সারিতে এক শত ষাটটি ঘর। সেখানে জলের কল মাত্র ছয়টি। জলের অভাবও খুব। ভোরে ও বিকালে মাত্র দুই ঘণ্টা করিয়া জল পাওয়া যায়; তবে বোম্বাইয়ের বড় লোকদের পাড়ায় সারাদিনই জল মেলে।

এই আধা-উপবাস, এই ঠাসাঠাসি করিয়া থাকা, এই স্বাস্থ্যব্যবস্থার অভাব—মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ইহার কী ফল হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। হাজার পিছু প্রায় সাড়ে বাইশ জনের (২২·৪) মৃত্যু—১৯৩৭ সালের মৃত্যুর এই

* বোম্বাইয়ের লেবার গেজেট, সেপ্টেম্বর, ১৯২২, পৃঃ ৩১

হারেই উহা প্রতিফলিত হইতেছে। ঐ বছর ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে হাজার করা প্রায় সাড়ে বারো জন (১২·৪) লোকের মৃত্যু হয়। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের লোকের বাঁচিবার যা আশা ভারতের লোকের তাহার অর্দ্ধেকেরও কম।

"পাশ্চাত্যের বেশীর ভাগ দেশের লোকের আয়ুর তুলনায় ভারতের লোকের আয়ু গড়ে কম। ১৯২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পুরুষ ও নারীর গড়ে আয়ু ছিল যথাক্রমে ২৪·৮ ও ২৪·৭ বছর। অথবা সাধারণ ভাবে ভারতীয়ের গড়ে আয়ু ছিল ২৪·৭৫ বছর। ইংলণ্ডে এবং ওয়েল্‌সে এই গড় হইল ৫৫·৬ বছর। ১৯৩১ সালে দেখা গেল যে, এই গড় কমিয়া গিয়া পুরুষের আয়ু গড়ে ২৩·২ এবং নারীর আয়ু গড়ে ২২·৮ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

("ভারতে শিল্পশ্রমিক", আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শ্রমিকদফ্‌তর, ১৯৩৮, পৃঃ ৮, ভারতের ১৯৩১ সালের আদমশুমারির উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত, পৃঃ ৯৮)।[১]

১ ভারতের জন্মমৃত্যুর হিসাব একেবারে শোচনীয় রকমে ভুলে ভরা। ১৯৩১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে এতৎসম্পর্কিত হিসাবে ভুল-ভ্রান্তি শতকরা বিশ ভাগ। ১৮৮১ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুর সরকারী হিসাব নীচে দেওয়া হইল:

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১
পুরুষ	২৩·৬৭	২৪·৫৯	২৩·৬৩	২২·৫৯
নারী	২৫·৫৮	২৫·৫৪	২৩·৯৬	২৩·৩১

১৯২১ সালে আদমশুমারির কমিশনাররা এই যে-হিসাব দাখিল করেন, তাহা হইতে দেখা যায় ১৮৮১ সাল হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু কমিয়া গিয়াছে। ১৯২১ সালের জন্য কোন হিসাব করা হয় নাই। গত পঞ্চাশ বছরের ভিতর ভারতের এই অবস্থার সহিত ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের অবস্থা তুলনা করা যাইতে পারে। শেষোক্ত দেশে ১৮৮১-৯০ সালে মানুষের বাঁচিবার আশা ছিল ৪৫·৪ বছর; ১৯৩৩ সালে উহাই বাড়িয়া ৬০·৮ বছরে দাঁড়াইয়াছে।

১৯৩১ সালের আর একটা হিসাব মতো পুরুষের আয়ু গড়ে হইল ২৬·৯ এবং নারীর আয়ু হইল ২৬·৬ বৎসর। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে মানুষের আয়ু অল্প বাড়িয়াছে। কিন্তু প্রত্যাশিত আয়ু ও মৃত্যুর হারের হিসাব তুলনা করিয়া দেখিলে এই হিসাবেই গলতি ধরা পড়িবে। ১৯৩১ সালে আয়ুর যে আংশিক আশাজনক হিসাব পাওয়া যাইতেছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া হিসাব করিলেও দেখা যাইবে হাজারে ৩৭ জন পুরুষ ও ৩৮ জন নারী মরিতেছে। অথচ মৃত্যুর যে-হিসাব নথিপত্রে পাওয়া যায় তাহা হইল হাজারকরা মাত্র ২৩। "প্রত্যাশিত আয়ুর হিসাবেই ভুল আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতে মৃত্যুর হার যে হাজারে তেত্রিশের কম নহে এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্যকে সে হিসাবপত্র সমর্থন করিতেছে" (জি. চাঁদ: "ইণ্ডিয়াজ টিমিং মিলিয়ন্‌স্", পৃঃ ১১৩)।

প্রসবের সময় হাজার করা সাড়ে চব্বিশটি প্রসূতীর মৃত্যুতেও স্বাস্থ্যের অবস্থাটা প্রতিফলিত হইতেছে। ইংলণ্ডে এবং ওয়েলসে এই ধরনের মৃত্যু হাজার করা পাঁচেরও নীচে (৪·১)। আহ্মেদাবাদ শহরে ভারতবাসীরা যেভাবে বাস করে তাহা উপরে বলা হইয়াছে। এই শহরের হাজারের ভিতর মৃত্যুর হার ৪১·০৫। আর আহ্মেদাবাদ ক্যাণ্টনমেণ্টে উহাই হাজার করা ১২·৮৪। ক্যাণ্টনমেণ্টে বাস করে ইওরোপীয়রা। স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত এবং অন্যান্য সুখসুবিধা সেখানে পর্য্যাপ্ত। কাজেই মৃত্যুও সেখানে এত কম। উভয় স্থানে মৃত্যুর হারে এই যে প্রভেদ—ইহার মধ্যেও কি স্বাস্থ্যের উপর অবস্থার প্রভাবটা প্রতিফলিত হইতেছে না? শিশুমৃত্যুর হারেও উহা প্রতিফলিত হইতেছে। ১৯৪৩ সালে ভারতে প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে এক শত তেষট্টিটি মারা গিয়াছে। ইংলণ্ডে এবং ওয়েলসে মারা গিয়াছে হাজার করা ছেচল্লিশটি শিশু, কলিকাতায় দুই শত উনচল্লিশ, বোম্বাইয়ে দুই শত আটচল্লিশ, মাদ্রাজে দুই শত সাতাশ। (মাত্র একটি ঘর লইয়া যে-সব বাসাবাড়ী সেখানে মৃত্যু আরও বেশী। ১৯৪৬ সালে বোম্বাইয়ে একঘরা বাসাবাড়ীতে প্রতি হাজারটি নবজাত শিশুর মধ্যে পাঁচ শত সাতাত্তরটি মারা গিয়াছে, দুইটি ঘরের বাসাবাড়ীতে মারা গিয়াছে হাজার পিছু দুই শত চুয়ান্নটি, এবং হাসপাতালে যাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মারা গিয়াছে হাজারকরা এক শত সাত জন।)

ভারতবর্ষে সরকারী নথিপত্রে মৃত্যুর কারণ দর্শাইয়া সচরাচর বলা হইয়া থাকে যে অমুক লোকটি জ্বরে মারা গিয়াছে (১৯৩২-৪১ সালে বৃটিশ ভারতে যে বাষট্টি লক্ষ লোক মরিয়াছে তাহাদের মধ্যে ছত্রিশ লক্ষেরই মৃত্যু হইয়াছে জ্বরে)—জ্বর কথাটা অস্পষ্ট, উহার দ্বারা অনেক কিছুই বুঝায়; অর্দ্ধাশন, দারিদ্র্য এবং তজ্জনিত স্বাস্থ্য ও জীবনশক্তির অভাব 'জ্বর' বলিলেই বেশ ঢাকা পড়িয়া যায়। ভারতে প্রতি চারটি মৃত্যুর মধ্যে তিনটিই যে 'দারিদ্র্যে মৃত্যু' এই রায় দিয়াছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ এবং তাহার উপর সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিও আছে :

"১৯২৬ সালে হাজার করা ২৬·৭টি মৃত্যুর হারের মধ্যে ২০·৫ জন কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, জ্বর, আমাশয় এবং পেটের অসুখের মধ্যেই আসিয়া যায়। এ সব রোগের প্রায় সবগুলিকেই "দারিদ্র্যজনিত রোগ" এই পর্য্যায়ে ফেলা

যায় এবং ইহাদের বেশীর ভাগই প্রতিরোধ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যের উন্নততর ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত, খাদ্য দূষিত হওয়া বন্ধ করা, নর্দ্দমা ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত এবং উন্নততর বাসস্থান—এই সব বিলিবন্দোবস্ত করিলেই এই উন্নতি সম্ভব হইতে পারে। তাহার সহিত দরকার মতো চিকিৎসকের পরামর্শ ও চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেই শহরের মৃত্যুর উচ্চ হার এবং যক্ষ্মা ও ফুসফুসের রোগে মৃত্যুর হার অত্যন্ত কমিয়া আসিবে।...পাশ্চাত্য দেশে যে-সব উপায় বেশ সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে, যদি তাহা ভারতে অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে রোগজনিত অস্বাস্থ্য এবং মৃত্যু বহুলাংশে কমানো যাইতে পারে।"*

১৯৪৩ সালে ভারত গভর্নমেণ্ট স্যর জোসেফ ভোরের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য পরিদর্শন এবং উন্নতি বিধান কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির রিপোর্ট ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বেশ জোর করিয়াই বলা হইয়াছে:

"জনস্বাস্থ্য রক্ষা করিতে গেলে কয়েকটি অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেই হইবে। ইহার মধ্যে আছে সুস্থ জীবন যাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, যথোপযুক্ত পুষ্টির ব্যবস্থা, লোকের ব্যয় নির্ব্বাহের সামর্থ্য আছে কিনা তাহা না দেখিয়া সমাজের সকল মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা বিধান [১] এবং নিজের নিজের স্বাস্থ্যরক্ষায় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা। বহুক্ষেত্রেই যে রোগ এবং মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই মৃত্যু এবং রোগের কারণ হইতেছে এই সব শর্ত্তাদি পালনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব। দেশের বেশীর ভাগ স্থানেই স্বাস্থ্যের অনুকূল পরিবেশ খুবই নীচু স্তরের; এদিকে যথোপযুক্ত পুষ্টির

* ভি. এ্যানস্টে: 'ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ', পৃঃ ৬৯

১। সাধারণ ও বিশেষ রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যত 'বেড' আছে তাহা ধরিয়া বৃটিশ ভারতের হাসপাতালের 'বেডের' সংখ্যার সহিত অন্যান্য দেশের তুলনা করা যাইতে পারে:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,০০০ লোক পিছু	১০'৪৮ বেড
ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌স্	১,০০০ " "	৭'১৪ "
বৃটিশ ভারত	১,০০০ " "	০'২৪ "

অভাব দেশের মানুষের এক বড় অংশের জীবনী শক্তি এবং প্রতিরোধ-শক্তি ক্ষয় করিয়া দিতেছে। বর্ত্তমানে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে-সব ব্যবস্থা আছে তাহাও আবার জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজন আদৌ মিটাইতে পারে না। তাহার উপর লোকে যে-ঔদাসীন্যের সহিত তাহাদের চারিপাশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এবং রোগবাহুল্য সা'য়া থাকে সেই ঔদাসীন্যকে জয় করিবার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে সাধারণ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষার অভাব।"

(হেল্‌থ্ সার্ভে এণ্ড্ ডেভেলপ্‌মেণ্ট কমিটির রিপোর্ট, ১৯৪৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১)

দারিদ্র্য এবং দুর্দ্দশার সর্ব্বনিম্নতম স্তরের এই চিত্রের কথা সকল বেসরকারী পরিদর্শকও বলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থা দেখিয়া এক মার্কিন পর্য্যাবেক্ষকের মনে কি ছাপ পড়িয়াছিল তাহা দেওয়া হইল। ইনি ভারতের এক গ্রামে বসবাস করিতে গিয়া দেখিলেন যে গ্রামবাসীদের আরোগ্য বিধানের বা অন্যান্য বিষয়ে সাহায্যের সকল চেষ্টাই দারিদ্র্যের মূল সমস্যায় ঠেকিয়া শেষ পর্য্যন্ত বানচাল হইয়া যায়:

"মোট জনসংখ্যার ভিতর তিন হইতে চার কোটি লোক দিনে একবারের বেশী খাইতে পায় না। তাহারা চিরন্তন অনশনের প্রান্তে আসিয়া দিন কাটাইতেছে। আমার দরজার সামনে যে-সব রুগ্ন লোক আসিয়া জমা হইত তাহাদের আরোগ্য বিধানের সকল চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হতাশাজনক বিষয় ছিল খাদ্য।"

"কলেরা রোগীর ময়লা কাপড়-চোপড় পুড়াইয়া ফেলিবার কথা বলিলে জবাব আসিত—যদি লোকটা ভালো হইয়া উঠে তখন তো তাহার আর পরিবার কিছু থাকিবে না। দারিদ্র্যই এই ধরনের ব্যয়বাহুল্যে বাধা দেয়।"

"ভারতের গ্রামে প্রয়োজন হইল খাদ্য এবং শিক্ষা, ঔষধের বড়ি নহে।"[১]

'টাইম্‌স' পত্রিকার কলিকাতার সংবাদদাতা একজন রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী। তাঁহার মনেও ঐ একই ছাপ পড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন যে, নিকটে আসিয়া ভারতকে দেখিলে 'অর্দ্ধাশনের' চিত্রই দেখা যায়। উহাই "জোর করিয়া চোখের সামনে আসিয়া হাজির হয়":

[১] জি. এমার্সন: 'ভাষাহীন ভারত', ১৯৩১

"পুষ্টির অভাব এবং অর্দ্ধাশনের যে-সব করুণ-দৃশ্য জোর করিয়া চোখের সামনে আসিয়া পড়ে তাহাতে গভীর ভাবে মর্ম্মাহত না হইয়া কেহ ভারতবর্ষের বহু স্থানে যাইতে পারিবেন না, অথবা, এ-বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারিবেন না যে ভারতবর্ষের বহু অধিবাসী পেটভরা খাওয়া কি তাহা কোন কালে জানে না।

"আমি যে-প্রদেশের সহিত সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত সেই বাংলা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া থাকেন যে, এক পুরুষ আগে এখানকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের যে-পুষ্টি ছিল আজ আর তাহা নাই।"

('টাইম্‌স্' পত্রিকার কলিকাতার সংবাদদাতা,১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৭)

এক শত আশি বছর ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসন চলিবার পরেও ভারতবর্ষের মানুষের এই অবস্থা।

দারিদ্র্যের এই অবস্থা যে স্থির ও গতিহীন নহে তাহা ভালো করিয়া লক্ষ্য করা দরকার। এই দারিদ্র্য গতিশীল এবং ক্রমবর্দ্ধমান। আধুনিক কালে অবস্থা যে আরও খারাপ হইয়া যাইতেছে এই বিষয়ে অনেক বিচক্ষণ পরিদর্শকই 'টাইমস্'-এর সংবাদদাতার সহিত একমত। বাংলার স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টরের ১৯২৭-২৮ সালের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, "বাংলার বর্ত্তমান কৃষক সমাজের একটা বড় অংশ এমন খাদ্য গ্রহণ করিতেছে যাহা খাইয়া একটা ইঁদুরও পাঁচ সপ্তাহের বেশী বাঁচিতে পারে না" এবং "উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তাহাদের জীবনী শক্তি এত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে যে তাহারা মারাত্মক রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না।" ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টরও যে ১৯৩৩ সালে রিপোর্ট দাখিল করিয়া বলেন "সারা ভারতে" রোগ "বেশ জোরের সহিত এবং বেশ দ্রুত গতিতেই বাড়িয়া চলিতেছে", সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমলে ক্রমবর্দ্ধমান কৃষিসঙ্কটের সহিত অবস্থার এই ক্রমাবনতি জড়িত, এবং আসলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের মূলে তীব্রতম শক্তি জোগাইতেছে ইহাই।

৩। অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভ্রান্ত মতবাদ

ভারতের জনসাধারণের এই দুঃসহ দারিদ্র্যের মূল কারণ কি?

গভীর বিশ্লেষণেব বদলে বাজার-চলতি হাল্কা সস্তা যে-সব কৈফিয়ৎ দারিদ্র্যের

কারণ হিসাবে দাখিল করা হয়, আসল কারণ পর্য্যালোচনা করার আগে সেই সব কৈফিয়তের জঞ্জাল পথ হইতে সরাইয়া ফেলা দরকার।

ভারতের দারিদ্র্যের যে-সব কৈফিয়ত দেওয়া হয় তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইল জনসাধারণের পশ্চাদ্‌পদ সামাজিক অবস্থা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার (আচার ব্যবহারের রক্ষণশীলতা, বর্ণগত বিধিনিষেধ, গো-পূজা, স্বাস্থ্যবিধির অবহেলা, নারীর স্থান) ইত্যাদির কৈফিয়ৎ। অবশ্য ভারতের দারিদ্র্যের উপর ইহাদের গুরুতর প্রভাব নিঃসন্দেহে বর্ত্তমান, এবং ভারতের জনসাধারণের সম্মুখে পুনর্গঠনের যে-দায়িত্ব রহিয়াছে তাহার মধ্যে একটা বড় কাজ হইল ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাওয়া। কিন্তু শুধু ইহাদেরই ভারতের দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে দেখাইয়া দেওয়া এবং ঘোড়ার আগে গাড়ী জুতিয়া দেওয়া একই কথা। সমাজ এবং সংস্কৃতির দিক দিয়া পিছাইয়া পড়াটা অধঃপতিত অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক পরাধীনতারই অভিব্যক্তি, পরাধীনতা পশ্চাদ্‌পদ অবস্থার ফল বা অভিব্যক্তি নহে। জনসাধারণ যে নিরক্ষরতার অন্ধকারে রহিয়াছে তাহার জন্য দোষী গভর্নমেণ্ট, যে জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে অস্বীকার করিয়া তাহাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারেই রাখিয়া দেয়; যে-জনসাধারণ শিক্ষার সুযোগ পায় না, নিরক্ষতার জন্য দোষী তাহারা নহে। মূল সমস্যাটা হইল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক; সাংস্কৃতিক সমস্যাটা তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে। জনোন্নয়নের কথা প্রচার করিয়া বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বক্তৃতা দিয়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা দূর করা যায় না, কারণ দারিদ্র্যের জাঁতাকল যে তখনও রহিয়াছে, উহাই যে সর্ব্বপ্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। সংগঠনের বাস্তব ভিত্তিকে বদলাইয়া তবেই উহা দূর করা যায়। এই পরিবর্ত্তনই অন্য সকল দিককার দরজা খুলিবার চাবিকাঠি। ইহার জন্য দরকার শ্রেণীসম্পর্কের পরিবর্ত্তন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় রূপের পরিবর্ত্তন। একমাত্র জনসাধারণের শক্তিতে শক্তিমান আন্দোলনই জমির উপর হইতে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক পাষাণভার দূর করিয়া একসঙ্গে বৈষয়িক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে।

এই বিশ্লেষণ যে সত্য তাহা সোভিয়েট ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত দ্বারাই ভালো ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। জারের আমলে জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অবনতির কৈফিয়ৎ দিয়া পণ্ডিতের দল বলিত যে, উহা রুশ কৃষকদের অনগ্রসর অবস্থার অনিবার্য্য ফল মাত্র। অনগ্রসর অবস্থাটাকে একেবারে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া

লওয়া হইত। কিন্তু শ্রমিক এবং কৃষকেরা তাহাদের শোষকদের হটাইয়া দিবার জন্য এক হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়া দিল যে, তাহারাও এমন বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতি লাভে সমর্থ যাহার সাহায্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত দেশকেও পিছনে ফেলিয়া আসা যায়। যে-রূপ ও নীতির ভিতর দিয়াই ইহা হউক না কেন, ভারতেও ঐ একই জিনিস দেখা যাইবে। নিম্নস্তরের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির বাহিরের লক্ষণের ভিতর ভারতীয় কৃষকের আসল অধঃপতন নিহিত নহে; পরাধীনতা ও প্রতিরুদ্ধ প্রগতির যে-সব চিহ্ন চোখে পড়ে উহা তো কেবল তাহাই। ভারতের কৃষকের আসল অধঃপতন হইতেছে পরাধীনতায়, সাম্রাজ্যবাদী ও জমিদারদের নিকট আত্মসমর্পণে। ইহাদের আধিপত্যই উন্নতির পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই অধঃপতনও শেষ হইতে চলিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের আশা এইখানেই।

ভারতের দারিদ্র্য যে 'লোকবৃদ্ধি'রই ফল—এই কৈফিয়ৎটিও বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়া থাকে এবং এই মতটি বাজারে কম চালু নহে। পাশ্চাত্য পাঠকদের শতকরা নব্বুই জনের আসল তথ্যের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে না। এখন এই মতটি এতই চলিয়া গিয়াছে যে, বারবার একই কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহাদের মনে এই কথাটাই চট করিয়া উদিত হয়। কাজেই জানা তথ্যের সাহায্যে কি কনিয়া ঠিক ইহার উল্টাটাই প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা দেখাইবার জন্য ইহা লইয়া আরো ভালো করিয়া আলোচনা করাটা এত জরুরি মনে হইতেছে।

'যে-সমস্ত সহজ মিথ্যা কাহিনী নিষ্ঠুর লোকদের শান্তি ও আরাম দান করে' তাহার মধ্যে লোকবৃদ্ধিকেই সাম্রাজ্যবাদের আমলে দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে চালাইয়া দেওয়াটা হইল সবচেয়ে নির্লজ্জ। সকলেই জানে যে প্রতিক্রিয়াশীল পাদরী ম্যালথুস্ সাহেবের আমল হইতেই উহা আধুনিক কালে চালু হইয়া গিয়াছে। ম্যালথুস্ অবশ্য নূতন কিছু দেখাইতে পারেন নাই। ১৭৯৮ সালে ঠিক সময়মাফিক ফরাসী বিপ্লব এবং উদার মতবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে তিনি তাঁহার মত জাহির করেন। (তাঁহার বইয়ের নামেই ইহা সুস্পষ্ট)। পুরস্কার হিসাবে তাঁহাকে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলেজে অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়। "মানবপ্রগতির সকল বাসনার সংহারক বলিয়া তাঁহার মতবাদ ইংরেজ মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হয়" (মার্ক্স্: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, ২৫শ পরিচ্ছেদ)। বৈজ্ঞানিকরা এবং সকল মতবাদের

অর্থনীতিবিদরা উহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও উহা আজও প্রতিক্রিয়ার প্রিয় মত হিসাবেই রহিয়া গিয়াছে। উৎপাদনের উন্নতি বিধান যে-সময় সবচেয়ে বাড়তির পথে আগাইয়া চলিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই উৎপাদনের উন্নতির সম্ভাবনার চারিপাশে মর্জিমতো লৌহপ্রাচীর তুলিয়া দেওয়ার ভিতরেই এই মতের সমস্ত যুক্তি রহিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন সম্পদবৃদ্ধি লোকবৃদ্ধিকে স্পষ্টতই দ্রুত গতিতে ছাড়াইয়া গেল এবং দেখাইয়া দিল যে দারিদ্র্যের কারণ রহিয়াছে অন্যখানে—তখন এই মতবাদ একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়ে উহাকে আবার জীয়াইয়া তোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক হিসাবপত্র থাকায় উহার কপালে আর বাঁচিয়া উঠা ঘটিল না, উহাকে আবার মরিতে হইল। যুদ্ধের সময় এবং পরে চতুর্দ্দিকে সব ধ্বংস এবং নষ্ট হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে খাদ্য কাঁচামাল এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন লোকবৃদ্ধিকে অবিরত ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল। ফলে লোকে সমাজব্যবস্থার ভিতরই তাহাদের দারিদ্র্যের কারণ খুঁজিয়া দেখিতে বাধ্য হইল। শাসক শ্রেণী সম্পদ উৎপাদন নিরোধের সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতে লাগিল এবং তাহার জন্য মাথা খাটাইয়া বহু পরিকল্পনাও বাহির করিয়া ফেলিল। এখন লোকবৃদ্ধি সম্পর্কে তাহারা এই অনুযোগ করিতে লাগিল যে, ইওরোপ ও আমেরিকার লোকেরা কামানের খাদ্য যোগাইবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শিশুর জন্ম দিতেছে না। আধুনিক শাসক শ্রেণী ম্যালথুসের উল্টা রব তুলিল—ঐশ্বর্য্য কমাও, জনসংখ্যা বাড়াও।

পুরাতন প্রতিক্রিয়ার এই লাঞ্ছিত মতবাদ ইওরোপ ও আমেরিকা হইতে বিতাড়িত হইয়া এখন এশিয়াতে তাহার শেষ আশ্রয়গুহা খুঁজিয়া ফিরিতেছে। বেশ গম্ভীর ভাবেই বলিয়া দেওয়া হইতেছে, ভারত এবং চীনের দারিদ্র্য সমাজব্যবস্থার জন্য নহে। উহার কারণ হইল "লোকবৃদ্ধি"। বলা হইতেছে যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কল্যাণে ভারতের মাটিতে আর যুদ্ধ হইতেছে না, মহামারী এবং দুর্ভিক্ষের পরিধিও নাকি কমিয়া আসিয়াছে (দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কমার কথা বলিবার সময় অবশ্য কেমন যেন একটু ইতস্তত ভাব দেখা যায়, কারণ বৃটিশ শাসনের আমলে ১৭৭০ সাল হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বহু গুরুতর দুর্ভিক্ষ ভারতে হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর ১৯১৮ সালে এক ইনফ্লুয়েঞ্জাতেই এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক মারা গেল। বাংলা দেশের

সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষেও পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক খতম হইয়াছে। তাহার উপর আজকাল বেশীর ভাগ লোকই তো 'ইঁদুরের খাদ্য' খাইয়া বাঁচিয়া আছে)! বলা হয়, দুর্ভাগ্যবশত এই সব কারণেই লোকবৃদ্ধি দমনের স্বাভাবিক উপায়াদি তো আর নাই; তাহার ফলে ভারতের অবিবেচক এবং উর্ব্বর মানুষ খাদ্য এবং জীবনধারণের উপায়কে ছাড়াইয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া যাইতে পারিতেছে। সেইজন্যই নাকি পরম কারুণিক বৃটিশ শাসনের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ জমির উপর চাপ বাড়িয়াই চলিয়াছে; সেই জন্যই এই অর্দ্ধাশনের অবস্থা। তবে হ্যাঁ, ভারতবাসী যদি বংশবৃদ্ধিটা কমাইয়া বুদ্ধিবিবেচনা-সম্পন্ন ইওরোপীয়দের হারে সন্তানের জন্ম দিতে শেখে, তবেই কেবল এই অবস্থা বদ্‌লানো যাইতে পারে।

ভারতের সমস্যা যতই চাপ দিতেছে, সাম্রাজ্যবাদী মহলে এই ধরনের বাগ্‌-বিস্তার ততই ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞদের পুরোধা এক অর্থনীতিবিদ দিব্যি নাটকীয় ভঙ্গিতে বলিয়াছেন: "ভারতের শিশুদের বন্যার মতো ভয়াবহ জন্মস্রোতকে যিনি আক্রমণ করিবেন সেই ভারতীয় ম্যালথুস কোথায়?" (এ্যান্‌স্টে, : 'ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ' পৃঃ ৪৭৫), সাম্রাজ্যের অর্থনীতি বিষয়ে আর-এক বিশেষজ্ঞ রায় দিতেছেন: "যুদ্ধ, মহামারী বা দুর্ভিক্ষের দ্বারা লোকবৃদ্ধির গতি রোধ না হইলে দেশের মানুষের সংখ্যা যে কোনমতে বাঁচিয়া থাকার সীমায় গিয়া পৌঁছায়, ম্যালথুসের এই মতকে ভারতবর্ষই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দিতেছে বলিয়া মনে হয়" (এল. সি. এ. নোয়েল্‌স্ : "দি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ্ বৃটিশ ওভারসিস্ এম্পায়ার", পৃঃ ৩৫১)। যে-সব 'বামপন্থী' 'প্রগতিশীল' মহল সাম্রাজ্যবাদী ফাঁদে ধরা পড়িয়াছেন তাঁহাদের ভিতরও এই মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। ১৯৩৩ সালে লণ্ডন স্কুল অব হাইজিন এণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনে জন্মনিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে 'এশিয়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণের' এক সম্মেলন হয়। শুধু চিকিৎসার প্রশ্ন হিসাবেই নহে, এশিয়ার দারিদ্র্য দূরীকরণের অর্থনৈতিক উপায় হিসাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সাব্যস্ত করাই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ('জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক সংবাদকেন্দ্র' কর্তৃক ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত "এশিয়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণ" শীর্ষক রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। ইহা সরকারী রিপোর্টেও গিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে:

"অনুকূল অবস্থায় লোকসংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যায় বলিয়া খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত জীবনযাত্রার মান বা আয়ত্তাধীন খাদ্যের পরি-

মাণের কোনো উন্নতিই করিতে পারে না। যাহাদের জীবন ধারণের উপায় হইতেছে জমি তাহাদের সংখ্যা কমাইবার জন্য যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী পূর্ব্বে বেশ কর্ম্মব্যস্ত ছিল। যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সক্রিয় প্রভাব তো বহুলাংশে নাকচ হইয়া গিয়াছে, আবার মহামারীজনিত মৃত্যুও অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে জমির উপর চাপ ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে।...জীবনযাত্রার সাধারণ মান দাবাইয়া রাখার উপর ইহার প্রভাব যে যথেষ্ট এই মত শুধু একা আমাদেরই নহে।" *

ম্যালথুস তাঁহার সকল গৌরব গরিমা লইয়া সরকারী রয়াল কমিশনের উপর কেমন আধিপত্য করিতেছেন এবং কমন্স সভার প্রাক্তন স্পীকারের মুখ দিয়া কেমন বাণী প্রচার করিতেছেন তাহাই একবার দেখুন!

কিন্তু আসল তথ্য কি? প্রথমত, এই সব যুক্তি যে-সব চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরে তাহা হইতেছে এই যে, বৃটিশ আমলে ভারতের জনসংখ্যা এমন হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে যে অন্যান্য দেশের জন্মবৃদ্ধির হারকে উহা একেবারে ছাপাইয়া গিয়াছে এবং এই অস্বাভাবিক দ্রুত লোকবৃদ্ধির দরুন ভয়াবহ দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইতেছে। বৃটিশ শাসনের আমলে ভারতের ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাবলী যে ঠিক উল্টা কথাটাই প্রমাণ করিয়া দেয় এ কথা কয়জন জানেন ও বুঝেন?

অন্য কোনও ইওরোপীয় দেশের লোকবৃদ্ধির তুলনায় বৃটিশ আমলে ভারতের লোকবৃদ্ধির হার বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। বিশ্বের লোকবৃদ্ধির হারের যে-হিসাব পাওয়া যায়, তাহাতেও ভারতের নাম একেবারে নীচের দিকেই পড়ে। সারা বৃটিশ শাসন অথবা গত পঞ্চাশ বছর ইহার দুইটির বেলাতেই এই কথা প্রযোজ্য।

১৮৭২ সালে ভারতে প্রথম লোকগণনা হয়। কাজেই সমস্ত আমল ধরিলে একটা আনুমানিক হিসাব মাত্রই পাওয়া যাইতে পারে। মোরল্যাণ্ডের মতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ভারতের জনসংখ্যা ছিল দশ কোটি ('আকবরের মৃত্যুর সময়ে ভারতবর্ষ', পৃঃ ২২); আজ জনসংখ্যা হইল আটত্রিশ কোটি নব্বুই লক্ষ।

---

*ভারতবর্ষে শ্রমিকদের সম্পর্কে হুইট্‌লি কমিশনের রিপোর্ট, ১৯৩১, পৃঃ ২৪৯

কাজেই দেখা যাইতেছে যে তিন শতাব্দীতে প্রায় চার গুণ লোক বাড়িয়াছে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারির কেতাবের মুখবন্ধে সরকারী বিশেষজ্ঞ ফিনলেইসনের সযত্ন হিসাব মতো ১৭০০ সালে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের লোকসংখ্যা ছিল একান্ন লক্ষ, আজ হইতেছে চার কোটি আঠারো লক্ষ। এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে (সওয়া দুই শত বছরের কিছু বেশী সময়ের ভিতর) লোকসংখ্যা আটগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডে ভারতের লোকবৃদ্ধির দ্বিগুণ হারে লোক বাড়িয়াছে।[১]

শিল্পবিপ্লবের সহিত ইওরোপের যে বিশেষ বিস্তারের নাম জড়িত, তাহা কমিয়া আসার পর এই যে গত অর্দ্ধ শতাব্দী গিয়াছে তাহা আরও উল্লেখযোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের দরুন যে-সব জটিলতার উদ্ভব হয় এবং ইওরোপে দেশের সীমানার যে-সব অদল বদল হয়, তাহা আমাদের হিসাবের বাহিরে রাখিবার জন্য আমরা ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে ভারত ও ইওরোপের তুলনা করিতে পারি। ১৮৭০ হইতে ১৯১০- সালের ভিতর ভারত ও ইওরোপের বিভিন্ন দেশের লোক-বৃদ্ধির হার নীচে দেওয়া হইতেছে।

লোকবৃদ্ধি—১৮৭০ হইতে ১৯১০

	শতকরা বৃদ্ধি
ভারত ...	১৮.৯
ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌স	৫৮.০
জার্ম্মানি ...	৫৯.০
বেলজিয়াম ...	৪৭.৮
হল্যাণ্ড ...	৬২.০
রুশিয়া ...	৭৩.৯
ইওরোপ (গড়ে) ...	৪৫.৪

(বি. নারায়ণ ঃ 'ভারতের লোকসংখ্যা,' ১৯২৫, পৃঃ ১১)

১। অধ্যাপক কার-স্যাণ্ডার্স বিশ্বের জনসংখ্যা সম্পর্কে সম্প্রতি যে প্রামাণিক বই লিখিয়াছেন (এ. এম. কার-স্যাণ্ডার্স প্রণীত "ওয়ার্লড্‌ পপুলেশন ঃ পাস্ট গ্রোথ এ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট ট্রেণ্ডস্‌," ১৯৩৬) তাহাতে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে ১৬৫০ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যায় ইওরোপের অংশ শতকরা ১৮'৩ হইতে ২৫'২ গিয়া উঠিয়াছে, এশিয়ার জনসংখ্যা শতকরা ৬০'৬ হইতে ৫৪'৫ নামিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সব কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে ঠিক তাহার উল্টা কথা প্রতিপন্ন করিয়া ইওরোপের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা বিশ্বইতিহাসের বুর্জোয়া আমলে এশিয়ার ক্রমক্ষীয়মান জনসংখ্যার স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে।

এক ফ্রান্সের কথা ছাড়িয়া দিলে ভারতের লোকবৃদ্ধির হার ইওরোপের অন্য যে-কোনো দেশের চেয়ে কম।

১৮৭২-১৯৩১ সালের মধ্যে ইওরোপের সঙ্গে ভারতের লোকবৃদ্ধি তুলনার ফল এই রকম দাঁড়ায়। এই সময়ের ভিতর ভারতের লোকবৃদ্ধি ছিল শতকরা ত্রিশ জন। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে কিন্তু ঐ সময়ে শতকরা সাতাত্তর ভাগ লোকবৃদ্ধি হইয়াছে। গত ষাট বছরেও ইংলণ্ড ও ওয়েলসের লোকবৃদ্ধির হার ছিল ভারতের দ্বিগুণেরও বেশী।*

কেবল ১৯২১-৪০ সালের ভিতর ভারতের লোকবৃদ্ধির হার ইংলণ্ড এবং ইওরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী। (এ সময় ভারতের লোকবৃদ্ধির হার শতকরা একুশ ভাগ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐ সময়কার হার হইতেছে শতকরা চব্বিশ ভাগ)। কিন্তু ভারতে দারিদ্র্যসমস্যা তো মাত্র ১৯২১ সাল হইতেই দেখা দেয় নাই।[১]

* দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের শেষ রিপোর্ট, ১৯৪৫, পৃঃ ৭৫

১। ১৯২১-৩১ সালের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ভারতের হঠাৎ লোকবৃদ্ধি হইতে যে-সব সিদ্ধান্তে সচরাচর উপনীত হওয়া যায় এবং উহার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সে সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সংখ্যাতত্ত্ববিদ ডাঃ আর. আর. কুজ্ঝিন্স্কি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তিতেই "ভবিষ্যৎ লোক-বাহুল্যের" ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়া থাকে। ডাঃ কুজঝিনস্কি লিখিতেছেন:

"যে-সব দেশে লোকগণনা হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে অনেক দেশের অধিবাসীর মোটমাট একটা সংখ্যা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু জন্মমৃত্যুর কোনো নির্ভুল হিসাব না থাকার দরুন লোকসংখ্যা কোন ধারায় চলিতেছে তাহা আমরা অনেক সময় প্রায় কিছুই জানি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের আদমশুমারির হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে ভারতে তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক অথবা শতকরা ১০·৬ জন লোক বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯৩১ সালের হিসাব অনুযায়ী মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী বলিয়া মনে হয়; আবার প্রতি বিবাহে সন্তানের সংখ্যা এবং সন্তানহীন বিধবার বিরাট সংখ্যা সম্পর্কে ১৯৩১ সালে যে-অনুসন্ধান করা হইয়াছিল তাহা হইতে মনে হইবে যে এখানে জন্মের হার কম। কাজেই এমনও হইতে পারে যে ১৯২১-৩১ সালের মধ্যে ভারতের লোকবৃদ্ধি আসলে বৃদ্ধিই নহে; হয়তো ১৯৩১ সালের অপেক্ষাকৃত নির্ভুল লোকগণনার দরুন এই হিসাব পাওয়া গিয়াছে। উহার সঙ্গে আবার হয়তো সাময়িক ভাবে এমন একটা বয়ঃসংযোগ হইয়া গিয়াছে যাহাতে জন্মসংখ্যা ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বেশী করিয়া দেখাইবার এবং মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস করিবার মতো একটা লক্ষণ দেখা যায়।"

(ডাঃ আর. আর. কুজ্ঝিনস্কি: 'পপুলেশন ট্রেণ্ডস্ ইন দি ওয়ার্ল্ড', 'স্ট্যাটিস্ট' পত্রিকা, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭)

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ভারতবর্ষে জন্মের হার কমিতেছে; ১৯০১-১০ সালের মধ্যে হিসাবমতো জন্মের হার ছিল হাজার করা আটত্রিশ; ১৯৩১-৪০ সালে উহাই কমিয়া দাঁড়াইল চৌত্রিশ; ১৯৪৩ সালে আবার জন্মের হার আরও কমিয়া হইল মাত্র ছাব্বিশ।

১৯৩১ সালে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটির যে-রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহাতে সাম্প্রতিক ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা বড় পরিধি লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ও প্রামাণিক পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। 'লোকবৃদ্ধি' যে ভারতের দ্রারিদ্র্যের কারণ এই ভ্রান্ত মতবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতে এই কমিটি বাধ্য হইয়াছেন :

"অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় লোকের মাথা পিছু এবং একর পিছু জমিতে ফসল কমই উৎপন্ন হইয়া থাকে।...সাধারণ কৃষককে এখনও যথোপযুক্ত খাদ্যের অভাব সহিয়া যাইতে হইতেছে; তাহার স্বাস্থ্যের উপর এই অভাবের প্রতিক্রিয়া আছে। দেশের মৃত্যুর চড়া হারের কারণও অনেকটা উহাই।...অস্বাভাবিক লোকবৃদ্ধি এবং সেই হেতু জমির উপর চাপকে এই অবস্থাব মূল কারণ বলা যাইতে পারে না। ভারতে লোকবৃদ্ধির সহিত ইংলণ্ডের লোকবৃদ্ধি তুলনা করিয়া দেখা যাক। এ প্রসঙ্গে এমন ত্রিশটি বৎসর ধরা যাক যাহার জন্য উভয় দেশেরই আদমশুমারির হিসাব পাওয়া যাইবে। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সালের ভিতর শতকরা ১২'১৭ জন লোক বাড়িয়াছে। ১৯০১ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে বাড়িয়াছে শতকরা ১০'৯১ হারে; ১৯১১ হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে লোকবৃদ্ধির হার হইল ৪'৮। ভারতবর্ষে এই সময়ের মধ্যে যথাক্রমে ২'৪, ৫'৫, এবং ১'৩ হারে লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

(সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারি কমিটির রিপোর্ট, ১৯৩১, পৃঃ ৪০ ১)

এখানে লোকজনের ঘন বসতি কতটা আছে? ১৯৪১ সালের হিসাব মতো ভারতে প্রতি বর্গ মাইল পিছু দুই শত ছেচল্লিশ জন লোক বাস করিত; ঐ সময়ে ইংলণ্ডে বর্গ মাইল পিছু সাত শত তিন, বেলজিয়মে সাত শত দুই, ইলণ্ডে ছয় শত উনচল্লিশ জন, এবং জার্মানীতে তিন শত আটচল্লিশ জন লোকের বাস ছিল। বিভিন্ন জেলায় বর্গ মাইল পিছু লোকসংখ্যার তারতম্যের জন্য এই হিসাবের মূল্য খুবই সীমাবদ্ধ। তবুও যেখানে লোকের সবচেয়ে ঘন বসতি সেই বাংলা দেশের কথা ধরিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, এখানে বর্গ মাইলে সাত শত উনআশি জন লোক বাস করিতেছে; অর্থাৎ ইংলণ্ড বা ওয়েল্‌স্, বেলজিয়ামের বর্গ মাইল পিছু লোকের সংখ্যার চেয়ে

এখানে সংখ্যাটা সামান্যই বেশী। অবশ্য একথা সত্য যে বাংলা দেশের কোন কোন জেলায় প্রকৃতই খুব ঘন বসতি; যেমন, ঢাকায় প্রতি বর্গ মাইলে ১৫৪২ জন, ত্রিপুরায় ১৫২৫, অথবা ফরিদপুরে ১০২৪ জন। কিন্তু এই সব লোকবহুল জেলার বিশেষ প্রশ্ন সম্পর্কে এবং বাকি ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়া, ঘনবসতিসম্পন্ন এই বাংলা দেশেই লোকসংখ্যা জীবনধারণের উপায় ও উপকরণকে ছাপাইয়া যাইতেছে কিনা এই সম্পর্কে আমরা ১৯৩১ সালের বাংলার আদমশুমারির রিপোর্টের রায়টা খুলিয়া দেখিতে পারি। উহা পরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

লোকসংখ্যা কি উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণকে ছাপাইয়া বাড়িয়া গিয়াছে? কৃষি-উন্নয়নের প্রতি গুরুতর অবহেলা এবং কৃষিযোগ্য জমির মাত্র আংশিক ব্যবহার সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত যে-হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে উল্টা কথাটারই ইঙ্গিত দেখি। যে-পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা কোনো মতেই পর্য্যাপ্ত না হইলেও উহারই ভিতর হইতে কিন্তু বাহিরে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। খাদ্য উৎপাদন পর্য্যাপ্ত না হওয়ার কারণ হইতেছে, উৎপাদনের অযোগ্য পদ্ধতি, জমির মালিকানার বর্ত্তমান ব্যবস্থা এবং কৃষির উপর বোঝার পাহাড়। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেয়ে লোকবৃদ্ধি বেশী হারে হওয়ার জন্য খাদ্যের এই অবস্থা দেখা দেয় নাই। এমন কি বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এ পর্য্যন্ত খাদ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি লোকবৃদ্ধির হারকেই ছাপাইয়া আসিয়াছে।

১৮৯১ সাল হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা শতকরা ৯·৩ বাড়িয়াছে। এই সময়ের ভিতর খাদ্যদ্রব্যের চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে শতকরা উনিশ ভাগ। অর্থাৎ কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির হার লোকবৃদ্ধির হারের দ্বিগুণ।

১৯২১ সালের জন্য অধ্যাপক পি. জে. টমাসের ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত "লোকসংখ্যা এবং উৎপাদন" গ্রন্থের হিসাবপত্র আমাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে। ১৯২০-২১ এবং ১৯২১-২২ সালের গড়পড়তা হিসাবকে ধরিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩১-৩২ সালে জনসংখ্যার অনুপাত হইবে ১১০'৪, কৃষিজ উৎপাদনের হার হইবে ১১৬ এবং শিল্প-উৎপাদনের হার হইবে ১৫১। এই দশ বৎসরের ভিতর লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশী বাড়িয়াছে। এই সময় জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ১০·৪ জন হিসাবে,

কৃষি-উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা যোলো ভাগ, শিল্পোৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা একান্ন ভাগ।

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ম্যালথুস সাহেবের ভক্ত মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার চোখে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্প্রতি প্রকাশিত "চল্লিশ কোটির জন্য খাদ্য পরিকল্পনা"তে (১৯৩৮) তিনিও কিন্তু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "কৃষির মোট উৎপাদনবৃদ্ধি লোকবৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে" (পৃঃ ১৮)। এই রায়ের স্বপক্ষে তিনি যে-সব হিসাবপত্র দাখিল করিয়াছেন তাহাতেও এই উৎপাদনবৃদ্ধির কথাটাই প্রমাণ হইয়া যায়।

ভারতে জনসংখ্যা এবং উৎপাদনের গতি
১৯১০ হইতে ১৯৩৩ সাল

(১৯১০-১১ হইতে ১৯১৪-১৫ সালের গড়পড়তা হিসাবের ভিত্তিতে রচিত সঙ্কেতসংখ্যা)

	জনসংখ্যা	সমস্ত ফসল	খাদ্য ফসল	খাদ্য নহে এমন ফসল	শিল্প উৎপাদন
১৯১০-১১ হইতে ১৯১৪-১৫ সাল পর্য্যন্ত গড়পড়তা হিসাব	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১৯৩২-৩৩	১১৭	১২৭	১৩৪	১২১	১৫৬

(রাধাকমল মুখার্জি: "চল্লিশ কোটি লোকের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা", ১৯৩৮. পৃঃ ১৭, ২৭)

লোকবৃদ্ধির হারের চেয়ে খাদ্য ফসলের উৎপাদনের হার দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি এবং শিল্প-উৎপাদনের হার তিনগুণ তাড়াতাড়ি বাড়িয়াছে।

১৯০০ হইতে ১৯৩০ সাল এই ত্রিশ বৎসরের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক টমাস লিখিতেছেন:

"১৯০০ হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা শতকরা উনিশ জন হিসাবে বাড়িয়াছে, খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামালের উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ত্রিশ ভাগ, শিল্পোৎপাদন ১৮৯ ভাগ। ১৯২১-৩০ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা অবশ্য বাড়িয়াছে বেশ দ্রুত গতিতেই, কিন্তু উৎপাদনও তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে।...ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের

উন্নতির গতি পরেও বজায় রহিয়াছে। ১৯২৮ সালের শিল্পোৎপাদনের সূচীকে একশ' হিসাব ধরিলে ১৯৩৪-৩৫ সালে উহা এক শত চুয়াল্লিশে গিয়া উঠিয়াছে এবং এ-বৎসর উহা আরও উঁচুতে উঠিতে পারে।

"লোকবৃদ্ধি যে উৎপাদনকে ছাড়াইয়া যায় নাং তাহার লক্ষণ এই সব হইতেই পাওয়া যাইতেছে।...লোকবৃদ্ধি খাদ্যবৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া যাইতেছে বলিয়া যে 'হাঁ হাঁ, গেল গেল' রব উঠিয়াছে, হিসাবপত্রে তাহার সমর্থন মিলিতেছে না। 'ভারতবর্ষে শিশুর সর্ব্বনাশা তরঙ্গের' কথা ভাবিয়া যাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠেন, তাঁহারা জাতীয় আয় বণ্টন, ভোগের রূপ ও রীতি, ভৌগোলিক এলাকা হিসাবে জনসংখ্যা ছড়াইয়া দেওয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপারের উন্নতির দিকে মনটা ফিরাইলে ভালো করিবেন।"*

জীবনযাত্রার উপকরণ উৎপাদনের হার দ্রুততর গতিতে বাড়িয়াছে ; কাজেই যথার্থ ঘটনা হইতে এই রায়ই পাওয়া যাইতেছে যে, ভারতের দারিদ্র্যের কারণ স্বরূপ এই কথা আর বলা চলে না যে খাদ্যসামগ্রীব উৎপাদনের হারের তুলনায় জনসংখ্যা দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন অন্যথানে দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে[১]।

* অধ্যাপক পি. জে. টমাস, 'টাইম্‌স্' পত্রিকা, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩৫

১। সাম্রাজ্যবাদ যে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা চাপাইয়া দিয়াছে, যে-অবস্থা দেশের কৃষক সমাজের দারিদ্র্য বাড়াইয়া তুলিতেছে, খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দিতেছে—তাহারই ভিতর দারিদ্র্যের কারণ নিহিত। এই সত্য ভারত সরকারের আমলা ডব্লিউ. বার্ন্‌স্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হিসাবপত্রের ভিতর আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :

বৎসর	যে-জমিতে প্রধান খাদ্য ফসল হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ (দশ লক্ষ একর হিসাবে)	প্রধান খাদ্য ফসলের পরিমাণ (দশ লক্ষ টনের হিসাবে)	জনসংখ্যা (দশ লক্ষের হিসাবে)
১৯২১ ২২	১৫৮·৬	৫৪·৩	২৩৩·৬
১৯৩১-৩২	১৫৬·৯	৫০·১	২৫৬·৮
১৯৪১-৪২	১৫৬·৫	৪৫·৭	২৯৫·৮

(ডব্লিউ বার্ন্‌স্: "টেকনোলজিক্যাল পসিবিলিটিজ অফ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া", ১৯৪৪)

১৯২১-২২ হইতে ১৯৪১-৪২ এই সময়ের মধ্যে বৃটিশ ভারতের জনসংখ্যা ৬ কোটি ২২ লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু প্রধান খাদ্য ফসলের চাষের জমি বিশ লক্ষ একরেরও বেশী কমিয়া গিয়াছে। উৎপাদনের হ্রাসের হিসাবপত্র দেখিলে আরও আতঙ্কিত হইয়া উঠিতে হয়। উৎপাদন ছিয়াশি লক্ষ টন কমিয়া গিয়াছে। বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯২৯ সালের আর্থিক সঙ্কটের ফলে

ইহার অর্থ এই নয় যে বর্ত্তমানে যে-মালিকানা, যে-বিলিব্যবস্থা, যে-রীতিপদ্ধতি এবং শ্রমশক্তির যে-অপচয় চলিতেছে, তাহা জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনযাত্রার উপকরণ উৎপাদনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। আসলে উৎপাদন সত্য সত্যই অত্যন্ত কম। যে প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষ দৈহিক পরিশ্রম না করিয়াও সাধারণ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহারও খাদ্যের মধ্যে দৈনিক চব্বিশ শত ক্যালরি থাকা চাই। যাহারা সাদাসিধা কাজ করিয়া থাকে তাহাদের পঁচিশ শত হইতে ছাব্বিশ শত ক্যালরির প্রয়োজন, এবং যাহারা গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিয়া থাকে তাহাদের প্রয়োজন হইল প্রায় আটাইশ শত হইতে তিন হাজার ক্যালরি। "ভারতীয় খাদ্যের পুষ্টিগত গুণাগুণ এবং সন্তোষজনক খাদ্যের পরিকল্পনা" এই নামে ১৯৩১ সালে যে-স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রচারপত্র (২৩ নং) প্রকাশিত হয়, তাহাতে কুন্নুরের পুষ্টি-গবেষণাগারের ডিরেক্টর ডাঃ একরয়েড বলিয়াছেন যে, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক সাধারণত যে-খাদ্য খাইয়া থাকে তাহাতে মাত্র এক হাজার সাত শত পঞ্চাশ ক্যালরি থাকে এবং তাহাতে পুষ্টিকর বস্তুর সমতা মোটেই নাই[১] (হেল্‌থ্ সার্ভে এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কমিটির রিপোর্ট, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭০)। ইহার উপর আবার বিশেষ করিয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের গুরুতর অভাব রহিয়াছে। মোট যে ১১৩,০০০০ লক্ষ পাউণ্ড দুগ্ধ উৎপন্ন হয় বলিয়া হিসাব পাওয়া যায়, সুসঙ্গত খাদ্যব্যবস্থা বিধানের জন্য তাহা ন্যূনতম প্রয়োজনের অর্দ্ধেকও নহে।

যে-বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইতে পারিতেছে না, এই সমস্ত তথ্য হইতে সেই সংগঠনেরই দোষ প্রতিপন্ন হইতেছে। পক্ষান্তরে, বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে ভারতের সম্পদ ঠিক ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে উহার দ্বারা বর্ত্তমান লোকসংখ্যার চেয়ে ঢের

যে-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহারই সাক্ষাৎ ফল হিসাবে সাম্প্রতিক কালে আবাদী জমির পরিমাণ ও খাদ্যশস্যের উৎপাদনে পরম অধোগতি দেখা দিয়াছে।

ইহা লক্ষ্যণীয় যে, পূর্ব্বে উদ্ধৃত হিসাবের সহিত তুলনায় ডব্লিউ. বার্নসের এই হিসাব হইতে উল্টা ইহাই বুঝা যায় যে; ১৯২১ সাল হইতেই অধোগতি শুরু হইয়াছে।

১। বর্ত্তমানে খাদ্য বরাদ্দের পরিমাণ গুরুতর ভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে সাধারণ ভারতীয়ের কপালে নয় শত ষাট ক্যালরি জোটে। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ লোক গড়পড়তা তিন হাজার এক শত পঞ্চাশ এবং বৃটেনের লোক গড়পড়তা তিন হাজার ক্যালরি পায়।

বেশী বা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের যে-লোকসংখ্যা হইতে পারে তাহারও চেয়ে বেশী লোকের প্রয়োজন খুব ভালো করিয়াই মিটাইতে পারা যায়। ভারতবর্ষের চাষের যোগ্য যে-পরিমাণ জমি বর্ত্তমান আছে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশী জমিতে চাষ করাই হয় নাই। চাষের ব্যবস্থাও এমন আদিম ধরনের এবং তাহার বিধিনিষেধও এত যে, গ্রেট বৃটেনে ঢের কম মানুষ দিয়া চাষ করিয়া একর পিছু যে-পরিমাণ শস্য পাওয়া যায় (এখানে গমের কথা ধরিতেছি) ভারতবর্ষে মেলে তাহার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। ভারতের সম্পদ ব্যবহার করিবার পথে যে-সব বাধা রহিয়াছে সেগুলি অতিক্রম করিতে পারিলেই ভারতের দারিদ্র্য দূর করার সমস্যার মর্ম্মস্থলে পৌঁছানো যাইবে।

সাম্রাজ্যবাদের সাফাই গাওয়া যাঁহাদের অভ্যাস তাঁহারা এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবিদরা যে কিভাবে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া প্রশ্নটাকেই উত্তর বলিয়া চালাইয়া দেন তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এখানেই মিলিবে। তাঁহারা বলেন যে, 'বর্ত্তমান অবস্থায়' উৎপাদনই পর্য্যাপ্ত নহে এবং এই কারণেই ভারতে এত "লোকবাহুল্য"। এক কথায় তাঁহারা ধরিয়া লন যে বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক বোঝা, সুদখোর মহাজনের প্যাঁচ কসিয়া টাকা আদায়ের প্রথা, অগ্রগতির পথ নিরোধ এবং অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা—এ সবই একেবারে ঈশ্বরের করুণার দান, উহা স্বাভাবিক এবং দরকারী। "ভারতে শিশুর ভয়াবহ তরঙ্গ" রোধ করিবার জন্য 'ভারতীয় ম্যালথুসের' আবির্ভাব কামনা করিয়া যে ডাঃ এ্যানস্টে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অম্লান বদনে তিনি এই যুক্তি দিতেছেন :

> "তর্ক হিসাবে বলা হয় যে ভারতবর্ষে লোকবাহুল্য নাই, এবং উৎপাদন বণ্টন ও উপভোগের যত উপায় জানা আছে তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষ আরও বেশী লোকের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করিতে পারে। **তেমন অবস্থায় আরও বেশী লোকের ব্যবস্থা করা যে সম্ভব তাহা অস্বীকার করা যায় না,** কিন্তু দেশে কত লোক হইলে তাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জনসংখ্যা বলিব সে-প্রশ্নের তো ইহাতে কিছু আসিয়া যাইতেছে না ? ইহা স্থির নিশ্চয় যে বর্ত্তমান অবস্থায় ক্ষুদ্রতর জনসংখ্যা মাথা পিছু আরও বেশী উৎপাদন করিতে পারিবে।"*

*ভি. এ্যানস্টে : "ভারতের আর্থনীতিক বিকাশ", ১৯৩৬, পৃষ্ঠা ৪০, বড় হরফ আমি প্রয়োগ করিয়াছি।

এখানে প্যাঁচ রহিয়াছে "বর্ত্তমান অবস্থায়" এই কথার ভিতর। উহা বাস্তব ঘটনার নিরপেক্ষ স্বীকৃতি বলিয়া মনে হইলেও আসলে উহার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী এবং জমিদারী শোষণের পুরা কাঠামোটাকে এবং তাহার ফলাফলকে প্রয়োজনীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

তেমনি, ভারতের কৃষি সম্পর্কিত রয়াল কমিশন বসাইবার সময় আড়ম্বরের অন্ত ছিল না, এই কমিশনের মোটা মোটা রিপোর্ট ও সাক্ষ্য প্রমাণের বইও প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু জমির মালিকানা, জমি বিলির ব্যবস্থা এবং রাজস্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে এই কমিশনকে বারণ করিয়া দেওয়া হয়। এই সামান্য কথাগুলি স্বতোসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইলে সমস্যা সমাধান অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের লোকবাহুল্যের কথাও ঘোষণা করিয়া দেওয়া যায়।

আজকালকার দাসমনোভাববিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের চিন্তার লৌহগণ্ডির ধরনটা এই। সাম্রাজ্যবাদের আমলে বর্ত্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা যদি অযোগ্য অক্ষম ও দোষদুষ্ট বলিয়া ধরা পড়িয়া যায়, যদি উহা বর্ত্তমান লোকগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটাইতে না পারে, সাধারণ ভাবে যে-লোকবৃদ্ধি হইবে তাহার জন্য সুব্যবস্থা না করিতে পারে (উন্নততর ব্যবস্থায় যে ইহা করা যাইতে পারিত তাহা সর্ব্বজনস্বীকৃত), তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করা হয় এই যে—ব্যবস্থার উন্নতি না করিয়া লোকসংখ্যা ছাঁটিয়া কমাইয়া ফেল। "লোকটা যখন খাটের চেয়ে লম্বা, তখন উহার পা দুইখানা কাটিয়া দাও।"

১৯৩৩ সালে লণ্ডনের হাইজিন এ্যাণ্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের স্কুলে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণ'-সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ কুজ্‌ঝিন্‌স্কিকে 'লোকসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা বিষয়ে জীবিত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' বলিয়া অভিহিত করেন, আধুনিক সংখ্যাতাত্ত্বিক অর্থনীতিকদের মধ্যেও ডাঃ কুজ্‌ঝিন্‌স্কি একজন ধুরন্ধর। লোকবৃদ্ধির ভ্রান্ত মতবাদের স্বরূপ ইনি এই সম্মেলনে নির্ম্মম ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া দেন:

> "এক স্থির নিশ্চল দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া এই সব জিনিস দেখিলে চলিবে না। আমাদের বলা হইতেছে যে, ভারতে কুড়ি কোটি একর জমিতে চাষ করা হইয়া থাকে এবং ভারতের লোককে ভালো ভাবে খাইতে দিবার জন্য পঁয়ত্রিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ একর জমিতে চাষ করা চাই। কিন্তু এত জমি

দরকারই বা কেন এবং কি অবস্থায়ই বা এত জমির দরকার? যদি উপযুক্ত সার আমরা ব্যবহার না করি, যদি কৃষিপদ্ধতির উন্নতি সাধন আমরা না করি, তবেই এত জমির প্রয়োজন। এক বা দুই বছরের ভিতর যতটুকু শিক্ষা দেওয়া যায় এবং ইহার ভিতর ভারতীয় কৃষক সহজে যতটুকু শিখিতে পারে, তাহার বেশী কিছু শিক্ষা না দিয়াই যে আমরা কুড়ি কোটি একর জমি হইতেই সকল ভারতীয়ের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করিতে পারি, যিনি আধুনিক কৃষিকার্য্যের কিছুও জানেন, তিনি একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্বাস্থ্যের বিধিবিধানের দ্বারা ভারতবর্ষের মৃত্যুর উচ্চ হার রোধ করা যেমন সম্ভব, কৃষির উন্নতি সাধন করিয়া খাদ্যের অভাব মিটানোও ঠিক তেমনই সম্ভব।"

"বৃটিশ ভারতের সম্পদ সম্পর্কিত স্মারকলিপিতে" (১৮৯৪) স্যর জর্জ ওয়াট্‌স্ যে-কথা বলিয়াছিলেন তাহাও আমরা স্মরণ করিতে পারি (৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)। তাঁহার মতে কৃষি বিষয়ে "ভারতের উৎপাদনশক্তি সহজেই শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ানো যাইতে পারে", এবং "যে-সব উপকরণের সদ্ব্যবহার করা হয় নাই তাহাদের পরিমাণ এবং মূল্য বিচার করিয়া দেখিলে জগতের খুব কম দেশেই কৃষি-শ্রীবৃদ্ধির এত চমৎকার সম্ভাবনা আছে।"

সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক কয়েকজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞ খুব সম্প্রতি যে-পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়াছেন তাহাতেও ম্যালথুসের লোকবৃদ্ধির পুরা মতবাদটাই ফাঁসিয়া যায়। অধ্যাপক এ. ভি. হিল ইহার মুখবন্ধে বলিয়াছেন যে, এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল "এমন একটা বন্দোবস্ত করা যাহার সাহায্যে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি সহজ বাস্তব এবং ফলদায়ী ব্যবস্থা কাজে পরিণত করিয়া সাত বৎসরের মধ্যে ভারতের খাদ্য-উৎপাদন সর্ব্বসাকুল্যে সওয়া গুণ হইতে দেড়গুণ পর্য্যন্ত বাড়ানো যায়।"

('ভারতের জন্য একটি খাদ্য পরিকল্পনা', ১৯৪৫)

বাংলার ১৯৩১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টের ভূমিকায় খাদ্য এবং লোক সমস্যার যে-আলোচনা আছে তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

"যে-লোকসংখ্যা এখনই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘন লোকবসতির মধ্যে অন্যতম তাহারই এত বেশী বৃদ্ধির সম্ভাবনায় অথবা নিশ্চয়তার

মধ্যে হয়তো এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, বাংলার লোকসংখ্যা বাড়িয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইবে যখন বাংলাদেশের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা তাহাদের জীবনযাত্রার কোন একটা যুক্তিসঙ্গত মানদণ্ড বেশী দিন রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। বাংলার অধিবাসীদের একটা অত্যন্ত বড় অংশের জীবনযাত্রার মান যে অত্যন্ত নীচু এবং এই প্রদেশের বিভিন্ন সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি করা না হইলে লোকবৃদ্ধির ফলে যে কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এখানে এই কথাই বলা হইতেছে যে এই সব সম্পদ এমন ধরনের যে লোকসংখ্যার প্রচুর বৃদ্ধি হইলেও এই প্রদেশের লোকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিবে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলারও অব্যবহৃত সম্পদের জন্য এবং ব্যবহৃত সম্পদ কাজে লাগাইবার অব্যবস্থার জন্য কুখ্যাতি আছে। জমির অবস্থা আরও খারাপ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না, এবং যে-সব স্থানে কম সার দেওয়ার ফলে কম ফসল হয়, বাংলার মতো সেই সব এলাকা সম্পর্কে সাধারণ মত হইল এই যে, ফলনের নিম্নতম অবস্থা অনেক আগেই আসিয়া গিয়াছে, জমিতে উদ্ভিদের উপযোগী খাদ্যের পরিমাণ প্রাকৃতিক নিয়মে কতখানি আসিতে পারে তাহার উপরেই এখানে মাটির গুণাগুণ নির্ভর করিতেছে। বাংলার কৃষক কার্য্যত কখনই সার দিয়া জমির উর্ব্বরতা বাড়ায় না; এবং সারের ব্যবহার ও চাষের যন্ত্রপাতির উন্নতি করা হইলে হয়তো ফসলের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। হিসাব করা গিয়াছে (জি ক্লার্ক : ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশনের বিবরণী) যে, কৃষিপদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। আরও ভালো করিয়া চাষ করিবার জন্য যে বাড়তি পরিশ্রমের দরকার হইবে, তাহা যে সহজেই পাওয়া যাইবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ বাংলার কৃষক মোটের উপর যত কম পরিশ্রম করে, তত কম পরিশ্রম বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কৃষককে করিতে হয় না। ১নং হিসাবে ইহাও দেখা যাইবে যে চাষের যোগ্য মোট জমির মাত্র সাতষট্টি ভাগে এখন চাষ হইতেছে। যদি সমস্ত চাষের জমিতে চাষ করা হয় এবং শতকরা ত্রিশ ভাগ ফসল বৃদ্ধির জন্য যদি চাষের উন্নততর

উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে সোজা ত্রৈরাশিক নিয়ম হইতেই দেখানো যাইতে পারে যে বর্ত্তমান জীবন যাত্রার মান বজায় রাখিয়া বাংলা দেশ তাহার ১৯৩১ সালের লোকসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ লোকসংখ্যার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে পারে।"*

ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য ইওরোপীয় দেশের মধ্যে আসল তফাৎ লোকবৃদ্ধির হার নহে; ইওরোপের দেশে লোকবৃদ্ধি আরও তাড়াতাড়ি হইয়াছে। ইওরোপ এবং ভারতের আসল তফাৎ হইল এই যে, ইওরোপের দেশে যে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং উৎপাদনের বিকাশ হইয়াছে (এবং যাহাতে তাড়াতাড়ি লোকবৃদ্ধির সুবিধাও হইয়াছে) ভারতবর্ষে তাহা হয় নাই; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এবং চালে তাহা কৃত্রিম উপায়ে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাই দেশের জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান একটা অংশকে আদিম উপায়ে অনুসৃত কৃষির দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। ফলে কৃষির যতটা বোঝা বহিবার শক্তি তাহারও বেশী চাপ তাহার উপর পড়িয়াছে। দেশের ঐশ্বর্য্য বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, শিল্পোন্নতি এবং অন্যান্য উপায়ে উন্নতির পথেও বাধা আসিয়াছে। কাজেই কৃষিই দেশের লোকের জীবন নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় হইয়া উঠিয়াছে। ফলে কৃষিব্যবস্থাও মর্ম্মান্তিক ভাবে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, অবহেলা এবং অবনতির দিকে নামিয়া গিয়াছে।

ভারতের মানুষের ভয়াবহ দারিদ্র্যের রহস্য হইল ইহাই। মানুষের হাতের বাহিরের কোন প্রাকৃতিক কারণ বা লোকবৃদ্ধির কাল্পনিক কারণ ভারতের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী নহে। ইহার জন্য দায়ী হইল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমলে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে ইহারই সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হইবে। এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ যে-রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা হইল এই যে, ভারতের সাধারণ মানুষকে বাঁচিতে হইলে ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক রূপান্তর চাই-ই চাই। এই বিশ্লেষণ হইতেই সে-সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য ভাবে দেখা দেয়।

* বাংলার আদমশুমারির রিপোর্ট, ১৯৩১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুইটি পৃথক জগৎ

"এক শত বছরেরও বেশী কাল ধরিয়া বৃটিশ শাসন চলিবার পরেও আমাদের গ্রামাঞ্চলে দেখিয়াছি, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব বরাবর চলিয়া আসিতেছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং ঔষধপত্র ও চিকিৎসাব্যবস্থার অভাব রহিয়া গিয়াছে, যানবাহনের উপায়ের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে, শিক্ষাসংক্রান্ত সাহায্য-সঙ্গতির দৈন্য এবং এক সর্ব্বব্যাপী হতাশার মনোভাব সেখানে বিদ্যমান। এই সব লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ শাসনের কল্যাণকর ফলাফল সম্পর্কে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেশে সোভিয়েট রুশিয়ার কথা বলা অপরাধের শামিল; কিন্তু এই দুই দেশের মধ্যে তুলনায় যে-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাহার উল্লেখ না করিয়া আমি পারি না। কী অসামান্য উৎসাহ ও নৈপুণ্য সহকারে সোভিয়েট রুশিয়ার অধিবাসীরা খাদ্য-উৎপাদন, শিক্ষাদান ও রোগ প্রতিরোধের বিধিব্যবস্থা উন্নতির পথে পরিচালনা করিয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি তাহাদের প্রশংসা করিয়াছি, এবং আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে তাহাদের প্রশংসা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহাদের ঈর্ষাও করিয়াছি। সোভিয়েট ইওরোপ ও সোভিয়েট এশিয়ার মধ্যে অবিশ্বাস বা অপমানজনক বৈষম্যের কোনো ভেদরেখা নাই। সেদেশে ও এদেশে যে-অবস্থা আমি বস্তুত প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আমি তাহাই তুলনা করিতেছি মাত্র। এবং আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তথাকথিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া আমাদের যে-দশা ঘটিয়াছে তাহার জন্য দায়ী—এই সাম্রাজ্যের শাসক ও শাসিত অংশের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।" *

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৩৬

'ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যে-রূপ এবং ভারতবর্ষ যে-রূপ গ্রহণ করিতে পারে তাহার প্রাথমিক চিত্রটি একটা ব্যবহারিক নিদর্শনের সাহায্যে ভালো করিয়া শেষ করা যাইতে পারে।

গত বিশ বছর পূর্ব্বেও এই ধরনের তর্ক করা সম্ভব ছিল যে, ভারতের সম্পদ বৃদ্ধি এবং দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে সাম্রাজ্যবাদের

* ইংরেজী হইতে অনূদিত—অনুবাদক

অসামর্থ্যের জন্য তাহার নিন্দাবাদ করাটা একটা অবাস্তব দৃষ্টি প্রসূত সমালোচনা মাত্র। বলা চলিত যে পশ্চাদ্‌পদ এবং প্রধানত নিরক্ষর বিরাট জনসংখ্যায় ভরা এবং অত্যন্ত নিম্নস্তরের উৎপাদনের রীতি ও পদ্ধতি আশ্রয়ী এই প্রাচ্য দেশের অবস্থার ভিতর যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বর্ত্তমান—তাহা উপরোক্ত সমালোচনার ভিতর ধরাই হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থা যে রসাতলে গিয়া পৌঁছিয়াছে একথা যাঁহারা শাসকদের সাফাই গাহিতেন তাঁহারাও বিনা দ্বিধায় স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ৎ হিসাবে তাঁহারা বলিতেন যে, কোনো শাসনের আমলেই ইহার বেশী কিছু করা সম্ভব নহে এবং সম্ভব হইতও না।

এই যুক্তি যে ঠিক—একথাটি পর্য্যন্ত আজ আর উচ্চারণ করা চলে না। আধুনিক কালের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ অবস্থার ভিতরেও দ্রুত-রূপান্তরের সম্ভাবনার দিগ্বলয় প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্কের পুনরুত্থান ও নবজীবন লাভ এদিক দিয়া শিক্ষাপ্রদ এবং ভারতের পক্ষে সে-শিক্ষা জরুরিও বটে। কিন্তু বিশেষ করিয়া গত বিশ বৎসরের ভিতর সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাই আরও শিক্ষাপ্রদ। উৎপাদনের রীতি ও পদ্ধতির দিক দিয়া অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ, সংগঠনের দিক দিয়া অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং নিরক্ষর মানুষে ভরা এক বিরাট ভূখণ্ডের উপর বিপ্লব বহিয়া গিয়াছে। এশিয়া এবং ইওরোপের বিবিধ জাতিকে উহা এক করিয়া দিয়াছে। কত দূর উন্নতি সাধন করা সম্ভব তাহা হাতে-কলমে দেখাইয়া দিয়া ইহা পৃথিবীর সব দেশের মানুষেরই চোখ খুলিয়া দিয়াছে;—ভারতের মানুষের যে চোখ খুলে নাই তাহা নহে। বেশ খানিকটা খুঁটিনাটি ধরিয়া উভয় দেশের তুলনা করায় লাভ আছে; কারণ উন্নতিশীল এক জনতার সহিত ভারতের বর্ত্তমান প্রাণহীন নিস্তরঙ্গ অবস্থার প্রভেদের উপর উহা আলোক সম্পাত করিবে, এবং উপযুক্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় কতদূর কি করা সম্ভব তাহারও একটা আশাপ্রদ ইঙ্গিত উহার ভিতর পাওয়া যাইবে।

১। সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিশ বৎসর

১৯৩৭ সালে সোভিয়েট সোশালিস্ট রিপাবলিকের বিশ বছর সম্পূর্ণ হয়। পলাশীর যুদ্ধের বৎসরকেই ভারতে বৃটিশ শাসনের গোড়াপত্তনের বৎসর বলিয়া সাধারণত ধরা হইয়া থাকে। সেই হিসাব মতো এদিকে এই ১৯৩৭ সালেই

ভারতে বৃটিশ শাসনের ১৮০ বৎসর সম্পূর্ণ হয়। রুশিয়ায় সমাজতন্ত্র বিশ বৎসরে যাহা করিয়াছে তাহার নয় গুণ সময়ে ভারতে সাম্রাজ্যতন্ত্র কি করিতে পারিয়াছে তাহা এই তুলনা হইতেই বুঝা যাইবে।

এই দুই বিরাট ভূখণ্ডের পূর্ব্বেকার অবস্থায় গুরুতর প্রভেদ (বিশেষ করিয়া এক স্বাধীন সাম্রাজ্যতন্ত্রী দেশ এবং এক ঔপনিবেশিক দেশের ভিতরকার প্রভেদ) থাকা সত্ত্বেও দুই দিকেই বেশ একটা মিলও আছে। এই মিলকে উভয় দেশের উত্তরাধিকারগত সাদৃশ্য বলা যাইতে পারে। জনসংখ্যার ভিতর নিরক্ষর পশ্চাদ্পদ কৃষকের বিপুল সংখ্যাবাহুল্য উভয় দেশেই ছিল। দুইটি দেশই বিরাট, এবং সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বহু জাতি পর্য্যায়ক্রমে দুই দেশেই বাস করিয়া গিয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় নাই। দুই দেশেই স্বেচ্ছাচারী শাসনের ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছিল। ঘুনধরা এক গ্রাম্য ব্যবস্থা ছাড়া গণতান্ত্রিক রূপের সহিত পরিচয়ও উহাদের ছিল না। এই সব দেখিয়া রুশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিশ বছরের কাজ এবং ভারতে সাম্রাজ্যতন্ত্রের একশ' আশি বছরের কীর্ত্তি তুলনা করিবার লোভ জাগে।

সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ধারণা হইল আগেকার শোষণ-ব্যবস্থার বদলে সকলের জন্য উৎপাদনের সংগঠন। এই ধারণাটি আধুনিক এবং আধুনিক অবস্থা হইতেই ইহার জন্ম। এক শত বছরেরও কম হইল এই মতবাদ অবাস্তব কল্পনার রাজ্য ছাড়িয়া বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করিয়াছে। কেবল এই আমাদের যুগেই নূতন সমাজব্যবস্থার বাস্তব রূপ এবং অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এই বিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। আজ সমাজতন্ত্র বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কাজেই এখন শুধু কথায় নহে, কাজেও সমাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখা সম্ভব।

এই তুলনার জন্য আমরা জারের আমলের রুশিয়াকে ধরিতে পারি। ১৯১৭ সালে চরম বিশৃঙ্খলা ও দুরবস্থার দিনে নূতন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জারের যে-রুশিয়াকে হাতে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহাকে আমরা ধরিতেছি না, আমরা ধরিব ১৯১৩-১৪ সালে উন্নতির শীর্ষস্থানে অবস্থিত জারের রুশিয়াকে। সমাজতন্ত্র বিশ বছর পরে ১৯৩৭ সালে এই দেশের কি রূপ দিয়াছে তাহা আমরা দেখিব এই রুশিয়াকেই পটভূমিতে রাখিয়া। তাহার পর আমরা ১৯১৪ সালের যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বেকার ভারতকে লইব এবং ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের বিশ বৎসরের কীর্ত্তি পরিমাপ করিয়া দেখিব ; শেষে

সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকগুলির সহিত ভারতের তুলনা করা যাইতে পারে। এই সব স্থানে ভারতের বিশেষ সমস্যাগুলির অনুরূপ সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির দেখা মিলিবে। এখানে গোড়ার দিকে জনসাধারণের অবস্থা ভারতের তুলনায় ছিল আরও পশ্চাদ্‌পদ।

উৎপাদনশক্তির উন্নতি বিধানের গোড়ার ব্যাপারটা লইয়াই আরম্ভ করা যাক।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বড় আয়তনের শিল্পোৎপাদনের সঙ্কেতসংখ্যা ১৯১৩ সালের ১০০ হইতে ১৯৩৭ সালে ৮১৬'৪-এ গিয়া উঠে;—অর্থাৎ এই কয় বৎসরের ভিতর বৃদ্ধির পরিমাণ হইল আট গুণ। অন্য কোনো দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ইহার তুলনা মিলিবে না। এই বৃদ্ধির ভিতর শুধু রুশিয়ার শিল্প সম্প্রসারণের স্পষ্ট রূপটিই দেখা যাইতেছে না; বিদেশী মূলধনের বন্ধন হইতে মুক্ত বড় শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ছোট শিল্প ও যান্ত্রিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠার রূপই শুধু ইহার মধ্যে আছে তাহা নয়। যে-রুশিয়াকে পূর্ব্বে কৃষকের মহাদেশ বলা হইত, বিদেশী মূলধনের নাগপাশে বাঁধা আংশিক শিল্পোন্নতি ছিল যাহার সম্বল, সেই পশ্চাদ্‌পদ রুশিয়াই শিল্পোন্নতির দিক দিয়া কি করিয়া ইওরোপের সেরা স্থান এবং পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল—সেই রূপান্তরের ইতিহাসও ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। ১৯১৩ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা বিয়াল্লিশ ভাগ ছিল শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদি, ১৯৩৭ সালে তাহারই অনুপাত দাঁড়াইল শতকরা সাতাত্তর ভাগ। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে রুশিয়া মূলত কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত দেশ হইতে মুখ্যত শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত হইয়া গেল। দেশের মধ্যে যত লোক খাটিয়া খায় তাহার মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির অনুপাত ছিল আগে শতকরা ষোলো ভাগ, উহাই শতকরা একত্রিশ ভাগে গিয়া উঠিল। ১৯১৩ সালে জাতীয় আয় ছিল দুই হাজার একশ' কোটি রুবল (১৯২৬-২৭ সালের দরদাম অনুসারে); ১৯৩৭ সালে তাহাই গিয়া দাঁড়াইল নয় হাজার ছয়শ কোটি রুবলে। এখানেও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখিতেছি সাড়ে চার গুণ।

শিল্পোৎপাদনের অথবা জাতীয় আয়ের বা উৎপাদনের কোনো সাধারণ হিসাবপত্র না রাখাটা বা সঙ্কেতসূচী রাখিবার কোনো চেষ্টা না থাকাটা ভারতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডি. বি. মীক রচিত 'ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য' নামে যে-প্রবন্ধ ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে রয়াল সোসাইটি

অব আর্ট্‌স্‌-এর ভারতীয় শাখায় পঠিত হয় তাহাতে ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলির উৎপাদনের সঙ্কেত সম্পর্কে একটা বেসরকারী হিসাব দেওয়া হয়। ১৯১০-১১ হইতে ১৯১৪-১৫ এই পাঁচ বছরের গড়-হিসাবকে একশ' ধরিয়া এই প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, উৎপাদনের হার ১৯৩২-৩৩ সালে একশত ছাপ্পান্নতে পরিণত হইয়াছে। এখানে বৃদ্ধির অনুপাত শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ; আরও দুরবস্থা হইতে শুরু করিয়া সোভিয়েটে উৎপাদনের যে-গতিবৃদ্ধি তাহার ষোল ভাগের এক ভাগ মাত্র। ১৯১১ সালে এবং ১৯২১ সালে ভারতে এক শিল্প-গণনা অনুষ্ঠিত হয়, অবশ্য ১৯৩১ সালে আর এই গণনা হয় নাই। ইহা হইতে দেখা যায় যে, 'সংগঠিত শিল্পসমূহে' অথবা যে-সব প্রতিষ্ঠানে কুড়ি জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে তাহাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯১১ সালে ছিল একুশ লক্ষ; ১৯২১ সালে তাহাই বাড়িয়া হয় ছাব্বিশ লক্ষ; অর্থাৎ বৃদ্ধির হার হইতেছে বৎসরে শতকরা ২·৪ জন এবং এই হার বিশ বৎসরের উপর চালু থাকিলে মোট বৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা আটচল্লিশ ভাগ—সোভিয়েটের বৃদ্ধির হারের ইহা মাত্র উনিশ ভাগের এক ভাগ (অবশ্য প্রথম যুদ্ধের সময়ে বা ঠিক তাহার অব্যবহিত পরে যে-হারে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই হার পরবর্তী বৎসরগুলিতে আর রক্ষিত হয় নাই)। ১৯১১ সালে শিল্পে নিয়োজিত ভারতীয় শ্রমিকের মোট হিসাব দেওয়া হইয়াছিল একশ পঁচাত্তর লক্ষ। ১৯৩১ সালে বলা হয় যে উহা একশো তিপ্পান্ন লক্ষ। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও এখানে শতকরা ১২·৬ ভাগ নিছক কমিয়া গিয়াছে। আধুনিক শিল্প বৃদ্ধি না করিয়া ছোটখাট হস্তশিল্পগুলির নিরবচ্ছিন্ন বিনাশ সাধনের প্রতিচ্ছবিই ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে। কৃষির উপর নির্ভরশীল লোক ১৯১১ সালে ছিল শতকরা বাহাত্তর জন, ১৯২১ সালে উহাই বাড়িয়া হয় শতকরা তেয়াত্তর জন। ১৯৩১ সালেও উহা একই থাকে। এদিকে কিন্তু গতর খাটানো লোকের মোট সংখ্যার অনুপাতে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত ১৯১১ সালের শতকরা ১১·৭ হইতে কমিয়া ১৯৩১ সালে শতকরা দশ জনে গিয়া দাঁড়ায়। ইহাই হইল সাম্রাজ্যবাদের কুড়ি বৎসরের কীর্তি এবং "প্রগতির" পরিচয়।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উৎপাদন সম্পর্কিত তুলনামূলক হিসাব পত্রের সাহায্যে এই রেখাচিত্রটিকে আরও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা যাইতে পারে। ১৯১৪ সালে ভারতের কয়লা তোলা হইত একশ চৌষট্টি লক্ষ টন; ১৯৩৪ সালে

তাহার পরিমাণ গিয়া দাঁড়ায় দুইশ কুড়ি লক্ষ টন। অর্থাৎ এখানে কুড়ি বৎসরের ভিতর ছাপ্পান্ন লক্ষ টন বা শতকরা চৌত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। সোভিয়েট রুশিয়ায় ১৯১৩ সালে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ দুইশ নব্বুই লক্ষ টন, ১৯৩৭ সালে তাহাই বাড়িয়া হয় এক হাজার দুই শত আশি লক্ষ টন। এখনে নয়শত নব্বুই লক্ষ টন অথবা শতকরা তি 'শ চল্লিশ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথমে যে-হিসাব ধরা হয় তাহাতে ভারতের চেয়ে এখানে উৎপাদন বেশীই হইত। তাহার পরেও সেই বেশী হিসাবেরই উপর সেখানে ভারতের চেয়ে দশগুণ তাড়াতাড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগে ভারতে ইস্পাত তৈয়ারী করা আরম্ভ হয়। ১৯৩৪-৩৫ সালেও কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র দশ লক্ষ টনে গিয়াও ঠেকিতে পারে নাই (আট লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টন)। সোভিয়েট ইউনিয়নে কিন্তু ১৯৩৭ সালে উহা একশ পঁচাত্তর লক্ষ টনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বের হিসাবের চেয়ে এখানে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে একশ ত্রিশ লক্ষ টনেরও বেশী। ১৯১৭ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ ছিল একশ নব্বুই কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা; ১৯৩৭ সালে উহাই দাঁড়াইল তিন হাজার ছয়শত পঞ্চাশ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা, এখানে বৃদ্ধি হইয়াছে আঠার গুণেরও বেশী। ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কোনো হিসাবপত্র নাই। একটা মোটামুটি আন্দাজ মতো ১৯৩৫ সালে এদেশে দুই শত পঞ্চাশ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টার বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সোভিয়েট উৎপাদন যে-স্তরে গিয়া পৌছিয়াছে এখানকার উৎপাদন তাহার চৌদ্দগুণ নীচু স্তরে বা মাথাপিছু সোভিয়েটের স্তরের ত্রিশগুণ নীচু স্তরে পড়িয়া আছে।

মোট জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশের রূপান্তরের ভিতর যে-গুরুত্ব আছে, তাহারই জন্য কৃষির ক্ষেত্রে প্রভেদটা আরও চোখে পড়িবার মতো। জারের রুশিয়ার ভূমিবুভুক্ষু দারিদ্র্যক্লিষ্ট কৃষকদের জমিদার মহাজন ও বড় বড় কৃষকদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত; সেই উৎপীড়িত চাষীরাই হইল আজিকার স্বাধীন ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার কৃষক। তাহারা আজ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রাদি ও রীতির সাহায্যে বড় বড় যৌথ কৃষিক্ষেত্রে চাষ আবাদ করিতেছে। যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলন শেষ হইবার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাহারা তাহাদের আর্থিক আয় তিন গুণ বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। চাষের এলাকাও ১৯১৩ সালের চেয়ে প্রায় তিন ভাগের একভাগ বাড়িয়া

গিয়াছে; এদিকে সঙ্গে সঙ্গে শস্যোৎপাদনও বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সালে আশী কোটি 'সেণ্টনার' শস্য উৎপন্ন হইত। ১৯৩৭ সালে কিন্তু উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হইল বার শত কোটি 'সেণ্টনার' অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বাড়িয়াছে দেড়গুণ। ১৯১৩ সালে কাঁচা তুলার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল চুয়াত্তর লক্ষ টন, ১৯৩৭ সালে তাহার পরিমাণ হয় দুইশত আটান্ন লক্ষ টন। এখানে বৃদ্ধি হইয়াছে সাড়ে তিনগুণ। ভারতের কৃষিসঙ্কটের কথা পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাইবে। উহা তো প্রতি বছরই আরও বেশী ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। জমিদার মহাজন ও গভর্নমেণ্ট—ইহারা সকলে মিলিয়া চতুর্দিক হইতে যে-চাপ দিতেছে তাহাতে কৃষক সম্প্রদায় নিঃস্ব ভূমিহারা ভিখারীতে পরিণত হইতেছে। এদিকে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত জমির ও উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কোন মতে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার চেয়ে বেশী হইলেও গত কয়েক বৎসরের ভিতর ইহার পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার ভীতিপ্রদ লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

উৎপাদনের মূল উপায় এবং সম্পদ বৃদ্ধির দিক হইতে জনসাধারণের শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ কল্পে রাষ্ট্রের সামাজিক বিধানগুলির দিকে চোখ ফিরাইলে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভিতরকার যে-প্রভেদটা আমরা দেখিতে পাইব তাহাও বড় কম নয়।

শিক্ষার কথা ধরিতে গেলে জারের আমলে ইচ্ছা করিয়াই জনসাধারণকে নিরক্ষর করিয়া রাখা হইত; জনসাধারণের শতকরা আটাত্তর জনই ছিল নিরক্ষর। এখন কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে নিরক্ষরের সংখ্যা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা আটজন। ১৯৩০ সালের বিধানে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া যায় এবং ১৯৩৪ সালের বিধান এই ব্যবস্থাকেই আরও আগাইয়া লইয়া গিয়া সকলের জন্য সাত বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার বিধি প্রবর্ত্তন করে। এখন বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রাথমিক শিক্ষার সময় বাড়াইয়া দশ বৎসর করা হইতেছে।

ভারতবর্ষে ১৯১১ সালে জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা চুরানব্বুই জন নিরক্ষর ছিল। ১৯৩১ সালেও নিরক্ষর ছিল শতকরা বিরানব্বুই জন। বিশ বছরের ভিতর সাম্রাজ্যবাদ মোট জনসংখ্যার মাত্র পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগের নিরক্ষরতা কমাইতে পারিয়াছে।

১৯৩৭ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

দুইশ চুরানব্বুই লক্ষ ছেলেমেয়ে শিক্ষালাভ করিত। ইহারা মোট জনসংখ্যার প্রায় সাড়ে সতেরো ভাগ। জারের আমলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মোট ৭৮ লক্ষ।

১৯৩৪-৩৫ সালে বৃটিশ ভারতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে-সব ছেলেমেয়ে কোন রকম শিক্ষা পাইত, হিসাব মতো তাহাদের সংখ্যা হইতেছে একশ পঁয়ত্রিশ লক্ষ অর্থাৎ ইহারা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪·৯ জন। কিন্তু এই সব ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া কঠিন। ইহাদের তিন ভাগের দুই ভাগ লেখাপড়ার প্রথম বৎসরই পার হইত না। আর পাঁচ ভাগের এক ভাগও লেখাপড়ার চতুর্থ বৎসরে গিয়া পৌছিত না; অথচ চার বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইবার কথা ("ভারতে শিক্ষা, ১৯২৮-২৯," ১৯৩১, পৃঃ ২৮ দ্রষ্টব্য)। কাজেই, চার বৎসরের প্রথমিক শিক্ষা সাঙ্গ করিবার যে-সরকারী নিয়ম ছিল, তাহাও শেষ করিত সরকারী হিসাবে ধরা একশ এগার লক্ষ ছেলেমেয়ের পাঁচ ভাগের একভাগ অর্থাৎ বাইশ লক্ষ মাত্র। ইহা মোট জনসংখ্যার মাত্র ০·৮ জন।

১৯৩৭ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং উচ্চশিক্ষালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ একান্ন হাজার (জারের রুশিয়ায় এই সংখ্যা ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার) অর্থাৎ ইহারা ছিল হাজার পিছু ৩·২ জন।

১৯৩৪-৩৫ সালে বৃটিশ ভারতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ছিল এক লক্ষ নয় হাজার আটাশ, অথবা মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারের মধ্যে ০·৪ জন বা সোভিয়েটের অনুপাতে ঠিক আট ভাগের এক ভাগ।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দিক দিয়া এই তফাৎটা সবচেয়ে চোখে পড়িবার মতো। অনুন্নত দেশের পক্ষে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাটা মরণ-বাঁচনের কথা। সোভিয়েট ইউনিয়নে যে-অসংখ্য টেক্‌নিকাল স্কুল বা ফ্যাক্টরী স্কুল ছড়াইয়া আছে তাহার সহিত তুলনা করিবার মতো কোনো কিছু ভারতে মিলিবে না। এক ১৯৩৭ সালেই সোভিয়েট ইউনিয়নে বিভিন্ন বিষয়ে যে-সব বিশেষজ্ঞ (শিল্প-বিশেষজ্ঞ, নির্ম্মাণ-বিশেষজ্ঞ, যানবাহন-বিশেষজ্ঞ, যান্ত্রিক কৃষিপ্রথা প্রবর্ত্তনে বিশেষজ্ঞ এবং কৃষি-বিশেষজ্ঞ) শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাঁহাদের সংখ্যা হইল পঁয়তাল্লিশ হাজার নয় শত। ভারতবর্ষে ১৯৩৪-৩৫ সালে মোট নয় শত ষাট জন, অর্থাৎ

সোভিয়েট সংখ্যার আটচল্লিশ ভাগের এক ভাগ, এবং জনসংখ্যার অনুপাতে সোভিয়েটের আটাত্তর ভাগের এক ভাগ লোক ইন্‌জিনিয়ারিং কৃষি বা বাণিজ্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

সংস্কৃতিগত উন্নতির আর একটা দিকের হিসাব লওয়া যায়। ১৯১৩ সালে রুশিয়ায় দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল আটশ' উনষাট, ১৯৩৭ সালে কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে দৈনিক সংবাদপত্র হইল আট হাজার পাঁচশ একুশ। কাজেই দেখিতেছি সংবাদপত্র বাড়িয়াছে দশগুণ। ১৯১৩ সালে সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা ছিল সাতাশ লক্ষ, ১৯৩৭ সালে প্রচারসংখ্যা উঠিয়াছে তিনশ বাষট্টি লক্ষে। দেখা যাইতেছে প্রচারসংখ্যা বাড়িয়াছে চৌদ্দগুণ। ভারতবর্ষে ১৯১৩-১৪ সালে আটশত সাতাশ খানি সংবাদপত্র ছিল; ১৯৩৩-৩৪ সালে দাঁড়ায় এক হাজার সাতশ আটচল্লিশ খানি। মোট প্রচারসংখ্যার কোনো হিসাব নাই। তবে তাহা খুবই কম। ১৯১৩ সালে রুশিয়ায় আটশ' সাতষট্টি লক্ষ কপি বই ছাপা হয়, ১৯৩৭ সালে ছাপা হয় ছয় হাজার সাত শত ত্রিশ লক্ষ অর্থাৎ মুদ্রণ-সংখ্যা প্রায় আট গুণ বাড়ে। ভারতবর্ষে ১৯১৩-১৪ সালে বারো হাজার একশ উননব্বুই খানি বই প্রকাশিত হয়; (মোট কপি ছাপার সংখ্যার কোনো হিসাব নাই) এদিকে ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রকাশিত হয় ষোলো হাজার সাতশত তেষট্টি খানা বই। অর্থাৎ কুড়ি বৎসরে মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ এই সামান্য বৃদ্ধিটুকু চোখে পড়িতেছে।

জনস্বাস্থ্য অথবা দেশের মানুষের জন্য সামাজিক মঙ্গল ব্যবস্থার দিকে নজর ফিরাইলে আমরা দেখিতে পাইব যে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রত্যেকটি মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার স্বাস্থ্য এবং কল্যাণকল্পে যে পূর্ণাঙ্গ এবং সুসংগঠিত ব্যবস্থা আছে তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ভারতের মানুষের প্রতি অপরিসীম অবহেলার পাশে সোভিয়েটে সকলের জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত, সকল রোগ বা দুর্ঘটনাজনিত অবস্থার ক্ষতিপূরণ, প্রসূতী-সদন এবং শিশু-মঙ্গল, বেতন সমেত ছুটি, শ্রমিকের বিশ্রামকেন্দ্র, বৃদ্ধ বয়সের সম্বল—এই সব ব্যবস্থা দেখিলে চমকিয়া উঠিবার কথা। এদিকে সাধারণ ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে সামাজিক বীমার যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বিলি-বন্দোবস্ত আছে, ভারতে তাহাও নাই। এখানে কোন জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইনও নাই এবং এখানে গ্রামের এবং শহরের জনসাধারণের জনস্বাস্থ্যের অত্যন্ত গোড়াকার প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা এতই নিম্ন স্তরের যে কিছু নাই বলিলেও চলে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯১৩ সালে জনস্বাস্থ্য বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল এক হাজার দুই শত আশি লক্ষ রুবল; ১৯২৮ সালে উহাই হয় ছয় হাজার নয়শত নব্বুই লক্ষ রুবল, ১৯৩৩ সালে আটত্রিশ হাজার কুড়ি লক্ষ রুবল এবং ১৯৩৭ সালে নব্বুই হাজার পাঁচশ লক্ষ রুবল। অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য বাবদ ব্যয় বাড়িয়াছে সত্তর গুণ। ১৯৩৭ সালে যে নব্বুই হাজার পাঁচশ লক্ষ রুবল খরচ হয়, তাহাতে মাথাপিছু তিপ্পান্ন রুবল করিয়া পড়ে। ভারতবর্ষে শাসন সংস্কারের জন্য শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে এবং প্রধানত প্রদেশগুলির উপর জনস্বাস্থ্য বাবদ ব্যয় বর্ত্তাইবার দরুন ১৯১৩ সালের অবস্থার সহিত সঠিক তুলনা করা যাইবে না। কিন্তু ১৯২১-২২ সালে জনস্বাস্থ্য বাবদ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট মিলিয়া মোট ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা খরচ করেন; ১৯৩৫-৩৬ সালে উহা বাড়িয়া ৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। অর্থাৎ ১৯২১-২২ সালে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের মধ্যে জনস্বাস্থ্য বাবদ খরচ হইয়াছিল শতকরা ২·১ ভাগ; ১৯৩৫-৩৬ সালে তাহাই বাড়িয়া হইল ২·৬ ভাগ। ১৯৩৫-৩৬ সালে মোট ৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ইংরেজী মুদ্রায় পরিণত করিলে দাঁড়ায় ৪৩ লক্ষ পাউণ্ড; এই হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু এগারো পয়সা পড়ে।

তুলনামূলক বিচারের একটি বাস্তব সাধারণ মাপকাঠি লওয়া যাক—অর্থাৎ হাসপাতালে 'বেড'-এর সংখ্যা কোথায় কত তুলনা করিয়া দেখা যাক। সোভিয়েট ইউনিয়নে আমরা দেখি, ১৯১৩ সালে 'বেড'-এর সংখ্যা ছিল মোট এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার এবং ১৯৩৭ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষ তিতাল্লিশ হাজার,—অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার তিন শত তেরো জনের জন্য একটি করিয়া 'বেড'। বৃটিশ ভারতে সরকারী ও সাধারণ সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান (ইহাদের মধ্যে আবার অনেকগুলি শুধু ইওরোপীয় বা সৈন্যদের জন্য) মিলাইয়া মোট 'বেড'-এর সংখ্যা ছিল ১৯১৪ সালে আটচল্লিশ হাজার চারশত পঁয়ত্রিশ, এবং ১৯৩৪ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়ায় বাহাত্তর হাজার দুইশত একাত্তর —অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার তিন হাজার আট শত দশ জনের জন্য একটি করিয়া 'বেড', সোভিয়েট ইউনিয়নের তুলনায় বারো ভাগের এক ভাগেরও কম।

১৯১৩ সালে জারের রুশিয়ায় হাজার করা মৃত্যুর হার ছিল ২৮·৩। ১৯১৪ সালে ভারতে মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ৩০ জন। এদিক দিয়া

মৃত্যুর হার কমিয়া ২০·৯ হইয়াছে, কিন্তু ভারতে ঐ বৎসর মৃত্যুর হার ছিল ২৬·৭। মস্কোতে ১৯১৩ সালে হাজার লোক পিছু মৃত্যুর হার ছিল ২৩·১, ১৯২৬ সালে হয় ১৩·৪। বোম্বাইয়ে ১৯১৪ সালে প্রতি হাজারে ৩২·৭ জন লোক মরিয়াছে, ১৯২৬ সালে মরিয়াছে ২৭·৬। ১৯১৩ সালে মস্কোতে শিশু মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ২৭০; ১৯২৮-২৯ সালের ভিতর কিন্তু ইহাকে কমাইয়া হাজার পিছু ১২০-তে দাঁড় করানো হয়। ঐ বৎসর বোম্বাইতে হাজার পিছু ২৫৫টি শিশু মারা যায়।

স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা এবং সংক্রামক ব্যাধির উপর জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রভাবের কথাটাই ধরা যাক। ১৯১৩ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে টাইফাসের হার ছিল দশ হাজারে ৭·৩, ১৯২৯ সালে ঐ হার কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ২; অর্থাৎ কমার পরিমাণ হইল শতকরা ৭২ ভাগ। ডিফথিরিয়া রোগ কমিয়াছে দশ হাজারে ৩১·৪ হইতে ৫·৯-তে; এখানে রোগ হ্রাসের অনুপাত হইল শতকরা ৮০ ভাগ; বসন্ত রোগের হার কমিয়াছে ৪·৭ হইতে ০·৩৭, অর্থাৎ শতকরা ৯০ ভাগ (এইচ. ই. সাইজেরিস্ট: 'সোশালাইজ্‌ড্ মেডিসিন ইন দি সোভিয়েট ইউনিয়ন', পৃঃ ৩৫৭)। ভারতে টাইফাস ও ডিপথিরিয়া রোগের কোনো হিসাব নাই। তবে বসন্ত রোগে মৃত্যুর তুলনা করিয়া দেখিলে বেশ শিক্ষাপ্রদ হইবে। ১৯১৪ সালে ভারতে ৭৬৫৯০ জন লোক বসন্ত রোগে মারা যায় অর্থাৎ প্রতি দশ হাজারে ৩·২ জন লোক হিসাবে; ১৯৩৪ সালে মারা যায় ৮৩৯২৫ জন, অথবা প্রতি দশ হাজারে ৩ জন; ১৯৩৫ সালে মৃত্যুর হার একটু বাড়ে। কুড়ি বৎসর পরেও ভারতে বসন্তজনিত মৃত্যুর হার একই আছে (প্রতি দশ হাজারে ৩·২ হইতে ৩); অথচ সোভিয়েট ইউনিয়নে উহা ৪·৭ হইতে ০·৩৭-এ নামিয়া গিয়াছে। প্রভেদটা লক্ষ্য করিবার মতো নয় কি?

সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯১৩ সালে চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ১৯৮০০, ১৯৩৭ সালে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়ায় ৯৭০০০। ১৯৩৪-৩৫ সালে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে যাহারা ডাক্তারি ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাদের মোট সংখ্যা হইল ৬৩০। বিলাত হইতে যে-অল্প কয়েকজন ডাক্তারি শিখিয়া ঐ বৎসর ফিরিয়া আসে তাহাদের অবশ্য ইহাদের সহিত যোগ দিতে হইবে।

সঙ্কীর্ণ অর্থে যাহাকে শ্রমিকদের অবস্থা বলা যাইতে পারে শেষ পর্য্যন্ত [illegible] ইউনিয়নের শ্রমিকদের জন্য

বিলিব্যবস্থার বিরাট ক্ষেত্র হইতে দৃষ্টান্ত হিসাবে খাটুনির ঘণ্টা লইয়া তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বত্রই ১৯২২ সালেই দিনে ৮ ঘণ্টা খাটুনির সময় নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। ১৯২৭ সালে আবার ঐ সময় কমাইয়া দিনে ৭ ঘণ্টা করা হয়। আবার যাহারা বিপজ্জনক কাজ করে, ভূগর্ভে কাজ করে, যাহাদের মাথার কাজ করিতে হয়, যাহাদের বয়স ১৬ হইতে ১৮ বছরের মধ্যে—তাহাদের কাজ করিতে হয় দিন মাত্র ছয় ঘণ্টা। ১৪ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের কোন ক্রমেই এধরনের কাজ দেওয়া হয় না। যাহাদের বয়স ১৪ হইতে ১৬ বছরের মধ্যে, বিশেষ কারণ থাকিলে অবশ্য তাহাদের কাজ করিতে দেওয়া হয়, তাহাও আবার দিন ৪ ঘণ্টার বেশী তাহাদের খাটা বারণ।

১৯২২ সালের ফ্যাক্টরী আইন ভারতবর্ষে দৈনিক ১১ ঘণ্টা খাটুনীর নিয়ম প্রবর্তন করে; ১৯৩৪ সালের ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী উহা কমিয়া দিন ১০ ঘণ্টা হয় এবং বার বছরের ছেলে মেয়েদের কাজ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এত কম পরিদর্শক রাখা হয় (হুইট্‌লি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯২৯ সালে সারা ভারতবর্ষে মাত্র ৩৯ জন ইনস্‌পেকটার ছিল) যে বছরে সব কারখানা একবার করিয়া পরিদর্শন করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে আইন, বিশেষ করিয়া বালক বালিকা নিয়োগ সম্পর্কিত আইন এড়াইয়া যাওয়া সহজ। তাহার উপর ফ্যাক্টরী আইন খুব কম শ্রমিকদের উপরই প্রযোজ্য (১৯৩৬ সালে ইহার আওতায় আসিত ১৬ লক্ষ শ্রমিক, কিন্তু ১৯৩১ সালের আদমশুমারির হিসাবেই দেখা যায় যে কেবল শিল্প এবং যানবাহনাদিতেই কাজ করে ১৭৭ লক্ষ শ্রমিক)। ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ শ্রমিকেরই খাটুনির কোন ঠিকঠিকানা নাই; তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা নাই; ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শোষণের সীমাও নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই। পাঁচ বছরের শিশুকেও যে দিন ১২ ঘণ্টা খাটিতে হইতে পারে, এ কথা তো হুইট্‌লির রিপোর্টেই লেখা আছে।

এখানে যে-সব প্রভেদ দেখানো হইল তাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কঠোর সত্য। কাজেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ব্বিশেষে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এই রায়ই দিতে হইবে যে, সভ্যতা ও বর্ব্বরতার মধ্যে যে-প্রভেদ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের অবস্থার মধ্যেও সেই প্রভেদই বর্ত্তমান।

কিন্তু বিশ বছর পূর্ব্বেও জার-শাসিত রুশিয়া এবং বৃটিশ-শাসিত ভারতের

জনসাধারণের অবস্থার মধ্যে এত দুস্তর ব্যবধান ছিল না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ বছরের ভিতরেই এই রূপান্তর সাধন করিয়াছে। কাজেই অনুরূপ রাজনৈতিক অবস্থা দেখা দিলে এবং শ্রেণীশক্তিসমূহের সম্পর্কের পরিবর্ত্তন ঘটিলে ভারতেরও যে রূপান্তর সম্ভব একথা তো বুঝাই যাইতেছে।

২। মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকগুলির অভিজ্ঞতা

সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকগুলি যে-সাক্ষ্য দিতেছে তাহাতেও এই কথা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া যায়।

১৯১৩ সালের গোটা জারের রুশিয়ার অবস্থা আজিকার ভারতের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে একথা অবশ্য সন্দেহাতীত রূপে সত্য বলিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, গোড়াতে ভারতের-অবস্থার স্তরটা ১৯১৩ সালের জার-শাসিত রুশিয়ার অপেক্ষাও নীচু। অবশ্য পরবর্ত্তী কালের উন্নতির হারের পরিবর্ত্তনের তুলনার ক্ষেত্রে এই স্বীকারোক্তির কোনও সম্পর্ক নাই। (প্রকৃতপক্ষে ১৯১৩ সালের পূর্ব্বে দশ বৎসরে সারা জগতের উৎপাদনের স্তরের হিসাবে জারের রুশিয়া পিছু হটিয়াই যাইতেছিল)। কিন্তু উপরোক্ত তথ্যই মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকগুলির উন্নতির কথাটাকে আরও অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। বিশ বছর পূর্ব্বে এই দেশগুলি আজিকার ভারতের চেয়েও পিছনে পড়িয়া ছিল; অথচ আজ তাহারা প্রচুর উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। ভারতের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে বিশেষ মূল্যবান।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে প্রভেদটাই অবশ্য চোখে পড়িবার মতো; মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকগুলির কথা ধরিলে সে-প্রভেদ আরও চোখে পড়িবে। ভারতের অবস্থার সহিত এই সব অঞ্চলের অবস্থা প্রথম দিকে বেশ ভালো ভাবেই মিলিয়া যাইত; ভারতেও যে-সব বিশেষ বাধা-বিপত্তি আছে, এখানেও সে-সব ছিল। এই দেশগুলিতে জনসাধারণের অবস্থা ভারতের জনসাধারণের চেয়ে ঢের খারাপ ছিল। ইহারা ছিল ঢের বেশী পশ্চাদ্পদ, ঢের বেশী অত্যাচারিত ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট। এশিয়ার অর্থনীতি এবং সামাজিক ব্যবস্থার সহিত যে-সব বিশেষ সমস্যা জড়াইয়া আছে, যেমন নারীর স্থান, ধর্ম্ম ইত্যাদি, সে-সবের চরম রূপই এখানে দেখা যাইত। কাজেই, পশ্চাদ্পদ জাতির বেলায় সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রভেদ এখানে আমরা যেমন দেখিতে পাইব এমনটি আর কোথাও পাইব না।

মধ্য এশিয়ার তিনটি সোভিয়েট সোশালিস্ট রিপাব্‌লিক সমমর্য্যাদাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসনাধীন রিপাব্‌লিক হিসাবে সাতটি সোভিয়েট সোশালিস্ট রিপাবলিকের অন্তর্গত। ইহারা হইল তুর্কমেনিস্তান (আয়তন ১৭১০০০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা সাড়ে বার লক্ষ), উজবেকিস্তান (আয়তন ৬৬০০০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ), এবং তাজিকিস্তান (আয়তন ৫৫০০০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ১৫ লক্ষ)। ইহাদের সহিত কারাকালপাক স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক এবং কিরঘিজ স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিকও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই পাঁচটি গণতন্ত্র কাজাখস্তানের পশ্চিমে এবং ভারতের সীমান্তের খুবই কাছে।

"কাজাখস্তানের দক্ষিণে রহিয়াছে মধ্য এশিয়া—পাঁচটি সমাজতান্ত্রিক রিপাব্‌-লিক ; যে-জাতিগুলি এই পাঁচটি রিপাব্‌লিকে বাস করে, তাহাদের নামেই ইহাদের নাম :—উজবেক, তুর্কমেন, তাজিক, কিরঘিজ এবং কারাকালপাক রিপাব্‌লিক।

"ইহা হইল সোভিয়েট ইউনিয়নের একেবারে দক্ষিণ অঞ্চল। এখানে সোভিয়েট অঞ্চল ইরান, আফগানিস্তান এবং পশ্চিম চীনের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মধ্য এশিয়ার সীমানা হইতে ১৫ কিলোমিটার পরেই ভারতবর্ষের সীমানা আরম্ভ হইয়াছে।

"বিপ্লবের পূর্ব্বে মধ্য এশিয়া ছিল আধা-দাস এবং ঔপনিবেশিক শ্রমিকের দেশ। এখন ইহা সমমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতি, সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা এবং নবনির্ম্মিত শিল্পব্যবস্থার দেশে পরিণত হইয়াছে।"

(মিখাইলভ : "সোভিয়েট ভূগোল", ১৯৩৭, পৃষ্ঠা ৬-৭)

তাজিকিস্তান ভারতবর্ষ হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। উহার কথা লইয়াই আরম্ভ করা যাক। আগে তাজিক জনসাধারণের জীবন আদৌ সুখের ছিল না। বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত তাহারা রুশ জারের এবং বোখারার আমীরের মধ্যযুগীয় ধর্ম্মান্ধ স্বেচ্ছাচারিতার জোয়ালে বাঁধা ছিল। জারের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর যে-সব গৃহযুদ্ধ বাধিয়া উঠে, ১৯২৫ সালের পূর্ব্বে সে-সব যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হয় না। ১৯২৫ সালে তাজিকিস্তান স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিকে পরিণত হয় এবং স্বাধীন সংযুক্ত রিপাব্‌লিক হিসাবে ইহা ১৯২৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতর প্রবেশ করে।

জারতন্ত্রের আমলে যে অবর্ণনীয় অবনতির শৃঙ্খলে তাজিকরা বাঁধা ছিল তাহা একটি বিষয় হইতেই লক্ষ্য করা যাইবে। বিপ্লবের পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে শতকরা মাত্র আট জন লোক লিখিতে পড়িতে পারিত (ভারতবর্ষে ১৯১১ সালে লিখিতে পড়িতে পারিত শতকরা ৬ জন)। ১৯৩৩ সালের মধ্যেই কিন্তু ইহাদের শতকরা ৬০ জন লেখাপড়া শিখিয়া ফেলিয়াছে (ভারতবর্ষে কিন্তু ১৯৩১ সালে লেখাপড়া শিখিয়াছে শতকরা মাত্র ৮ জন)। ১৯৩৬ সালের ভিতর এই দেশে ৩০০০ স্কুল অর্থাৎ প্রতি ৫০০ জন লোক পিছু একটি স্কুল, উচ্চ শিক্ষার পাঁচটি প্রতিষ্ঠান, এবং ত্রিশটিরও উপর শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সালে স্কুলের ছাত্র ছিল ৩২৮০০০ (১৯১৪ সালে ছিল ১০০ জন)। ১৯৩৯ সালের ভিতর উচ্চশিক্ষার জন্য ২১টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৪ সালে এখানে আবাদী জমি ছিল ১০০৫০০০ একর। ১৯৩৬ সালে উহা বাড়িয়া হইয়াছে ১৬২৬০০০ একর। তুলাই হইল এখানকার সর্ব্বপ্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এখানকার অধিকাংশ কৃষকই যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা অনুযায়ী এখন চাষ-আবাদ করে। তুলার চাষও প্রধানত যন্ত্রের সাহায্যেই চলিতেছে। ভূমি কর্ষণ, বীজবপন ইত্যাদি হইতেছে প্রধানত ট্র্যাক্টরের সাহায্যে। এখানকার সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> "তুলা চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি সেচ-ব্যবস্থার উপরই অনেকটা নির্ভর করিয়াছে। ১৯২৯ সালে তাজিকিস্তান সেচ-ব্যবস্থার পিছনে মোট ৩০ লক্ষ রুবল খরচ করে, ১৯৩০ সালে খরচ করে ১২০ লক্ষ রুবল; ১৯৩১ সালে এ সম্পর্কে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৬১০ লক্ষ রুবল, অর্থাৎ মাথাপিছু ৫০ রুবল। ইহার বেশীর ভাগ টাকা আসিয়াছে স্থানীয় জনসাধারণের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের দেওয়া সাহায্য হইতে।"*

ভারতবর্ষের সেচ-ব্যবস্থার সহিত এখানকার প্রভেদ আকাশ-পাতাল। ভারতবর্ষে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি গদাই লস্করী চালে চলিয়াছে; এমন কি পূর্ব্বে সেচের যে-সব বন্দোবস্ত ছিল তাহার দিকেও নজর দেওয়া হয় না। সেগুলি ঠিক রাখার জন্য যে-সব মেরামত দরকার তাহাও হয় না। এদিকে সেচের নূতন

* জোশুয়া কুনিৎস : 'ডন ওভার সমরকন্দ', ১৯৩৫, পৃঃ ২৩৫

যে সামান্য কাজকর্ম্ম হইয়াছে (১৯১৩-১৪ সালে সেচ-ব্যবস্থার আওতায় আসিত ৪৬৮ লক্ষ একর জমি ; ১৯৩৩ সালে উহাই দাঁড়াইয়াছিল ৫০৫ লক্ষ একরে), তাহাও মূলধন খাটানোর ভিত্তিতে হইয়াছে। সেচের বন্দোবস্তের জন্য যে-টাকা খাটানো হইয়াছে তাহার বদলে কৃষকের নিকট হইতে মোটা টাকা দাবী করা হয় ; সুদের পরিমাণ শতকরা ৭ টাকা। কাজেই ইহাতে কৃষকের ঘাড়ে একটা বাড়তি বোঝা চাপিয়াছে। সেচের জন্য যেটুকু সুবিধা হইবার কথা তাহাও দরিদ্র কৃষকের নাগালের বাইরে চলিয়া গিয়াছে।

ওদিকে যেখানে শিল্প জিনিসটাই ছিল অজানা, সেখানে শিল্পের দ্রুত প্রসারটা আরও বিস্ময়কর। পূর্ব্বেকার ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিকে কৃষি-এলাকা বলিয়া ঠেলিয়া রাখা এবং বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শহরাঞ্চলে শিল্পকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার কথা সমাজতন্ত্রের আমলে উঠিতে পারে না। তাহার বদলে বরং আগে যে-সব স্থান পিছনে পড়িয়াছিল সেই সব স্থানেই শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প বৃদ্ধির জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছে।

> "বিপ্লবের দিন পর্য্যন্ত তাজিকিস্তানে কোন শিল্পই ছিল না। আজ এখানে জিনিস তাজা রাখিবার কারখানা, সিল্কের কারখানা চলিতেছে। এ সবই গত কয়েক বৎসরের মধ্যে গড়া।...'ভারজোব্‌স্ক' বৈদ্যুতিক শক্তির স্টেশন এখন সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। উহা শহরের সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবে।...স্টালিনাবাদে বস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাগুলি পুরা দমে কাজ করিয়া চলিয়াছে। লেনিনাবাদে সিল্কের এক বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ চলিতেছে। কাপড়ের, মাংসের, মদের এবং সিমেণ্টের এক একটি কারখানার বাড়ী তৈয়ারী এই বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। ইট তৈয়ারীর দুইটি কারখানা, দুইটি তেলের কল, তুলা পরিষ্কার করিবার দশটি কারখানা, দশটি ছাপাখানা ইত্যাদিও চালু হইয়াছে।"*

বিপ্লবের পূর্ব্বে তাজিকিস্তানে আধুনিক পথঘাটও ছিল না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাজিকিস্তানে ১৮১ কিলোমিটার রেলপথ ও ১২০০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করা হয় ; ইহার মধ্যে ৬০০০ কিলোমিটার মোটর চলাচলের যোগ্য চমৎকার পথ।

* সোভিয়েট ট্রেড ডেলিগেশন ইন বৃটেন, 'মান্থলি রিভিউ,' অক্টোবর, ১৯৩৬, পৃঃ ৫৫২

জনস্বাস্থ্যের কথা ধরা যাক। ১৯১৪ সালে তাজিকিস্তানে ডাক্তার ছিল ১৩ জন; ১৯৩৯ সালে হইয়াছে ৪৪০ জন। ১৯১৪ সালে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ছিল ১০০টি, ১৯৩৯ সালে ৩৬৭৫। ১৯১৪ সালে প্রসূতি-আগার বা হাসপাতালে প্রসূতিদের কোন বেড্ ছিল না, ১৯৩৭ সালে আছে ২৪০টি। ১৯১৪ সালে প্রসূতি-সদন এবং শিশুমঙ্গল-কেন্দ্র মোটেই ছিল না। ১৯৩৭ সালে হইয়াছে ৩৬টি।

সমাজতন্ত্র তাজিক জনসাধারণের ভিতর যে-নূতন প্রাণের জোয়ার আনিয়াছে, এক তাজিক যৌথ কৃষকের গানে তাহা চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। জোশুয়া কুনিৎস তাঁহার 'ডন ওভার সমরকন্দ' গ্রন্থে এই গানটি তুলিয়া দিয়াছেন:

"স্বাধীন এবং উষ্ণ আমার নিঃশ্বাসবায়ু
আমাদের রুক্ষ ভূমিতে যখন লাঙ্গল চলতে দেখি
যখন দেখি একটা তৈরী বাঁধ
এই নূতন জীবনের জন্যে যারা চেষ্টা করছে
তাদের যখন আমার সঙ্গে দেখি,
তখন আমার কী আনন্দই না হয়!
যেমন আনন্দ হয় বাপের ছেলেকে দেখে।
আমার ছেলেকে যখন মাঠের ভিতর দিয়ে
একটা মেশিন চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখি,
তখন আমি আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে বলি:
'স্বাগত, স্বাগত! নতুন মানুষ!'
লাঙ্গল যখন শিকড় আর মাটি ভেদ ক'রে চলে,
তখন আমি আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠি:
'যারা পরিশ্রম করছে তারাই ধন্য, তাদেরই জয়!'
যখন আশঙ্কা হয় যে
'পুরানো পৃথিবী আবার ফিরে আসবে'
তখন আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি,
ভয়ে যেন জমে যাই।
কমরেড্! আমার হাতে দাও বন্দুক,
আমায় দাও বুলেট্,
আমি লড়াইয়ে যাব।
আমার দেশ, আমার সোভিয়েট দেশকে
আমি রক্ষা করব।"

এবার উজবেকিস্তানের দিকে লক্ষ্য করা যাক। ইহাই হইতেছে এই রিপাব্লিকগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়। এখানকার জনসংখ্যাও ৫৫ লক্ষ।

বিপ্লবের পূর্ব্বে ইহাদের শতকরা ৩-৫ জনের অক্ষরজ্ঞান ছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালের ভিতর এখানকার প্রাথমিক স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যাই হইয়া দাঁড়াইল ৫৩১০০০, মাধ্যমিক স্কুলগুলিতেও ছাত্র ছিল ১৩০০০০। তাহা ছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলিরও ছাত্রসংখ্যা হইয়া উঠিল ৭১০০০০। যৌথ কৃষির দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও উন্নতি হইয়াছে। ১৯১৩ সালে এখানকার শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ছিল ২৬৯০ লক্ষ রুবল; ১৯৩৬ সালে শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ এত বাড়িয়া গেল যে তাহার মূল্য হইল ১১৭৫০ লক্ষ রুবল। ১৯২৮ সালে এখানে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ ছিল ৩৪০ লক্ষ ইউনিট, ১৯৩৬ সালে তাহাই বাড়িয়া দাঁড়াইল ২৩০০ লক্ষ ইউনিট। শিল্পের মধ্যে এখানে দেখি ৫১টি তুলার সূতার ফ্যাক্টরী, কয়লা খনি, কৃষির যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য একটি বড় কারখানা (তাশকেন্তে), সিমেন্টের একটি কারখানা, একটি কাগজের কল, গন্ধকের একটি খনি, অক্সিজেনের একটি কারখানা, একটি চামড়ার কারখানা, এবং বহু কাপড়ের কল। ১৯১৪ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে এখানে ডাক্তারের সংখ্যা ১২৮ হইতে বাড়িয়া ২১৮৫ হয়। বিপ্লবের পূর্ব্বে এই দেশের নিজস্ব বর্ণমালা পর্য্যন্ত ছিল না। নূতন ল্যাটিন অক্ষর প্রবর্ত্তনের পর সে-সমস্যারও সমাধান হইয়া গেল। ১৯৩৪ সালের ভিতর এখানে ৫টি ভাষায় ১১৮টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। তাহাদের বার্ষিক প্রচারসংখ্যা হইল ১০০০ লক্ষেরও উপর।

এই বিরাট রূপান্তর সাধনের জন্য যে-টাকার প্রয়োজন তাহা আসিল কোথা হইতে? অনুন্নত জাতিকে শোষণের সাম্রাজ্যবাদী রীতি এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য আদান-প্রদানের সম্পর্কের ভিতর যে-প্রভেদ—তাহার উপর এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানী আলোক সম্পাত করিবে। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার আমলে উপনিবেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট অনুন্নত জনসাধারণের নিকট হইতে সালিয়ানা বাবদ একটা মস্ত বড় টাকার কর আদায় করিয়া বিদেশী শক্তির শোষক শ্রেণীর নিকট চালান দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পশ্চাদ্‌পদ জাতিগুলির দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য বাড়তি খরচ পূরণ করা হয় মোট সোভিয়েট বাজেটের একটা বড় টাকা সাহায্য দিয়া। এই পরিবর্ত্তনের সময় পশ্চাদ্‌পদ জাতিগুলি যাহা দেয় তাহার বহু গুণ তাহারা পায়। ইহার জন্য তাহাদের ঘাড়ে ঋণের বোঝা কিন্তু চাপে না। ১৯২৭-২৮ সালে বিভিন্ন সোভিয়েট রিপাব্‌লিকের মাথাপিছু ব্যয় বরাদ্দের হিসাব নিচে দেওয়া হইল ঃ

১৯২৭-২৮ সালে সোভিয়েট রিপাবলিকগুলির মাথাপিছু ব্যয় বরাদ্দের হিসাব

(রুবলের হিসাবে)

উদ্দেশ্য	রুশিয়া	ইউক্রেন	হোয়াইট রুশিয়া	ট্রান্স ককেশিয়া	উজবেকিস্তান	তুর্কমেনিস্তান	গড় খরচ
গভর্নমেণ্ট	০·৬৯	০·৮৬	১·০৬	২·২৩	১·৬০	২·৪৫	১·০২
অর্থনৈতিক শাসনবিভাগ	১·০৮	০·৮৮	১·৫৭	১·১৩	১·০৪	১·৪৬	১·০৬
সামাজিক-সংস্কৃতিক প্রয়োজন	২·১৬	১·৯২	২·৫৭	৩·৫৯	২·৪৮	৩·৮৪	২·২০
জাতীয় অর্থনীতির জন্য	১·৬৫	১·৬২	২·৩৭	৪·৯৫	৩·৩৯	৮·৯০	১·৯১
স্থানীয় বাজেটে প্রদত্ত	৫·৮৭	৫·৫৬	৫·৫৭	৬·৭০	৫·৭৭	৫·৫৮	৫·৮৩
অন্যান্য খরচ	০·০৪	—	—	০·৫৩	০·২০	—	০·০৬
মোট	১১·৪৯	১০·৮৪	১৩·১৪ *	১৯·১৩	১৪·৪৮	২২·২৩	১২·০৮

ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সকল প্রধান খরচের বেলায় রুশিয়া ও ইউক্রেন অন্যান্য রিপাবলিকগুলির পিছনে পড়িয়া আছে; অথচ ইহারাই হইল সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। পশ্চাদ্‌পদ জাতীয় রাষ্ট্রগুলির দ্রুত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের দায়িত্ব ইউনিয়নই লইয়াছে বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৯৩৯ সালের বাজেটেও এই একই ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে। সমগ্র ইউনিয়ন এবং রিপাব্‌লিকগুলির বাজেট জড়াইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের চেয়ে শতকরা ১২'৪ ভাগ বৃদ্ধি চোখে পড়ে। কিন্তু কাজাখস্তানের বাজেট বাড়িয়াছে শতকরা ২০'১ ভাগ, তুর্ক-মেনিস্তানের বাজেট বাড়িয়াছে শতকরা ২২'৪ ভাগ। রুশ সোভিয়েট রিপাবলিক তাহার এলাকার রাজস্বের শতকরা ১৮'৮ ভাগ পাইল, কিন্তু তাজিকিস্তানের বাজেট তাজিকিস্তানের রাজস্বের পুরাটাই পাইয়াছে। ১৯২৮-২৯ হইতে ১৯৩৯ সারের মধ্যে সারা সোভিয়েট ইউনিয়নের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যয় পঁচিশ গুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু তুর্কমেনিস্তানের বাড়িয়াছে ২৯ গুণ, কাজাখস্তানের বাড়িয়াছে ৩১ গুণ। নূতন শিল্প গঠনের বেলাতেও সংখ্যালঘু জাতিদের দিকে অনুরূপ বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে। কাজাখস্তানের পুরা বাজেট হইল ১৫১৩০ লক্ষ রুবল। ইহার মধ্যে ৫০৯০ লক্ষ রুবল আসিয়াছে ইউনিয়নের তহবিল হইতে কাজাখস্তানের বিরাট বলখাশ তামা গালাইবার কারখানা তৈয়ারীর জন্য। কয়লা সরবরাহের দিক দিয়া আজ কারাগান্দা সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে; শিম্‌কেণ্ট ও রিডার্স্ক-এর সীসার কারখানা হইতে আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত সীসার দুই-তৃতীয়াংশ সরবরাহ হয়।

এই ভাবে সোশালিস্ট সমাজে শিল্প বণ্টনের নূতন কাজটা সচেতন ভাবেই চালানো হইতেছে। মিখাইলভ তাঁহার সোভিয়েট ভূগোলে দেখাইয়াছেন যে পূর্ব্বে জারের সাম্রাজ্যে শিল্পগুলি ঠিক সমান ভাবে ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। রুশিয়ার শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধেক আসিত বর্ত্তমান মস্কো, লেনিনগ্রাদ, আইভানোভ অঞ্চল ইত্যাদি হইতে। অর্থনৈতিক মানচিত্রে এই অঞ্চল যেন একটি দ্বীপের ন্যায় প্রতিভাত হইত। এইখানেই শিল্পের মূলধনের জন্ম এবং বৃদ্ধি; এখান হইতেই বিজয়লোলুপ জারের নাগপাশ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে। বিরাট কৃষি অঞ্চল এবং কাঁচা মাল সরবরাহের স্থানগুলি এই শিল্প-

কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী এবং অধীন হইয়া ছিল। কাঁচামালের উৎপত্তিস্থান এবং শিল্পদ্রব্যের উৎপত্তিস্থানের মধ্যে ব্যবধান এবং দূরত্ব ছিল প্রচুর। কাজেই সমাজের অনেক পরিশ্রমের ইহাতে অপচয় হইত। কিন্তু তাহার ব্যয় বহন করিত উপনিবেশগুলি। "তুলার উৎপাদক উজবেক কৃষক ন্যায্য দর পাইত না। তাহার উপর তৈয়ারী কাপড়ের জন্য তাহাকে অত্যন্ত চড়া দর দিতে হইত।...হাতের কাজ যাহারা করিত তাহাদের পরিশ্রম বৈদ্যুতিক শক্তির চেয়ে কম খরচে পাওয়া যাইত।"

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনপ্রথা সকলের যৌথ উন্নতি এবং বিভিন্ন জাতির সমানাধিকারের ভিত্তিতে শিল্প বণ্টনের নূতন নীতি আনিয়া দিয়াছে ঃ

> "সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্রের সহিত প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দূর করিয়াছে। নিষেধাত্মক পুরাতন আইন-কানুনের বদলে বাহিরের অঞ্চলগুলির শিল্প এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল।
>
> "সোভিয়েট ইউনিয়নে সকলেরই সমান অধিকার। রুশ বিপ্লবের প্রথম দিনেই সকল জাতির সমান অধিকার আইনত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। কিন্তু কার্য্যত পূর্ব্বেকার অসাম্যের বিলোপের জন্য রুশিয়ার প্রাক্তন উপনিবেশ-গুলির জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবনতির বিলোপ সাধন প্রয়োজন।" *

এই নীতিই ১৯২৩ সালে স্টালিন রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ

> "সীমান্তের প্রদেশসমূহে এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়া পিছাইয়া-পড়া অঞ্চলগুলিতে স্কুল ও ভাষার দিকে নজর দেওয়া ছাড়াও শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্যও রুশ মজুর শ্রেণীকে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। এই সব অঞ্চল নিজেদের দোষে পিছাইয়া যায় নাই, পূর্ব্বে উহাদের শুধু কাঁচা মাল উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে ধরা হইত বলিয়াই উহারা আজ পিছাইয়া আছে।

* এন. মিখাইলভ : 'সোভিয়েট ভূগোল,' ১৯৩৫, পৃঃ ৫১

† স্টালিন : রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে রিপোর্ট, এপ্রিল, ১৯২৩

সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শোষণ এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল জাতির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিতর প্রভেদ আমরা এইখানে দেখিতে পাইতেছি। শেষোক্ত ব্যবস্থায়, সবচেয়ে যে পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাকেও সাহায্য করিয়া সবচেয়ে অগ্রসর যে তাহার নাগাল ধরাইয়া দেওয়া হয়।

মধ্য এশিয়ার নূতন রিপাবলিকগুলির এই সমানাধিকার এবং দ্রুত অগ্রগতির চিত্র দেখিয়া ভারতের জনসাধারণের মনে ক্রুদ্ধ চিন্তার সঞ্চার না হইয়া পারে না। সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ভারতের প্রাণপ্রবাহ যেভাবে নিথর হইয়া আছে, ভারত যেভাবে শোষিত হইতেছে, তাহার সহিত এই চিত্র তুলনা করিয়া দেখিলে কাহার মনে না তীব্রতা জাগিয়া উঠে। কিন্তু এই চিত্রের ভিতরই আবার ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ঝলকিয়া উঠিতেছে; উহাই মনে এই বিশ্বাস আনিয়া দিতেছে যে, সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল দূরে ফেলিয়া দিবার পর ভারতের শ্রমজীবী সম্প্রদায় যেদিন নিজের দেশের ভাগ্যবিধাতা হইয়া উঠিবে সেদিন ভারতেও এই উন্নতি সমভাবে আয়ত্ত হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতে বৃটিশ শাসন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতের দারিদ্র্যের রহস্য

"তবু এক শ্রেণী আছে, তারা সাধারণ—
কোনো গুণ তাদের নেই, গুণের ভানও নেই তাদের ;
সাদাসিধে ভালো মানুষ তারা, তারা শুধু জানে
কুঁচে মাছ সে কুঁচে মাছই—
কখনো ভাবে না ছাল ছাড়াতে লাগে কেমন,
শুধু জেনেই সন্তুষ্ট যে কুঁচে মাছের জন্ম তার ছাল ছাড়িয়ে নেবার জন্যেই,
এবং আত্মদান করাই ভারতবাসীদের বিধিলিপি···
আর তাই যখন তারা মাথা উঁচু ক'রে বড় হ'য়ে ওঠে,
তখন তাদের ঘৃণা হয় সব চেয়ে বেশি এই ভেবে—
কেন এরকম ?"*

ভারতে সাম্রাজ্যতন্ত্রের ভূমিকা বুঝিতে গেলে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

এই অল্পদিন হইল ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রকৃত ইতিহাসকে সরকারী নথিপত্রের যবনিকার অন্তরাল হইতে লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ১৮৯৭ সালে ইম্পীরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক স্যর উইলিয়াম হাণ্টার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আজও সত্যই আছে :

"বৃটিশ শাসনের আমলে ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত ইতিহাস লেখা আজও বাকি রহিয়াছে। যে-সব সরকারী নথিপত্র দূরদূরান্তরে বিচ্ছিন্ন

* বাংলা দেশের উচ্চপদস্থ জনৈক তরুণ রাজকর্মচারীর লেখা তিনি সর্গে সম্পূর্ণ 'ভারত' শীর্ষক কবিতা। লণ্ডন, ১৮৩৪।

ভাবে ছড়াইয়া আছে সেই সব হইতেই এই ইতিহাস গ্রথিত করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে যে-পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা একজন মানুষের শক্তিতে কুলাইবে না, এবং ইহার জন্য যে-পরিমাণ অর্থ দরকার তাহাও কোনো বেসরকারী লোকের আয়ত্তের অতীত।"

লর্ড রোজবেরী আয়ার্ল্যাণ্ডের সমস্যা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, "উহা কোনদিন রাজনৈতিক প্রসঙ্গের বাহিরে যায় নাই বলিয়াই ইতিহাসের কোঠায় গিয়াও উঠিতে পারে নাই।" ভারতবর্ষের বেলাতেও একথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করিলে তবেই এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ভারতের ইতিহাসের প্রকৃত অনুশীলন আরম্ভ হইতে পারে যাহা বিজেতা শক্তির দৃষ্টিভঙ্গি হইতে স্বতন্ত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ রক্ষণশীলদের এক বিখ্যাত নেতা ইংলণ্ডের ইতিহাস সম্পর্কে বলিয়াছিলেন :

"যাঁহার জ্ঞান এবং সাহস এই দুই গুণই আছে (এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস রচনার জন্য উহার দুইটিই সমান দরকার) এমন কোনো লোক যদি কোনদিন ইংলণ্ডের ইতিহাস রচনা করেন, তাহা হইলে নেইবুর-এর কাহিনীর চেয়ে এই ইতিহাস পড়িয়াই জগৎ বেশী বিস্ময় বোধ করিবে। সাধারণত সব বড় বড় ঘটনাকেই বিকৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে। প্রকৃত জরুরি কারণগুলির অধিকাংশই গোপন রাখা হইয়াছে। কতক কতক প্রধান চরিত্র একেবারেই আমাদের সামনে আসে না। যাহারা আসে তাহাদেরও এত ভুলভাবে দেখানো হয় এবং এত ভুল বোঝা হয় যে, ফলে সমস্ত জিনিসটাই পুরা একটা প্রহেলিকার মতো হইয়া উঠে।" *

ধনতান্ত্রিক যুগের প্রারম্ভ হইতে, বিশেষ করিয়া 'গৌরবময় বিপ্লবের' দিন হইতে, ইংলণ্ডের ইতিহাসকে এইভাবে 'রহস্যময় রূপে প্রকাশ' করার ভিতর এই সত্যটিই প্রতিফলিত হইতেছে যে, সঙ্কীর্ণ বিত্তশালী মোড়লগোষ্ঠীর শাসনের আসল সত্যটিকে কাল্পনিক রূপের অন্তরালে গোপন করিয়া রাখিতে হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ইতিহাস সম্পর্কে যদি ইহা সত্য হয়, তবে যে-ইতিহাসের আলোচনার বিষয়বস্তু হইতেছে ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার গভীরতম ভিত্তি, যে-কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইবার মতো অফুরন্ত শক্তি তাহার

* ডিজ্‌রেলি : 'সিবিল,' তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যেখানে সঞ্চিত, তিন শতাব্দী ধরিয়া যে-কার্য্যক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সমস্ত নীতি পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে—সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের পক্ষে এ কথাটা আরও কত সত্য! এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সে-ইতিহাস তো সবচেয়ে বেশী করিয়া ভারতে বৃটিশ আধিপত্যেরই ইতিহাস।

এইখানেই আমরা যে-জিনিসটির একেবারে মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াই, তাহা হইল বৃটিশ নীতির প্রধান উৎস। তাহা হইল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইংলণ্ডে পুঁজিতন্ত্রের সহসা আধিপত্য বিস্তারের গোপন রহস্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা। পুঁজিতন্ত্র আজ পর্য্যন্ত যে-রণকৌশল প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে তাহার মূল তথ্য ও নীতি আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি।

এইখানে কিন্তু সরকারী রূপকথা ও কৈফিয়ৎটা বিশেষ করিয়াই চোখে পড়িবে। যে-ইতিহাস বুর্জোয়া সভ্যতার প্রকৃত নগ্ন মূর্ত্তি উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে পারে, তাহার অত্যন্ত মোটামুটি তথ্যগুলির উপরও একেবারে অতি যত্নের সহিত অবগুণ্ঠন টানিয়া দেওয়া হয় এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে তাহা একেবারে চাপিয়া দেওয়া হয়; তাহা শুধু কোনো আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী বা ভারতীয়ের জ্বলন্ত স্মৃতিতে জাগিয়া থাকে। গভীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের বদলে সাধারণত স্কুলের ছেলের কিপলিং-সুলভ রোমান্সই সংবাদপত্র এবং বক্তৃতামঞ্চ জুড়িয়া বসিয়া থাকে। রকফেলার যেভাবে বড় ধনকুবের হইয়া উঠিয়াছিলেন, সাম্রাজ্য অধিকারের পিছনেও অন্তত ঠিক ততখানি চেষ্টা, কলকৌশল, ফিকির ফন্দীবাজী ছিলই। অথচ প্রচলিত ইতিহাসে বলা হইয়া থাকে যে ব্যাপারটা 'হঠাৎ' ঘটিয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যটা "অন্যমনস্কতার ঝোঁকেই" মুঠির ভিতর আসিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভয়াবহ এবং শোচনীয় দুরবস্থা যে-কোনো গভর্ণমেণ্টের পক্ষে লজ্জা এবং কলঙ্কের কথা। কাজেই তাহা চাপিয়া গিয়া "বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন" সম্পর্কে অলঙ্কারবহুল নানা কথা বলা হইয়া থাকে।

ইংলণ্ড এবং ভারতের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাসের ভিতর এই কল্পকাহিনী যতটা সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাইবে, এমন আর কোনখানে নয়।

যে-কথাটি আরও উল্লেখযোগ্য তাহা হইল এই যে, আধুনিক যুগেই এই মিথ্যা কাহিনী ফলাও করিয়া সাজাইবার চেষ্টা বাড়িয়া গিয়াছে। ওয়েলিংটন, বার্ক, ক্লাইভ, হেস্টিংস বা এ্যাডাম স্মিথ করের বোঝা, লুণ্ঠন ও শোষণের

কথা খোলাখুলি ভাবে নির্ম্মম ভাবে বলিয়া গিয়াছেন; স্যালিসবেরির মতো লোক পর্য্যন্ত 'রক্তক্ষয়ী' ভারতের কথা বলিয়াছেন। আজ কিন্তু শক্তির ভিত্তি আর দৃঢ় নাই। কাজেই সরকারী বুলির মধ্যেও মানবপ্রেমের মধু মাখাইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সেই মধুস্রাবী বাক্যের আড়ালে কিন্তু শোষণের আসল ভিত্তি এবং অত্যন্ত বিরাট এক দমনযন্ত্রের অস্তিত্ব গোপন রহিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বের এই "খোলাখুলি ভাব" যে কী করিয়া গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর এক "নির্ব্বাক সেন্সর ব্যবস্থায়' রূপান্তরিত হইল সে-সম্পর্কে ভারতের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা অধুনিক রচয়িতারা বলিয়াছেন:

"বৃটিশ ভারতের সাধারণ ইতিহাসের কথা ধরিতে গেলে, গত এক শতাব্দী বা তাহারও পূর্ব্বে যে-সব ইতিহাস রচিত হইয়াছে সেইগুলি গত পঞ্চাশ বছরের ভিতর রচিত ইতিহাসের চেয়ে অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ ও মনোজ্ঞ, এ কথার আর কোনো ভুল নাই; সেইগুলিতে ঘটনাও বেশ খোলা-খুলি ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ যে সত্যই এমন রাজদ্রোহী হইয়া উঠিয়া মূল প্রশ্নগুলি (যথা, ভারতে থাকিবার তোমার কি অধিকার আছে?) জিজ্ঞাসা করিবে, এ কথা সেদিন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। বৃটিশ জনসাধারণ ব্যতীত অন্য কোনো জনসাধারণের কথা সেদিন কেহ মনে করিতে পারিত না। কাজেই তখন সমালোচনার ভিতরে প্রাণও ছিল, তাহাতে তথ্যও থাকিত অনেক। সেদিন রাজনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার কথা না ভাবিয়াই প্রশ্নের বিচার চলিত। পরে কিন্তু ভারত সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নই শাসকদের দিক হইতে বিচার করিবার ভাবটা ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে। "ইহাতে গভর্নমেণ্টের সুবিধা হইবে কি, বা ইহাতে গভর্নমেণ্ট শান্তিতে চলিতে পারিবে কি?" এই ভাবটি অবশ্য স্বাভাবিক। আজিকার লেখককে তাঁহার নিজের দেশের বাহিরের জগতের কথা ভাবিয়া লিখিতে হয়। সেই বাহিরের জগতের লোকও মনোযোগ সহকারে তাঁহার কথা শুনিতেছে। তাঁহার নিজের দেশের লোকও যেমন একটুতেই ক্ষুণ্ণ হয়, ইহারাও তাহার চেয়ে কম ক্ষুণ্ণ হয় না। অল্পেতেই তাহারা দোষ ত্রুটি ধরে, মর্ম্মাহত হয়। 'যে আমাদের পক্ষে নয়, সেই তো আমাদের বিপক্ষে।' লেখকের কথা যে বাহিরের কাহারও কানে পৌঁছিতেছে বা কেহ যে আড়ি পাতিয়া তাঁহার কথা

শুনিতেছে এই সচেতনতা সর্ব্বদাই নিঃশব্দে যেন সেন্সরের কাজ করিয়া যাইতেছে। উহাই ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসকে আধুনিক বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দোষদুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।”*

এখানে আমরা ভারতে বৃটিশ শাসনের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিব না। কারণ কাজে লাগিবার মতো আলোচনা করিতে গেলে একটা আলাদা বই লেখাই দরকার হইয়া পড়িবে। আর প্রচলিত তথ্যাদি তো যে-কোনো বই হইতে পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থা ও সমস্যার পিছনে যে-সব শক্তি নিহিত রহিয়াছে, সেইগুলিকে চোখের সামনে আনিয়া দেওয়াই হইবে আমাদের উদ্দেশ্য।

অতীত অতীত বই আর কিছু নহে। ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাস যথাযথ ভাবে বলিলে উহা গৌরবজনক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দূর করিবার জন্য সেই ইতিহাসের ঘটনার অন্তত কতক কতক ইংরাজদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। অথচ স্কুলপাঠ্য পুস্তকে সেই সব ঘটনা চাপিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবাসীরা যাহাতে ভারতের স্বাধীনতার আপোস-হীন সৈনিক হইয়া উঠিতে পারেন, সেইজন্য তাঁহাদেরও সে-সব কথা জানা দরকার। কিন্তু কেবল অতীতের কাঁদুনি গাহিয়া বা অতীতের অবিচার বা অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয় প্রচার চালাইয়া কোনো লাভ নাই। অতীতের অত্যাচারী ও অত্যাচারিত—ইহাদের কেহই আজ আর বাঁচিয়া নাই। একজন গভর্নর-জেনারেল বলিয়াছিলেন যে ভারতের তন্তুবায়দের হাড়ে ১৮৩৪ সালে ভারতের মাটি শাদা হইয়া গিয়াছিল। আজ কিন্তু সেই গভর্নর-জেনারেলের হাড় তাঁহার পারিবারিক সমাধিভূমিতে নিশ্চয়ই উহার চেয়ে ভালো অবস্থায় নাই। আজিকার জ্বলন্ত প্রশ্ন হইল বর্ত্তমান শাসন ও শোষণ হইতে মুক্তির প্রশ্ন। অতীতের যে-সব গতিশীল শক্তি বর্ত্তমানেও টিকিয়া আছে, কেবল তাহাদের দেখাইবার জন্যই আমরা অতীতের দিকে চোখ ফিরাইব।

ভারতের ইতিহাস আলোচনার এই প্রাণসন্ধানী রীতির প্রবর্ত্তক হইলেন আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্ক্‌স্‌। বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে এবং পরে, ভারতের অগ্রগতির সামাজিক চালক শক্তির উপর বৈজ্ঞানিক

* ই. টমসন ও জি. টি. গ্যারেট: ‘ভারতে বৃটিশ শাসনের অভ্যুদয় ও পরিণতি’, ১৯৩৪, পৃঃ ৬৬৫।

রীতির আলোকসম্পাত সর্ব্বপ্রথম তিনিই করেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের সংহার-মূর্ত্তি এবং ভবিষ্যতে উহারই বৈপ্লবিক তাৎপর্য্য তিনিই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া দেন। মানুষের ভবিষ্যতের জন্য তিনি যে-সব কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ ইহাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ-সম্পর্কে তাঁহার মতামত তিনি লিখিয়া যান। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল এই রচনা প্রায় যেন সমাধিগর্ভে লুকানো ছিল। অথচ মার্ক্‌সের অন্যান্য রচনা ততদিনে সারা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেবল এই গত পঁচিশ বছরের ভিতর অনুসন্ধিৎসুরা তাঁহার ভারত সম্পর্কিত রচনার সহিত ক্রমেই পরিচয় স্থাপন করিতে শুরু করিয়াছেন, এবং ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাধারার উপরও উহা ক্রমেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফলাফলও এইভাবে ভারতীয় সমস্যা বিচারের মূলসূত্রকে ক্রমেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছে।

১। ভারত প্রসঙ্গে মার্ক্‌স্

মাত্র তেরো বৎসর আগে একজন বিখ্যাত ইংরাজ সোশালিস্ট লেখক পর্য্যন্ত এই ধারণা পোষণ করিতে পারিতেন যে "মার্ক্‌স্‌বাদের বাঁধা-ধরা কথা অনুযায়ী ভারতের সমস্যা বিচার করিয়া দেখার ভিতর সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞানের চেয়ে বুদ্ধির প্যাঁচের পরিচয়ই বেশী পাওয়া যায়।"*

মার্ক্‌স্ যে তাঁহার মুখ্য রচনা ও চিন্তার একটি অংশ ভারতবর্ষের সমস্যার দিকে সততই পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন—এই জ্ঞানের অভাব পশ্চিম ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার একটি প্রধান গলদ। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৩ সালে মার্ক্‌স্ ভারত সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে যে-সব বিখ্যাত প্রবন্ধ রচনা করেন তাহা তাঁহার সর্ব্বোত্তম রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম। সেইগুলি হইতেই আবার ভারতের সমস্যা সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারার গোড়াপত্তনও হইয়াছে। এশিয়ার, বিশেষ করিয়া ভারত ও চীনের, অর্থনীতির বিশেষ সমস্যাগুলি, তাহাদের সহিত ইওরোপীয় ধনতন্ত্রের সঙ্ঘর্ষের ফলাফল এবং জগতের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও ভারত ও চীনের জনসাধারণের মুক্তির জন্য তাহা হইতে কী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে—এ সমস্ত প্রশ্ন যে মার্ক্‌সের মনের কতখানি

* হ্যারল্ড লাস্কি: 'কমিউনিজম্‌,' ১৯২৭, পৃঃ ১৯৪।

জুড়িয়া ছিল, তাহা তাঁহার লেখা ভালো করিয়া পড়িলেই দেখা যাইবে। 'ক্যাপিটাল'-এর ভিতর মার্ক্‌স্‌ প্রায় পঞ্চাশ বার ভারতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌সের পত্রাবলীর ভিতর আরও বেশী বার ভারতের উল্লেখ আছে। ভারত সম্পর্কে মার্ক্‌স্‌ যে কতখানি চিন্তা করিতেন তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির জন্য ভারত ও চীনের বাজার খুলিয়া দেওয়া যে কতখানি জরুরি, সেদিকে মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' রচনার এবং ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিপর্য্যয়ের অব্যবহিত পরেই মার্ক্‌স্‌ উহার মূল কারণ অনুসন্ধানের দিকে মন দেন। অনুসন্ধানের ফলে তিনি দেখিতে পান যে ইওরোপের বাহিরে এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং কালিফোর্নিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের নূতন প্রসারের ভিতরই বৈপ্লবিক প্রবাহের অসাফল্যের কারণ নিহিত রহিয়াছে। এঙ্গেল্‌সের ১৮৫২ সালে লিখিত এক পত্রে (মার্ক্‌সের নিকট লিখিত এঙ্গেল্‌সের পত্র, ২১ আগস্ট, ১৮৫২) এই চিন্তাধারার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। পরে ১৮৫৮ সালে লিখিত এক পত্রে উহার তীক্ষ্ণতর অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই :

> "বুর্জোয়া সমাজ যে দ্বিতীয় বার ষোড়শ শতাব্দীর ভিতর দিয়া চলিতেছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের আশা, প্রথম ষোড়শ শতাব্দী যেমন ইহাকে জন্ম দিয়াছিল, এবার উহা ঠিক তেমনি ভাবেই ইহার মরণও ঘোষণা করিয়া যাইবে। বুর্জোয়া সমাজের বিশেষ দায়িত্ব হইল সারা পৃথিবীব্যাপী বাজার—অন্তত তাহার মূল কাঠামোটা প্রতিষ্ঠা করা এবং তাহারই ভিত্তিতে উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা। যেহেতু পৃথিবী গোলাকার, সেইহেতু কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়াকে উপনিবেশে পরিণত করা এবং চীন ও জাপানের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আমাদের সামনে আজ জরুরি প্রশ্ন হইতেছে : ইওরোপে বিপ্লব প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে ; প্রথম হইতেই উহা সোশালিস্ট রূপ পরিগ্রহ করিবে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ ইহারও চেয়ে ঢের বড় এক এলাকা জুড়িয়া এখনও বাড়তির পথেই চলিতেছে বলিয়া উহা কি ইওরোপের ক্ষুদ্র কোণের বিপ্লবকে অনিবার্য্য ভাবে চূর্ণ করিয়া দিবে না?"*

*১৮৫৮ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে এঙ্গেল্‌সের নিকট লিখিত মার্ক্‌সের পত্র।

ইওরোপের পুঁজিতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে ইওরোপের বাহিরে পুঁজিতন্ত্রের প্রসারের তাৎপর্য্য মার্ক্‌স্ উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ট দশকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উহার ভিতরই তাঁহার এতৎসম্পর্কিত চিন্তাধারার চাবিকাঠিটি রহিয়াছে। ইওরোপীয় সোশালিস্টদের বেশীর ভাগই কিন্তু আধুনিক যুগে ধীরে ধীরে এই কথাটা বুঝিতে শুরু করিয়াছেন।

১৮৫৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের নূতন করিয়া মেয়াদ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ যখন শেষ বারের মতো পার্লামেণ্টে উঠে, তখন মার্ক্‌স্ নিউ ইয়র্কের 'ডেইলী ট্রিবিউন' পত্রিকায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে আটটি প্রবন্ধ লেখেন। এইগুলির সহিত 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এবং মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্ পত্রাবলীতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ মিলাইয়া দেখিলে ভারত সম্পর্কে মার্ক্‌সের মূল চিন্তাধারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

২। ভারতের গ্রাম্য অর্থনীতির বিপর্য্যয়

পুঁজিতন্ত্রের সহিত সংঘর্ষের ফলে 'এশিয়ার যে-অর্থনীতি' এই প্রথম ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহার বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়াই মার্ক্‌সের বিশ্লেষণ শুরু হয়। এঙ্গেল্‌স্ ১৮৫৩ সালের জুন মাসে মার্ক্‌স্‌কে লেখেন: "সমগ্র প্রাচ্যের মূল বৈশিষ্ট্যই এই যে সেখানে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব নাই।" কিন্তু উহা ইওরোপীয় অর্থনীতির আদিম গোড়াপত্তন হইতে মূলত পৃথক নহে। পরবর্ত্তী কালে যেভাবে উহা গড়িয়া উঠিয়াছে তফাৎটা রহিয়াছে তাহারই মধ্যে।

> "সম্প্রতি একটা হাস্যকর ধারণা প্রচলিত হইয়াছে যে আদিম অভিব্যক্তির দিক দিয়া দেখিলে সাধারণ সম্পত্তির রূপ হইতেছে স্লাভোনিক বা রুশ। আমরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে এই আদিম রূপ রোমান, টিউটন ও কেল্টদের মধ্যেও ছিল; এবং ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ভারতেও পাওয়া যাইবে। অবশ্য সেইগুলি অংশত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। এশিয়ায়, বিশেষ করিয়া ভারতে গোষ্ঠীগত মালিকানা ভালো করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে আদিম সাম্যবাদের বিভিন্ন রূপ হইতে কি করিয়া উহার ধ্বংসের বিভিন্ন রূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রোমক ও টিউটনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিভিন্ন মৌলিক রূপ ভারতের আদিম সাম্যবাদের বিভিন্ন রূপের ভিতরই খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে।"*

* মার্ক্‌স্: 'ক্রিটিক অফ্ দি পলিটিক্যাল ইকনমি', ১ম অধ্যায়

তাহা হইলে প্রাচ্যে আদিম সাম্যবাদ পাশ্চাত্যের ন্যায় ভূমিগত সম্পত্তি ও সামন্ততন্ত্রে বিকাশ লাভ করিল না কেন? এঙ্গেল্‌স্ মনে করেন, এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাইবে প্রাচ্যের আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে :

"প্রাচ্যবাসীরা ভূমিগত সম্পত্তিপ্রথা বা সামন্ততন্ত্রে পৌঁছিল না, ইহা কিরূপে ঘটিল? আমার মনে হয়, ইহার মূল কারণ হইতেছে আবহাওয়া, তাহার সহিত জড়িত রহিয়াছে মাটির অবস্থা; সাহারা হইতে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতার ভূমির মধ্য দিয়া এশিয়ার সর্ব্বোচ্চ ভূমিভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত মরুভূমিও ইহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। কৃত্রিম সেচব্যবস্থা ছাড়া এখানে চাষ আবাদ চলিতেই পারে না; এবং এই সেচব্যবস্থার দায়িত্ব হইল হয় কমিউনগুলির, নয় প্রদেশের, না হয় কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের।"*

ভূমির উপর ব্যক্তির মালিকানা এখানকার চাষ-আবাদের ব্যবস্থার সহিত খাপ খাইত না; কাজেই এখানে গড়িয়া উঠিল 'এশিয়ার' বিশিষ্ট 'অর্থনীতি'; উহার নীচের দিকে রহিল গ্রাম্য ব্যবস্থায় আদিম সাম্যবাদের ধ্বংসাবশেষ এবং উপরে রহিল যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের পাশাপাশি সেচব্যবস্থা ও যানবাহনাদি ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত এক স্বেচ্ছাচারী কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট।

কাজেই ভারতকে বুঝিবার চাবিকাঠি হইল এই গ্রাম্য ব্যবস্থা বুঝা। ইহার সর্ব্বোত্তম বর্ণনা 'ক্যাপিটাল'-এর ভিতরই রহিয়াছে :

"এই সব ছোট ছোট এবং অত্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় গোষ্ঠীর (আজও পর্য্যন্ত ইহাদের কোনো কোনোটি বাঁচিয়া রহিয়াছে) ভিত্তি হইল জমির উপর সাধারণের মালিকানার ব্যবস্থা, কৃষি ও হস্তশিল্পের সংমিশ্রণ এবং শ্রমবিভাগের এক অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থা। নূতন কোনো গোষ্ঠীর পত্তন হইলে তাহারা হাতের কাছে একটা তৈয়ারী পরিকল্পনা হিসাবে ইহাকেই পাইয়া থাকে। ইহারা একশত হইতে কয়েক সহস্র একর জমি অধিকার করিয়া বসবাস করে এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র উৎপাদন করিয়া একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ হিসাবেই চলিয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশই সাধারণের ব্যবহারের জন্য। বিনিময়ের দ্রব্যের রূপ উহা পরিগ্রহ করিতে পারে না। কাজেই ভারতীয় সমাজকে মোটামুটি ভাবে ধরিলে, দ্রব্য

* ১৮৫৩ সালের ৬ই জুন তারিখে মার্ক্‌সের নিকট লিখিত এঙ্গেল্‌সের পত্র।

বিনিময়ের দরুন যে-শ্রমবিভাগ হইয়া থাকে এখানকার উৎপাদন-ব্যবস্থা তাহার উপর নির্ভর করে না। কেবল বাড়্তি জিনিসটুকুই বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাহারও এক অংশ যতক্ষণ না রাষ্ট্রের হাতে গিয়া পড়িতেছে, ততক্ষণ বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। স্মরণাতীত কাল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ জমির খাজনা হিসাবে রাষ্ট্রের হাতে গিয়া পড়িয়া আসিয়াছে।

"এই সব প্রাচীন গোষ্ঠীর গঠন ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের। যেখানে ইহার রূপ সবচেয়ে সরল, সেখানে সকলে মিলিয়াই জমি চাষ করে এবং ফসলও সকলের ভিতর বাঁটিয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা বাড়্তি শিল্প হিসাবে সব পরিবারেই সূতা কাটা এবং কাপড় বোনাও হয়। জনসাধারণের সকলেই এই কাজ করিতেছে; তাহাদেরই পাশাপাশি আমরা দেখিতে পাই মোড়লকে; এই লোকটি একাধারে জজ, পুলিস ও খাজনাতহশীলদার। হিসাবনবীশ চাষ আবাদের সব হিসাবপত্র রাখিয়া থাকেন। অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার কাজ হইল আবার আর এক জন আমলার। গোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত জমির উপর দিয়া বাহিরের কেহ আসিলে গেলে তিনিই তাহাকে রক্ষা করেন এবং পরের গ্রাম পর্য্যন্ত তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসেন; এলাকা ঠিক মতো আছে কিনা দেখিবার ভার থাকে একজনের উপর। পাশাপাশি গোষ্ঠীর কেহ যাহাতে তাহাদের এলাকা দখল না করিয়া বসে, তাহা দেখাই ইঁহার কাজ। সাধারণের জলাশয় হইতে সেচব্যবস্থার জন্য জলবণ্টনের কাজ হইল জলাধ্যক্ষের। ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কাজ চালান। শিক্ষক বালির উপর বসিয়া ছেলেদের লেখাপড়া শেখান। পঞ্জিকাকার ব্রাহ্মণ অথবা জ্যোতিষী বীজ বপন, শস্য কর্ত্তন এবং কৃষি সংক্রান্ত অন্য কাজকর্ম্মের শুভাশুভ দিন সকলকে জানাইয়া দেন। কর্ম্মকার এবং সূত্রধরের কাজ হইল কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণ ও সংস্কার। কুম্ভকার গ্রামের সকলের প্রয়োজনীয় মৃৎপাত্র তৈয়ার করেন। আর আছেন নরসুন্দর, রজক, স্যাঁক্‌রা, কবি। শেষোক্ত ব্যক্তি কোনো কোনো সমাজে স্যাঁক্‌রা বা শিক্ষকের বদলে কাজ করিয়া থাকেন। এই বারোটি লোকের ভরণপোষণ সাধারণের অর্থেই হয়। জনসংখ্যা বাড়িয়া উঠিলে অনধিকৃত জমিতে পুরাতন সমাজের কাঠামো ধরিয়া নূতন সমাজের পত্তন হয়।

"এই সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহারা একই রূপে বারবার নিজেদের প্রসারিত করিয়া দেয়। দৈবাৎ বিনষ্ট হইলে পুনরায় একই স্থানে একই নাম লইয়া ইহারা আবার জাগিয়া উঠে। উৎপাদনের সংগঠনের এই সারল্যের ভিতরই এশিয়ার সমাজের অপরিবর্ত্তনীয়তার তত্ত্ব ও রহস্য নিহিত রহিয়াছে। এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি কিন্তু ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আবার ক্রমাগত নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, বিভিন্ন বংশের পরিবর্ত্তনেরও আর অন্ত নাই। তাহারই পাশে এই অপরিবর্ত্তনীয়তা চোখে পড়িবার মতো। রাজনৈতিক আকাশের ঝড়ের মেঘ সমাজের অর্থনৈতিক অংশের কাঠামোকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।"*

ভারতের চিরপ্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামো হইল ইহাই। যে-বিদেশী পুঁজিতন্ত্রের প্রতিনিধি হইল বৃটিশ শাসন, তাহাই ইহার ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া দিল। এইখানেই পূর্ব্বের সমস্ত বিজয়-অভিযানের সহিত বৃটিশের বিজয়ের পার্থক্য। পূর্ব্বের কোনো বিজেতাই অর্থনৈতিক বনিয়াদে হাত দেয় নাই, বরং পরে তাহারই সহিত নিজেদের মিশাইয়া দিয়াছে; বৃটিশ বিজয় কিন্তু সেই বনিয়াদকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। তাহারা বাহিরের শক্তি হিসাবেই রহিয়া গেল, কর আদায় করিয়া তাহা বাহিরেই টানিয়া লইতে লাগিল। ভারতে বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের জয় এবং ইওরোপে পুঁজিতন্ত্রের জয়ের তফাৎও এইখানে। এখানে পুরাতনের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে কোনো নূতন শক্তির জন্ম হয় নাই। ভারতে বৃটিশ শাসনের আমলে ভারতীয়দের দুর্দ্দশার সহিত একটা যে বিষাদ মিশিয়া রহিয়াছে, তাহার জন্ম ইহা হইতেই। সে দেখিতেছে যে "তাহার পুরানো জগৎ হারাইয়া গেল, অথচ নূতন কোনো জগৎও সে আর পাইল না।"

"বৃটিশ ভারতকে যে-কষ্ট দিয়াছে তাহা ভারতের পূর্ব্বের সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহার তীব্রতাও যে বেশী সে-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। বৃটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এশিয়ার স্বেচ্ছাচারের উপর যে ইওরোপীয় স্বেচ্ছাচার বপন করিয়া দিয়াছিল তাহার কথা আমি বলিতেছি না। 'টেম্প্‌ল্‌ ওফ্‌ সালসেটে' যে স্বর্গীয় মানবেরা আমাদের সচকিত করিয়া তুলিত, এই দুইয়ের সংযোগের ভীষণতা কিন্তু তাহাদেরও ছাড়াইয়া যায়।...

* মার্কস্‌: 'ক্যাপিটাল,' ১ম খণ্ড, ১৪শ অধ্যায়, ৪র্থ অনুচ্ছেদ।

"গৃহযুদ্ধ, বিজয়-অভিযান, বিপ্লব, রাজ্য অধিকার, দুর্ভিক্ষ—ইহাদের ফলাফল বিস্ময়কর রূপে জটিল এবং দ্রুত বলিয়া মনে হইতে পারে। মনে হইতে পারে যে উহারা শুধুই ধ্বংসাত্মক। তথাপি উহারা কিন্তু হিন্দুস্থানের বাহির ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইংলণ্ড কিন্তু ভারতের সমাজের সমস্ত কাঠামোটাই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, উহার পুনঃসংগঠনের কোনো লক্ষণও এখনও পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। হিন্দুর পুরাতন জগৎ হারাইয়া গিয়াছে, কোনো নূতন জগতও সে পায় নাই। ইহাই তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সহিত এক বিচিত্র বিষাদ মিশাইয়া দিয়াছে এবং বৃটিশ-শাসিত হিন্দুস্থানকে তাহার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং তাহার সমস্ত অতীত ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।" *

৩। ভারতে বৃটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা

মার্ক্‌স্ গভীর অভিনিবেশ সহকারে এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকার পরিণতির ইতিহাস দেখাইয়া দিয়াছেন। ১৮১৩ সালের পূর্ব্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার ছিল। ১৮১৩ সালের পরবর্ত্তী যুগে এই একচেটিয়া অধিকার ভাঙ্গিয়া যায় এবং শিল্পগত মূলধনের তৈয়ারী জিনিসপত্রের বিজয়-অভিযান ভারতকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। মার্ক্‌স্ এই উভয় যুগের প্রভেদও দেখাইয়া দিয়াছেন।

প্রথম যুগে কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে যে বিরাট লুণ্ঠন চালায়, তাহাতেই ধ্বংসের সূত্রপাত হয়। ("সারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত হইতে যে-ঐশ্বর্য্য ইংলণ্ডে চালান যায়, তাহার মূলে এদেশে কোম্পানীর অকিঞ্চিৎকর ব্যবসায়ের যতটা না হাত ছিল তাহার বেশী ছিল দেশের প্রত্যক্ষ শোষণ এবং দেশের বিরাট ঐশ্বর্য্য জোর করিয়া আদায় করিয়া ইংলণ্ডে চালান দেওয়া") ; দ্বিতীয়ত যে-সব সেচব্যবস্থা পূর্ব্বেকার শাসকরা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, এ-আমলে সেইগুলি অবহেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায় ; তৃতীয়ত, ইংরেজী ভূমিব্যবস্থা, জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, জমি বিক্রয় ইত্যাদি এবং ইংরেজী ফৌজদারী আইন পুরাপুরি চালু করা হয় ; এবং চতুর্থত. ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্য প্রথমে ইংলণ্ডে ও পরে ইওরোপে আমদানী একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় বা তাহার উপর চড়া শুল্ক ধার্য্য করিয়া দেওয়া হয়।

---

* মার্ক্‌স্ঃ 'ভারতে বৃটিশ শাসন', নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন, ২৫শে জুন, ১৮৫৩।

এ সবও কিন্তু "শেষ আঘাত" হানিতে পারে নাই। সে-আঘাত আসিল ঊনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিতন্ত্রের যুগে।

যে-ব্যবসায়ী মোড়লতন্ত্র হুইগ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আপনার শক্তি চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে, তাহার সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট :

"ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আসল পত্তন ১৭০২ সালের আগের কোনো সময়ে হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। পূর্ব্ব-ভারতের ব্যবসায়ের উপর যাহারা একচেটিয়া আধিপত্য দাবী করিত,সেই সব বিভিন্ন সমিতি মিলিয়া এই সময়ে একটি মাত্র কোম্পানী গঠন করে। ইহার আগে আসল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বার বার বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমওয়েলের আমলে উহা একবার অস্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপে উহা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়।

"ওলন্দাজ রাজকুমারের প্রভুত্বের আমলে যখন হুইগরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজস্বের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া উঠিল, যখন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড সৃষ্টি হইল, ইংলণ্ডে যখন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা সরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং ইওরোপের শক্তিসাম্য পাকাপাকিভাকে স্থির হইয়া গেল, তখনই কেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। লোক-দেখানো স্বাধীনতার এই যুগ আসলে একচেটিয়া ব্যবসায়েরই যুগ ছিল। এলিজাবেথ ও প্রথম চার্লসের যুগের ন্যায় রাজকীয় অর্থ সাহায্যের দ্বারা উহার সৃষ্টি হয় নাই। পার্লামেণ্টের অনুমোদনের দ্বারাই উহা স্বীকৃতি লাভ করে ও জাতির জিনিস হইয়া দাঁড়ায়।" *

ইংলণ্ডের উৎপাদক মহল ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাদ দিবার জন্য দাবী করিয়া আসিতেছিল ও সে-দাবী আদায়ও করিয়াছিল; ইহারা, এবং অন্যান্য যে-সব ব্যবসায়ী মহল লাভজনক ভারতীয় ব্যবসায় হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছিল তাহারাও, এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালাইয়া যায়। যে-ইণ্ডিয়া বিলে কোম্পানীব পরিচালক ও স্বত্বাধিকারীদের সংসদ তুলিয়া দিবার

* মার্ক্স্: "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উহার ইতিহাস ও ফলাফল," নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন, ১১ই জুলাই, ১৮৫৩।

কথা ছিল, যাহা লইয়া ১৭৮৩ সালে ফক্স-এর গভর্নমেণ্টের পতন হয়,—এবং পরে ১৭৮৬ হইতে ১৭৯৫ সাল পর্য্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারের ভিতর দিয়া যে-দীর্ঘ সংগ্রাম চলে—তাহার মধ্যে এই সংগ্রামই নিহিত ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের শেষে যতদিন না ইংলণ্ডের উৎপাদনমূলক পুঁজিতন্ত্র একেবারে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল, ততদিন পর্য্যন্ত এই এ'চেটিয়া ব্যবসায়-ব্যবস্থাকে পরাহত করা যায় নাই (১৮১৩ সাল)। ১৮৩৩ সালে ইহা একেবারে চূড়ান্তভাবে নষ্ট হইয়া যায়।

১৮১৩ সালের পর ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদি ভারত ছাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই ধ্বংসের ফলাফল মার্ক্‌স্‌ অকাট্য তথ্যের সাহায্যে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ১৭৮০ হইতে ১৮৫০ সালের মধ্যে ভারতে বৃটিশ পণ্য রফ্‌তানি মোট ৩৮৬১৫২ পাউণ্ড হইতে ৮০২৪০০০ পাউণ্ডে অর্থাৎ বৃটিশের মোট রফ্‌তানির বত্রিশ ভাগের এক ভাগ হইতে আট ভাগের এক ভাগে গিয়া উঠে। ১৮৫০ সালে যে-তুলাজাত দ্রব্যাদির শিল্পে বৃটেনের আট ভাগের এক ভাগ লোক নিয়োজিত ছিল এবং যে-শিল্প দেশের মোট আয়ের বারো ভাগের এক ভাগ আয় জোগাইতেছিল, তাহার বৈদেশিক বাজারের মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ ছিল ভারতেই।

"১৮১৮ হইতে ১৮৩৬ সালের মধ্যে গ্রেট বৃটেন হইতে ভারতে রফ্‌তানি ১ হইতে ৫২০০ এই অনুপাতে বাড়িয়া উঠে। ১৮২৪ সালে ভারতে বৃটিশ মসলিনের রফ্‌তানি ছিল টানিয়া-টুনিয়া ৬০০০০০০ গজের মতো। অথচ ১৮৩৭ সালে উহাই ৬৪,০০০,০০০ গজ ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু ঐ সময়ের ভিতরই ঢাকার জনসংখ্যা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইতে বিশ হাজারে নামিয়া আসে। বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ভারতীয় শহরগুলির এই অধঃপতনই কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কুফল বলিয়া ধরিলে চলিবে না। বৃটিশের বাষ্পযান ও বিজ্ঞান কৃষি ও শিল্পের মিতালিকে সারা হিন্দুস্থানের বুক হইতে একেবারে আমূল উপড়াইয়া টানিয়া তুলিয়া ফেলে।"*

"ইংলণ্ডের বয়নশিল্পজাত দ্রব্যাদি ভারতে এক অতি শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিল। ১৮৩৪-৩৫ সালে গভর্নর-জেনারেল রিপোর্ট লিখিলেন :

* মার্ক্‌স্‌ : "ভারতে বৃটিশ শাসন", নিউ ইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন, ১০ই জুন, ১৮৫৩

'বাণিজ্যের ইতিহাসে এই দুর্দ্দশার তুলনা নাই বলিলেই চলে। তাঁতিদের হাড়ে এখন ভারতের মাটি শাদা হইয়া রহিয়াছে'।" *

"কৃষিগত এবং উৎপাদনগত কাজকর্ম্মের মিলনের" উপর গ্রাম্য ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। "তাঁত এবং চরকা ছিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজের কাঠামোর খিলানের মতো।" কিন্তু "অনধিকারী বৃটিশ মাথা গলাইয়া ভারতের তাঁতকে দিল ভাঙ্গিয়া, চরকাকেও করিয়া দিল নষ্ট।" ইহাতেই বৃটেন এশিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং, সত্য বলিতে কি, একমাত্র সামাজিক বিপ্লব সংসাধন করিল। এই বিপ্লব যে শুধু প্রাচীন উৎপাদনকারী নগরগুলিকে নষ্ট করিয়া তাহার অধিবাসীদের গ্রামের পথে ঠেলিয়া দিল, তাহাই নহে, গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনও ইহা নষ্ট করিয়া দিল। ইহার ফলেই কৃষির উপর অত্যধিক চাপ পড়িল। আজ পর্য্যন্ত সে-চাপ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার কৃষির বিস্তৃতি, সেচ পথঘাট ইত্যাদির বন্দোবস্ত না করিয়াই কৃষকদের নিকট হইতে যত বেশী পারা যায় খাজনা নির্ম্মম ভাবে আদায় করার ফলে কৃষিরও কোনো উন্নতি হইতে পারিল না (১৮৫০-৫১ সালে ১৯,৩০০,০০০ পাউণ্ড রাজস্বের মধ্যে মাত্র ১৬৬,৩৯০ পাউণ্ড অর্থাৎ শতকরা ০.৮ ভাগ সেচ পথঘাট ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া হিসাব দেখানো হয়)।

"এই খাজনা এমন আকার ধারণ করিতে পারে যাহাতে শ্রমের অবস্থা এবং উৎপাদনের উপকরণের পুনরুৎপাদন গুরুতর ভাবে ব্যাহত হয়। উৎপাদনের প্রসার ইহা প্রায় এক রকম অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারে এবং প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের কোনমতে বাঁচিয়া থাকিবার উপকরণ দিয়া তাহাদের পিষিয়া মারিতে থাকে। বিজেতা কোনো শিল্পাশ্রয়ী জাতি যখন অপরকে শোষণ করিতে থাকে, যেমন ইংরেজ ভারতকে শোষণ করিতেছে, তখনই ব্যাপারটা ঠিক এইরকম হইয়া দাড়ায়"। †

বৃটেন ভারত হইতে যে-'কর' আদায় করিত, মার্ক্‌স্ এইভাবে তাহার হিসাব দিয়াছেন:

"বৃটিশ কর্ম্মচারীরা তাহাদের মাহিনা হইতে সঞ্চিত অর্থ বাবদ বছর সালিয়ানা যে-টাকা বাড়ীতে চালান দেয় বা ইংলণ্ডে খাটাইবার জন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা

* মার্ক্‌স্: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, পঞ্চম অনুচ্ছেদ।
† মার্ক্‌স্: 'ক্যাপিটাল', ৩য় খণ্ড, ৩৭শ পরিচ্ছেদ, ৩য় অনুচ্ছেদ।

তাহাদের লাভের যে-অংশ বিলাতে পাঠান, তাহা না ধরিয়া কেবল 'সুশাসন', সুদ, বৃটিশ পুঁজির ডিভিডেণ্ড ইত্যাদি বাবদ একা ভারতকেই ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কর দিতে হয়।"*

গ্রাম্য ব্যবস্থার পতন এবং ভারতীয় সমাজের প্রাচী• বনিয়াদের ধ্বংস দেখিয়া মার্ক্‌স্ কি চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন ? বুর্জোয়া সামাজিক বিপ্লবের ফলে অন্যান্য দেশের ন্যায় যে অপার দুঃখ এখানেও দেখা দিয়াছিল (এই সব অবস্থার ভিতর দিয়া ভারতকে চলিতে হইয়াছিল বলিয়া এখানে তাহা বরং আরও বেশী দেখা দেয়), মার্ক্‌স্ তাহা সবই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এবং তিনি গ্রাম্য ব্যবস্থার গভীর প্রতিক্রিয়াশীল রূপটিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; মানবজাতিকে আগাইয়া চলিতে হইলে উহার ধ্বংস যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহাও মার্ক্‌সের নজর এড়ায় নাই। "অবাস্তব কল্পনাসম্ভূত" সেই সব গ্রাম্য সমাজের ভিতর মানুষের গ্লানি ও হীনতার কথা তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতে এবং ইওরোপেও যাঁহারা সামনের দিকে না চাহিয়া পিছনের দিকে তাকাইতে চাহেন, ভারতে বৃটিশ শাসকের সঙ্গে লড়িবার জন্য যাঁহারা বৃটিশের আগের যুগের, তাঁত ও চরকার যুগের ভারতকে পুনরায় বাঁচাইয়া তুলিতে চাহেন—তাঁহাদের কাছেও মার্ক্‌সের কথার গুরুত্ব আজ আদৌ কমিয়া যায় নাই।

"এই সব শ্রমপরায়ণ, গোষ্ঠীপতির কর্ত্তৃত্বসূচক ও নিরীহ সংগঠনগুলিকে ভাঙ্গিয়া পড়িতে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দশাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিলে এবং তাহাদের ভিতরকার লোকগুলিকে তাহাদের সভ্যতার প্রাচীন রূপ এবং বংশগত জীবনধারণের উপায় হারাইতে দেখিলে মানুষের মন ক্লিষ্ট হইয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে কল্পরাজ্যের এই সব গ্রামীন সম্প্রদায়গুলিকে নিরীহ বলিয়া মনে হইলেও উহারাই চিরকাল প্রাচ্যে স্বেচ্ছাচারের দৃঢ় ভিত্তি হিসাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে ; মানুষের মনকে কুসংস্কারের প্রতিরোধহীন যন্ত্রে পরিণত করিয়া, প্রচলিত নিয়মের দাসে পরিণত করিয়া, উহাকে সকল ঐতিহাসিক শক্তি এবং মহিমা হইতে বঞ্চিত করিয়া, উহারাই মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণতম পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

"যে-বর্ব্বর আত্মপ্রাধান্যের ভাব কোনো. এক ঐশ্বর্য্যহীন ভূখণ্ডের উপর

* মার্ক্‌স্ ; 'ক্যাপিটাল', ৩য় খণ্ড, ৩৫শ পরিচ্ছেদ, ৪র্থ অনুচ্ছেদ

কেন্দ্রীভূত হইয়া সাম্রাজ্যের ধ্বংস, অকথ্য নিষ্ঠুরতা, বড় বড় নগরের অধিবাসীদের হত্যাকাণ্ড নির্ব্বিকার ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে, প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে যতটুকু বিচার করিয়াছে এ-সব বিষয়ে তাহার বেশী বিচার করিয়া দেখে নাই, এদিকে আবার কোনো আক্রমণকারীর তাহার উপর নজর পড়িয়া থাকিলে নিজেই তাহার অসহায় শীকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেই আত্মপ্রাধান্যকে আমাদের ভুলিলে চলিবে না।

"আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে এই রুদ্ধস্রোত মর্য্যাদাহীন নিশ্চেষ্ট জীবন, জড়ের ন্যায় এই জীবনযাত্রা, উৎকট, উদ্দেশ্যহীন অপরিমিত ধ্বংসের শক্তিকেই আহ্বান করিয়া আনিয়া হিন্দুস্থানে হত্যাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিল।

"আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় জাতিভেদ এবং দাসত্বের সংস্পর্শে কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহারা মানুষকে অবস্থার প্রভু না করিয়া তুলিয়া তাহাকে বাহ্য অবস্থার দাস করিয়া তুলিয়াছিল; পরিবর্ত্তনশীল এক সামাজিক অবস্থাকে এক অপরিবর্ত্তনীয় স্বাভাবিক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়তিতে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল; এবং এইভাবে পাশব নিষ্ঠুর প্রকৃতিপূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; মানুষ যে বানর হনুমান এবং গাভী সবলার প্রতি ভক্তিতে তাহাদের পায়ের কাছে প্রণিপাত করিতেছে—ইহার ভিতরেই অধঃপতনের রূপটা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।"*

সেইজন্য ১৮৫৩ সালের ১৪ই জুন তারিখে এঙ্গেল্‌সের নিকট লেখা এক চিঠিতে মার্ক্‌স্‌ ভারতে বৃটিশ অর্থনীতিকে 'শূয়োরের মতো' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকিলেও, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ বিজয়কে "ইতিহাসেব অচেতন যন্ত্র" রূপেও দেখিতে পাইয়াছেন ঃ

"ইহা সত্য যে হিন্দুস্থানে সামাজিক বিপ্লব সাধন করিবার সময় ইংলণ্ড জঘন্যতম উদ্দেশ্য দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিল এবং নির্ব্বোধের ন্যায়ই সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় প্রয়োগ কবিয়াছিল। প্রশ্নটা কিন্তু তাহা নহে। প্রশ্নটা হইল—এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় একটা আমূল বিপ্লব ব্যতীত কি মনুষ্যজাতি তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে

* মার্ক্‌স্‌ ঃ "ভারতে বৃটিশ শাসন"

পারিবে ? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে, ইংলণ্ডের যত অপরাধই হইয়া থাকুক না কেন, সেই বিপ্লব সাধন করিয়া সে অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের যন্ত্র হিসাবেই কাজ করিয়াছে।" *

৪। ভারতে বৃটিশ শাসনের 'পুনরুজ্জীবনশীল' ভূমিকা

মার্ক্‌সের মতে ভারতে ইংলণ্ডের "দুইটি কাজ ছিল : একটি ভাঙ্গিয়া ফেলার কাজ, অপরটি হইল নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার কাজ ; এশিয়ার প্রাচীন সমাজের ধ্বংস সাধন এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।" এ পর্য্যন্ত প্রধানত ধ্বংসের দিকটাই চোখে পড়িলেও গঠনের কাজও কিন্তু আরম্ভ হইয়াছে।

"বিজেতাদের মধ্যে যাহাদের সভ্যতা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহাদের মধ্যে বৃটিশরাই হইল প্রথম ; সেই কারণেই তাহারা ছিল হিন্দু সভ্যতার কাছে দুরধিগম্য। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া, দেশের শিল্প আমূল উৎপাটিত করিয়া এবং দেশের সমাজের যাহা কিছু মহৎ ও উন্নত তাহা পিটাইয়া সমান করিয়া দিয়া তাহারা হিন্দুস্থানের সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া দিল। ভারতবর্ষে তাহাদের শাসনের ঐতিহাসিক পৃষ্ঠাগুলিতে এই ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছুরই বিবরণী বড় একটা নাই। ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে নূতন প্রাণের প্রকাশ প্রায় দেখাই যায় না। তবু কিন্তু উহা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।"†

এই নূতন 'প্রাণ-সঞ্চারে'র আরম্ভটা মার্ক্‌স্ কিসের ভিতর দেখিতে পাইলেন ? তিনি পর পর কয়েকটি লক্ষণের বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন :

(১) "মুঘলদের আমলের চেয়েও দৃঢ়সংবদ্ধ এবং বিস্তৃত...রাজনৈতিক ঐক্য ;" "ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের দ্বারা উহা দৃঢ়তর এবং চিরস্থায়ী" হইতে বাধ্য ;

(২) "দেশীয় সৈন্যবাহিনী" (ইহা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং ক্রমে সুচিন্তিত ভাবে সমগ্র বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ বৃটিশ সৈন্য দ্বারা ভরিয়া ফেলা ও বৃটিশের সামরিক কর্ত্তৃত্ব দৃঢ় করিয়া তোলার আগের কথা) ;

* ঐ

† মার্ক্‌স্ : 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল', নিউ ইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন, ৮ই আগস্ট, ১৮৫৩।

(৩) "স্বাধীন সংবাদপত্র—এশিয়ার সমাজে ইহার এই প্রথম আবির্ভাব" (ইহা ১৮৩৫ সালে ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ঘোষণার পরের কথা এবং ১৮৭৩ সাল হইতে শুরু করিয়া যে-সব প্রেস আইন চালু হয় ও আধুনিক যুগে পতনশীল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমলে যাহাদের কড়াকড়ি বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহাদের আগের কথা) ;

(৪) "এশিয়ার সমাজের প্রধান আকাঙ্ক্ষা—জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা" প্রতিষ্ঠা ;

(৫) শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও যতদূর সম্ভব কম করিয়াও হোক না কেন, "শাসন চালাইবার গুণাবলীসম্পন্ন এবং ইওরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত" এক শিক্ষিত ভারতীয় শ্রেণী গঠন ;

(৬) বাষ্পযানের সাহায্যে "ইওরোপের সহিত নিয়মিত এবং দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন।"

এই সবের চেয়েও কিন্তু বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল শিল্পের পুঁজির দ্বারা ভারত শোষণের অনিবার্য্য ফলাফল। ভারতের বাজারের বিস্তার এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য "ভারতকে পুনরুৎপাদক দেশে রূপান্তরিত করা" অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। অর্থাৎ ভারত শুধু কাঁচা মালের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এবং তৈয়ারী জিনিসপত্র আমদানীর বদলে কাঁচা মাল বিদেশে রফ্‌তানি করিবে। ইহার জন্য রেলপথ, রাস্তা এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন হইয়া পড়িল। মার্ক্‌সের লেখার সময় এই নূতন অবস্থাটা কেবল শুরু হইয়াছিল। ইহা দেখিয়াই মার্ক্‌স্‌ যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাহা তাঁহার ভারত সম্পর্কে ঘোষণাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঃ

"আমি জানি যে কেবল নিজেদের জিনিসপত্র তৈয়ারীর জন্য কম খরচে তুলা ও অন্যান্য কাঁচা মালের আশাতেই বৃটিশ মিলমালিকরা ভারতে রেলপথ গড়িতে চাহে। কিন্তু যে-দেশে লৌহ এবং কয়লা আছে, সে-দেশের যানবাহন-ব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের আমদানী করিলে সেখানে যন্ত্রপাতি তৈয়ারী আর রোধ করা যাইবে না। রেল চলাচলের জন্য যে-সব শিল্পপ্রক্রিয়ার দরকার, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া একটা বিরাট দেশে রেলপথ চালানো যায় না ; এবং ইহা হইতেই, রেলপথের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে নহে, এমন সব শিল্পেতেও যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া যায়। সেই-জন্য রেলপথই ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের প্রকৃত অগ্রদূত হইয়া উঠিবে।

...যে বংশগত শ্রমবিভাগের উপর ভারতের জাতিবর্ণগুলি আশ্রয় করিয়া আছে, ভারতের অগ্রগতি এবং ভারতের শক্তির পথে যে-সব চরম বাধা বর্ত্তমান রহিয়াছে—রেলপথ হইতে উদ্ভূত আধুনিক শিল্প তাহাদের সকলেরই বিলোপ সাধন করিবে।" *

ইহার অর্থ কি এই যে মার্ক্‌স্ ভারতে সাম্রাজ্যবাদকে এমন এক প্রগতিশীল শক্তি রূপে দেখিয়াছিলেন যাহা ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্ত করিতে এবং তাহাদের সামাজিক অগ্রগতির পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ? ঠিক তাহার উল্টা। ভারতে বৃটিশ পুঁজিতান্ত্রিক শাসনের 'সঞ্জীবনী' ভূমিকার কথা বলিবার সময় মার্ক্‌স্ স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি নূতন অগ্রগতির বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি সম্পর্কে উহার ভূমিকার উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণকেই নিম্নলিখিত উপায়ে সেই প্রগতি ও উন্নতি অর্জ্জন করিতে হইবে। হয় নিজেদের সাফল্যপূর্ণ বিদ্রোহের সাহায্যে, নয়-তো বৃটেনের শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় ও মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের হাত হইতে মুক্তিলাভ—যতক্ষণ না ইহা হইতেছে, ততক্ষণ ভারতে সাম্রাজ্যবাদের যাবতীয় কীর্ত্তি ভারতের জনসাধারণের কোনো উপকারে লাগিবে না বা তাহাদের আস্থার কোনো উন্নতিও করিতে পারিবে না।

"ইংরেজ বুর্জোয়া শ্রেণী যাহাই করিতে বাধ্য হোক না কেন তাহা জনসাধারণকে মুক্ত করিতে পারিবে না বা সামাজিক অবস্থাকেও মূলত পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে না। সেই সামাজিক অবস্থা তো কেবল উৎপাদনের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে না, জনসাধারণ কর্ত্তৃক উহার অধিকার এবং প্রয়োগের উপরই উহা নির্ভর করিতেছে। কিন্তু উহারা যাহা না করিয়া পারিবে না তাহা হইল এই দুইয়েরই বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। বুর্জোয়া শ্রেণী ইহার বেশী কি কখনও কিছু করিয়াছে? রক্ত এবং গ্লানি, দুর্দ্দশা এবং অধঃপতনের ভিতর দিয়া ব্যক্তি বিশেষ এবং জাতিকে টানিয়া না আনিয়া, উহা কি কখনও কোনো উন্নতি সাধন করিয়াছে?

"যতদিন না বৃটেনে বর্ত্তমান শাসক শ্রেণী শিল্পে নিয়োজিত সর্ব্বহারা কর্ত্তৃক অপসারিত হইতেছে অথবা হিন্দুরা বৃটিশের জোয়াল টানিয়া ফেলিয়া

* মার্ক্‌স্: 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল'

দিবার মতো শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত বৃটিশ কর্ত্তৃক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নূতন সমাজের বীজের ফলভোগ ভারতবাসীরা করিতে পারিবে না।" *

ভারতে বিপ্লবের সম্ভাবনা এবং ঔপনিবেশিক জনগণের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এঙ্গেল্‌সের ১৮৮২ সালে প্রদত্ত বিবৃতি ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে:

"ভারতবর্ষ হয়তো খুব সম্ভব এক বিপ্লব সৃষ্টি করিবে; এবং আত্মমুক্তি-সাধক সর্ব্বহারা কোনো ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালাইতে পারে না বলিয়া এই বিপ্লবকে পূর্ণ সুবিধা দিতে হইবে, অবশ্য সকল রকমের বিনাশ ব্যতীত ইহা সঙ্ঘটিত হইতে পারিবে না। কিন্তু যে-কোনো বিপ্লব হইতেই এই সব জিনিস বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। অন্যত্র যথা আলজিয়ার্স এবং মিশরে ইহাই ঘটিতে পারে, এবং উহা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো জিনিসই হইবে।" *

দেখা যাইবে যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মার্ক্‌সের ভারতীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে: প্রথমত, ভারতে বৃটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা; এই শাসন প্রাচীন ভারতের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়াছে; দ্বিতীয়ত, অবাধ বাণিজ্যের পুঁজিবাদের যুগে ভারতে বৃটিশ শাসনের নবপ্রাণ সঞ্চারের ভূমিকা; উহা ভবিষ্যৎ নূতন সমাজের বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; তৃতীয়ত, এক রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাস্তব সিদ্ধান্ত; এই রাজনৈতিক রূপান্তরের দ্বারা ভারতের জনসাধারণ নূতন সমাজ গঠনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন হইতে নিজেদের মুক্ত করিবে।

অবাধ বাণিজ্যের পুঁজিবাদের যুগে ভারতে বৃটিশ শাসনের যে-প্রগতিশীল বা উন্নতিবিধায়ক ভূমিকা ছিল, আজ সারা দুনিয়ায় পুঁজিবাদের ন্যায় তাহার সে-ভূমিকা শেষ হইয়াছে। আজ উহা ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তি; ভারতে প্রতিক্রিয়ার অপরাপর রূপকেই উহা পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া রক্ষা করিতেছে। কাজেই আজ এমন এক স্থানে উপনীত হওয়া গিয়াছে যেখানে মার্ক্‌স্-কথিত রাজনৈতিক রূপান্তরই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

* মার্ক্‌স: 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল'

† কাউট্‌স্কির নিকট লিখিত এঙ্গেল্‌সের পত্র, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতে বৃটিশ শাসন—পুরাতন ভিত্তি

"যাহাকে বলা হইয়া থাকে ভারতে বৃটিশ শাসন তাহার হিংস্রতা ও লুণ্ঠনের কোনো শেষ নাই।" *

ভারতবর্ষ সম্পর্কে মার্ক্‌সের প্রবন্ধাবলী রচনার পর নব্বুই বছরেরও অধিক কাল কাটিয়া গেলেও মার্কসের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মূল কাঠামো অদ্যাবধি বলবৎ রহিয়াছে। ভারতের ভবিষ্যতের যে-চিত্র তিনি দেখিয়াছিলেন, উনবিংশ শতকের অপর কোনো লেখকের রচনায় তাহার কোনো তুলনা মিলিবে না। তাহার পর ঘটনাবলী যে-ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে তাঁহার কথা যে শুধু সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে তাহাই নয়, তিনি ভারত সম্পর্কে যে-রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আজিও অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে।

আজ আমরা সেই বিশ্লেষণকে এমন আর এক যুগে টানিয়া লইয়া যাইতে পারি, যাহার ভিতর ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের জনসাধারণের শক্তি উভয়ই পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের এই ইতিহাসের ভিতর তিনটি বিভিন্ন পর্য্যায় আছে। প্রথম যুগ হইল বাণিজ্যপুঁজির যুগ; তাহার প্রতিনিধি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এই ব্যবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। দ্বিতীয় যুগে আসিল শিল্পগত পুঁজি। উনবিংশ শতাব্দীতে উহা ভারতকে শোষণ করিবার নূতন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে। তৃতীয়টি হইল আধুনিক কালের ব্যাঙ্ক-পুঁজির যুগ। পূর্ব্ব ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের উপর উহা ভারতকে শোষণের জন্য নিজের বিশেষ রীতি ও ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে এবং উনবিংশ

* লেনিন: 'বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে দাহ্য পদার্থ', ১৯০৮।

শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পরিপুষ্টি লাভ করিতে করিতে বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে বাণিজ্যপুঁজি এবং শিল্পগত পুঁজি—এই দুই যুগ লইয়াই মার্ক্‌স্ লিখিয়াছিলেন। আমাদের এখন তাঁহার বিশ্লেষণকে ব্যাঙ্ক-পুঁজির আধুনিক যুগে টানিয়া আনিতে হইবে, ভারতে উহার কার্য্যকৌশল এবং নীতি বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সেইজন্য প্রথম দুইটি যুগের কথা সংক্ষেপে মোটামুটি বলা যাইতে পারে; এ কাজটি জরুরী; কারণ এই দুই যুগেই বর্ত্তমান ব্যবস্থার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়; কী ধরনের পথ বাহিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসা গিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্যও এই আলোচনার প্রয়োজন। প্রথম দুইটি যুগের কথা সংক্ষেপে বলার পর আমরা আধুনিক অবস্থার উপর মনোযোগ পুরাপুরি ভাবে নিবদ্ধ করিতে পারিব। *

১। ভারত লুণ্ঠন

প্রচলিত হিসাব মতো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগ বলিতে ১৬০০ সালের প্রথম সনদ হইতে ১৮৫৮ সালে উহা সাম্রাজ্যের সহিত একেবারে মিশিয়া যাইবার সময় পর্য্যন্ত ধরা হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ভারতে উহার আধিপত্যের আমল হইল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম আমলের বাণিজ্যের কুঠিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইলেও (সুরাট—১৬১২; মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ—১৬৩৯; ১৬৬৯ সাল হইতে বোম্বাই কোম্পানীর নিকট ইজারা দেওয়া হয়; এবং কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম, ১৬৯৬) যে নূতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পরে ভারত জয় করে তাহা প্রথম সনদ পায় ১৬৯৮ সালে; এবং ১৭০৮ সাল পর্য্যন্ত উহা তাহার সম্পূর্ণ সংহত রূপও লাভ করে নাই। তাই হুইগ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যাহারা ইংলণ্ডের উপর নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে, ভারত-বিজেতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই বণিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যবসায়েরই সৃষ্টি।

---

* এই অধ্যায়ে যে-সব তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার জন্য রমেশচন্দ্র দত্তের "বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস" (১৯০১) এবং "ভিক্টোরিয়া যুগে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস" (১৯০৩) এই দুইটি পুস্তকের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। উনবিংশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে-বিকাশ ঘটিয়াছে সেই সম্পর্কে এই বই দুইখানিই অদ্যাবধি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক আলোচনা বলিয়া স্বীকৃত।

পত্রের গুণাগুণ বা শিল্পোৎকর্ষের সহিত তুলনীয় কোনো জিনিস ইংলণ্ড সে-সময়ে ভারতকে দিতে পারিত না। তখন একমাত্র পশমী জিনিসপত্রের শিল্পই সেখানে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অথচ ভারতবর্ষে পশমের কাপড়ের কোনো দরকারই ছিল না। সুতরাং ভারতে মাল খরিদ করিবার জন্য মূল্যবান ধাতু লইয়া আসিতে হয়।

"প্রাচ্যের সহিত ব্যবসায় করিবার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল এই যে, প্রাচ্যে যে-সব পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ইওরোপ তাহার খুব কমই দিতে পারিত। এক রূপা ছাড়া অন্যান্য যে-সব পণ্যদ্রব্য ভারত লইতে পারিত তাহা হইল রাজা-রাজড়ার দরবারের জন্য সামান্য কয়েকটি বিলাসদ্রব্য, সীসা, তামা, পারদ এবং টিন, প্রবাল, সোনা এবং হাতীর দাঁত। কাজেই প্রধানত রূপাই আনা হইতে লাগিল"।*

কাজেই ইহার জন্যই শুরুতেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বছরে ৩০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের সোনা, রূপা ও বিদেশী টাকাকড়ি রফ্‌তানি করিবার এক বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বাণিজ্যবত পুঁজিতন্ত্রের ধারণা ছিল যে দেশের আসল ঐশ্বর্য্যই হইল মূল্যবান ধাতু, এবং ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল মূল্যবান ধাতু দেশে আনিয়া দেশের আসল ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া একটা অনুকূল বাণিজ্যসাম্য সৃষ্টি করা। কাজেই দেশ হইতে বাহিরে সোনা রূপা লইয়া যাওয়াটা তাহাদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিজনক ও কষ্টদায়ক ছিল।

এই সমস্যার যাহাতে সমাধান করা যায় এবং নগণ্য মূল্যে বা বিনা মূল্যে ভারতের মাল যাহাতে সংগ্রহ করা যায় তাহার জন্য একটা উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক 'অভিযাত্রীরা' শুরুতে খুব ব্যস্ত ছিল। প্রথম প্রথম তাহারা যে-উপায় অবলম্বন করে তাহাদের মধ্যে একটি হইল এক রকম ঘোরাপথে ব্যবসায় বাড়াইয়া তোলা। ভারতকে প্রত্যক্ষ ভাবে শোষণ করিবার শক্তি তখনও ছিল না বলিয়া তাহারা বিশেষ করিয়া আমেরিকা ও আফ্রিকার উপনিবেশসমূহ লুণ্ঠন করিয়া উহা দিয়াই ভারতের পাওনা মিটাইতে লাগিল :

"ভারত যাহা লইতে ইচ্ছুক, তেমন জিনিস খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টাই ছিল আসলে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য; এবং

* এল. সি. এ. নোয়েল্‌স্: 'সাগর পারের সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ', পৃঃ ৭৩।

এ-সম্পর্কে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও স্প্যানিশ আমেরিকাতে পণ্য বিক্রয়ের মূল্য হিসাবে পাওয়া রূপাই ছিল এদিক দিয়া সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।" *

কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অযথা ভার চাপাইয়া বিনিময়-সাম্য বিধানের জন্য এবং যত সম্ভব কম টাকা দিয়া যত সম্ভব বেশী জিনিস আদায়ের জন্য ক্রমেই ক্ষমতা প্রয়োগ করার রীতি বেশী করিয়া ব্যবহার করা সম্ভব হইয়া উঠিল। বাণিজ্য ও লুণ্ঠনের ভিতরকার সীমারেখাটা গোড়া হইতেই তেমন ভালো করিয়া টানা ছিল না (পূর্ব্বের ভাগ্যান্বেষী "বীরেরা" অনেক সময়েই ব্যবসার সঙ্গে দস্যুবৃত্তিও চালাইতেন), ক্রমে উহা আরও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। একজন সাধারণ উৎপাদকের তুলনায়—সে তন্তুবায়ই হউক বা কৃষকই হউক—ব্যবসায়ীর সুবিধা চিরকালই বেশী; কেনা বেচার শর্ত্তও সে-ই নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারে। এখন আবার সে সস্তায় কেনার জন্য তুলাদণ্ডে ভারের দিকে নিজের তরবারিখানা পর্য্যন্ত চাপাইয়া দিতে পারিল। দরাদরি সে এমন ভাবে করিতে লাগিল যে ইহার মধ্যে সমানে সমানে বেচাকেনার ভানটুকু পর্য্যন্ত আব রহিল না। ১৭৬২ সালে বাংলার নবাব কোম্পানীব এজেন্টদের সম্বন্ধে কোম্পানীর কাছে অক্ষমের ন্যায় অভিযোগ করেন:

> "তাহারা ন্যায্য মূল্যের চার ভাগের এক ভাগ দিয়া জোর করিয়া কৃষক ও ব্যবসায়ীর নিকট হইতে জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছে এবং গায়ের জোর ও দমননীতির সাহায্যে কৃষকদের নিকট হইতে এক টাকার জিনিসের জন্য পাঁচ টাকা দাম আদায় করিতেছে।" †

তেমনি উইলিয়ম বোল্ট্‌স্‌ নামে একজন ইংরাজ ব্যবসায়ী ১৭৭২ সালে প্রকাশিত "কন্‌সিডারেশন্‌স্‌ অন ইণ্ডিয়ান এ্যাফেয়ার্স" নামক বইয়ে ইংরাজ বণিকদের রীতি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:

> "কোনো উৎপাদককে কত মাল দিতে হইবে, এবং তাহার জন্য সে কত দাম পাইবে সেকথা ইংরাজরা তাহাদের মুৎসুদ্দি ও কালা গোমস্তাদের সাহায্যে যথেচ্ছভাবে স্থির করিয়া ফেলে।...দরিদ্র তন্তুবায়ের সম্মতি সাধারণত দরকার বলিয়াই মনে করা হয় না, কারণ কোম্পানীর কাজে

* নোয়েল্‌স্‌: ঐ, পৃঃ ৭৪

† ইংরেজ গভর্ণরের নিকট বাংলার নবাবের স্মারকলিপি, মে, ১৭৬২

নিযুক্ত গোমস্তারা রায়তদের দিয়া যাহা খুশি সই করাইয়া লয়, এবং তন্তুবায়দের যে-টাকা তাহারা দিতে যায় তাহারা তাহা লইতে অস্বীকার করিলে তাহাদের যে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বেত মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়—একথাও জানা আছে।...এ-সব তন্তুবায়দের মধ্যে কতক কতকের নাম কোম্পানীর গোমস্তাদের খাতায় লেখা থাকে, এবং তাহাদের অপর কাহারও কাজ করিতে দেওয়া হয় না। তাহারা দাসের ন্যায় একজনের হাত হইতে আর-এক জনের হাতে গিয়া পড়ে।...এই বিভাগে যে বদমাশি চলিয়া থাকে, তাহা কল্পনারও অতীত, দরিদ্র তন্তুবায়কে ঠকানোতেই তাহা পরিণতি লাভ করে। কারণ কোম্পানীর গোমস্তারা এবং তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া যাজনদাররা জিনিসের যে-দর ধার্য্য করে, তাহা বাজারদরের চেয়ে সব সময়ে শতকরা অন্তত পনেরো ভাগ এবং কোনো কোনো সময়ে শতকরা চল্লিশ ভাগ কম।"*

কাজেই কোম্পানীর সাধারণ "বাণিজ্য" যতটা না ছিল ব্যবসায়, তাহার চেয়ে বেশী ছিল লুণ্ঠন।

কিন্তু ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ বেসামরিক শাসনব্যবস্থা মঞ্জুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের ব্যবস্থাও যখন কোম্পানীর হাতে গিয়া পড়িল, তখন "ব্যবসায়ের" মুনাফার উপর আবার প্রত্যক্ষ লুণ্ঠনের সীমাহীন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখন পাইকারী ভাবে যে নির্লজ্জ লুণ্ঠন শুরু হয়, তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে কোম্পানীর শাসন ইতিহাসের কথা হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৮৪ সালে কমন্স সভায় প্রস্তাবের ভাষায়:

"পার্লামেণ্টের তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একেবারে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য লইয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ইহা একেবারে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; এবং সনদের বলে যুদ্ধবিগ্রহ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার যে-অধিকার ইহাকে দেওয়া হইয়াছিল, লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া ইহা সেই অধিকারের অপব্যবহার করিয়াছে। তাহারা যে-সব শান্তির চুক্তি করিয়াছে, তাহাদের প্রায় সবই কেবল বিশ্বাসভঙ্গের কারণ

* উইলিয়াম বোল্টস্: 'কন্‌সিডারেশনস্ অন ইণ্ডিয়ান এ্যাফেয়ার্স.' ১৭৭২' পৃঃ ১৯১ ৯৪।

হইয়াছে; এবং যে-সব দেশ এক সময় অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল তাহারাই অক্ষম এবং ক্ষয়ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও ক্ষয় হইয়াছে।”

কোম্পানী ১৮৫৮ সালে পার্লামেণ্টের নিকট দরখাস্তে তাহাদের নিজেদের শাসন সম্পর্কে নিজেদের যে-মতামত দাখিল করে, তাহার সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে (ধর্ম্মধ্বজী আত্মম্ভরী জন স্টুয়ার্ট মিল এই দরখাস্ত লিখিয়া দেন):

“যে-গভর্নমেণ্টে তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যে শুধু উদ্দেশ্যের দিক দিয়াই পবিত্রতম ছিল তাহা নহে, কাজের দিক দিয়াও উহা মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী গভর্নমেণ্টসমূহের অন্যতম।”

এই দাবীর উত্তরে স্যর জর্জ কর্নওয়াল লুইস ১৮৫৮ সালে পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন:

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ১৭৬৫ সাল হইতে ১৭৮৪ সাল পর্য্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নমেণ্টের চেয়ে অসাধু, শঠ, প্রবঞ্চক ও লোভী গভর্নমেণ্ট সভ্য জগতে আর কখনও দেখা যায় নাই।” *

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সব বিচার-বিবেচনার দ্বারা চালিত হইতেন সেই সম্পর্কে ক্লাইভের মতামত পাওয়া যাইবে ১৭৭২ সালে পার্লামেণ্টে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতার ভিতর (ইহাতে শুধু কোম্পানীর কর্ম্মচারী বিশেষের কথা ধরা হয় নাই, এই সব কর্ম্মচারীদের লুঠতরাজ আবার কোম্পানীর ডাকাতির পরও চলিত):

“কোম্পানী যে-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা এক ফ্রান্স ও রুশিয়া ছাড়া ইওরোপের অন্য যে-কোনো রাজ্যের চেয়ে বড়। তাহারা ৪০ লক্ষ স্টার্লিং রাজস্ব অর্জ্জন করিয়াছে এবং সেই অনুপাতে ব্যবসায় বাণিজ্যও চালাইয়াছে। এইরূপ একটা বিষয়ের উপর যে কর্তৃপক্ষের যথোপযুক্ত মনোযোগ পড়িবে সেকথা ভাবা স্বাভাবিক।......কিন্তু তাঁহারা কি বিষয়টা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন? না, দেখেন নাই। তাঁহারা ইহাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সারবান ব্যাপার বলিয়া না ধরিয়া সাউথ সী বাব্‌ল্‌-এর (সমুদ্রে বুদ্বুদ) ন্যায় একটা ব্যাপার বলিয়া ধরিয়াছেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো চিন্তা তাঁহারা করেন নাই। এক বর্ত্তমান ব্যতীত অন্য কিছু

* কমন্স সভায় সার জর্জ কর্নওয়াল লুইসের উক্তি, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮।

তাঁহারা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন—আজ যাহা পাওয়া যাইতেছে, এখন তো তাহাই লওয়া যাক। তারপর আগামী কালের কথা ভাবিয়া মরুক আগামী কাল। অবিলম্বে লাভের কড়ি ভাগযোগ করিয়া লওয়া ছাড়া তাঁহারা আব কিছু ভাবেন নাই।" *

বাংলায় এবং অন্যান্য বিজিত প্রদেশে বেসামরিক কর্তৃত্ব পাওয়ার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তাহার স্বরূপটা কী? শাসনভার হাতে লওয়ার মূলে একমাত্র কারণ ছিল যে লাভের অঙ্ক কষা ও উহা ইংলণ্ডে পাঠানো—সেকথা ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে ডিরেক্টরদের নিকট লিখিত পত্রে এমন স্পষ্ট সরল ভাবে বলিয়াছেন যে পরের আমলের মানবহিতৈষণার লম্বা লম্বা বুলির সহিত উহার বৈসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়িবে:

"আমি যতদূর বিচার করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে বর্দ্ধমান ইত্যাদির উপর আপনাদের পূর্ব্বেকার আধিপত্যের কথা ধরিয়া এই অধিকারপ্রাপ্তির ফলে আগামী বৎসরে আপনাদের রাজস্ব ২৫০ লক্ষ সিক্কার কম হইবে না। ইহার পরে উহা অন্তত আরও বিশ ত্রিশ লক্ষ বেশীই হইবে। শান্তির সময়ে আপনাদের সামরিক ও বেসামরিক খরচপত্র কখনই ৬০ লক্ষ টাকার উপর যাইতে পারে না; নবাবের ভাতা ইতিমধ্যেই কমাইয়া ৪২ লক্ষ টাকায় দাঁড় করানো হইয়াছে। রাজাকে (মুঘল সম্রাট) দেয় করও কম করার ফলে দাঁড়াইয়াছে ২৬ লক্ষ টাকায়। কাজেই কোম্পানীর ১২২ লক্ষ টাকা অথবা ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৯ শত স্টার্লিং লাভ সোজাসুজি রহিয়া যাইতেছে।" †

এখানে ব্যবসায়ীর হিসাবের বইয়ের মতো স্পষ্ট ও সরল ভাবে সব কথা লেখা হইয়াছে। জনসাধারণের নিকট হইতে আদায়-করা রাজস্বের চার ভাগের এক ভাগই শাসন চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া ধরা হইয়াছে; স্থানীয় ভূস্বামীদের (নবাব ও মুঘল সম্রাট) দাবী মিটাইবার জন্য আরও এক-চতুর্থাংশ দরকার। অবশিষ্ট রহিল সারা রাজস্বের অর্দ্ধেক, উহার পরিমাণ ১৫ লক্ষ পাউণ্ড। তাহা "সোজাসুজি লাভ"। বটম্‌লির পুরাতন স্বপ্ন "ব্যবসায়ীর রাজত্ব"

* কমন্স সভায় ক্লাইভের উক্তি, ৩০শে মার্চ ১৭৭২।
† ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের নিকট ক্লাইভের পত্র, ৩০শে সেপ্টেম্বর,

এখানে যেমন সম্পূর্ণ ভাবে সফল হইয়াছে এমনটি ইহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও হয় নাই।

শাসনের ফলাফল ও তাহার উদ্দেশ্য—এই দুইয়ের ভিতর যে কতটা মিল ছিল তাহা ১৭৭৩ সালে পার্লামেণ্টে প্রদত্ত কোম্পানীর প্রথম ছয় বৎসর শাসনের সময়কার রাজস্ব আদায় এবং খরচপত্রের হিসাবেই দেখা যায়। মোট রাজস্বের পরিমাণ দেখানো হইয়াছিল ১৩,০৬৬,৭৬১ পাউণ্ড; মোট খরচ হইয়াছিল ৯,০২৭,৬০৯ পাউণ্ড; বাকি ৪,০৩৯,১৫২ পাউণ্ড বিলাতে পাঠানো হইয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে বাংলার রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ "সোজাসুজি লাভ" হিসাবে দেশের বাহিরে চালান দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু ইহাই মোট করের সবখানি নহে। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাও বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম দিকে ক্লাইভের কিছুই ছিল না; কিন্তু তিনি যখন দেশে ফিরিলেন তখন ভারতে বাৎসরিক ২৭ হাজার পাউণ্ড আয়ের জমিদারী ছাড়াও তাঁহার অন্যান্য ধনসম্পত্তির মূল্য হইল সাড়ে বারো লক্ষ পাউণ্ড। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "এক লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ধনসম্পত্তি দুই বৎসরে অর্জ্জন করা হইয়াছে"। আমদানি রফতানির হিসাবপত্র মারফৎ পুরা করের পরিমাণের আরও কাছাকাছি একটা হিসাব পাওয়া যাইবে। গভর্নর ভেরেল্স্ট-এর মতে ১৭৬৬ হইতে ১৭৬৮ এই তিন বৎসরের মোট রফতানি হইয়াছিল ৬,৩১১,২৫০ পাউণ্ড, অথচ আমদানির পরিমাণ হইল মাত্র ৬২৪,৩৭৫ পাউণ্ড। কাজেই নূতন শাসক এই ব্যবসাদার কোম্পানীর কৃপায় দেশে আমদানির চেয়ে দেশ হইতে রফতানি হইল দশ গুণ বেশি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ীদের সব চেয়ে সাধের স্বপ্ন ছিল, বিনিময়ে কিছু না দিয়া ভারত হইতে ঐশ্বর্য্য বাহিরে লইয়া যাওয়া; সে স্বপ্ন এই ভাবে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম দিককার লুণ্ঠনের বহর দেখিয়াই ক্লাইভের কাউন্সিলের সদস্য এল. স্ক্রাফটন উল্লাসের আতিশয্যে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, "এক আউন্স সোনা না পাঠাইয়াও" তিন বৎসর ধরিয়া সারা ভারতব্যাপী বাণিজ্য চালানো সম্ভব হইয়াছে:

> "এই গৌরবময় সাফল্য জাতির হাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড আনিয়া দিয়াছে; কারণ সত্য কথা বলিতে কি, সুবা হইতে যে প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়, তাহার সবটাই শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডেই কেন্দ্রীভূত থাকে। কোম্পানীর শেয়ার হইতেই হোক বা কলিকাতা খাজাঞ্চি খানায় প্রদত্ত বিল বা পাওনা

টাকা বাবদই হোক, উহার এত বড় একটা অংশ কোম্পানীর হাতে গিয়া পড়ে যে তাহারা এক আউন্সও সোনা বা রূপা না পাঠাইয়াই সারা ভারতের বাণিজ্য পুরা তিন বৎসর ধরিয়া চালাইতে সমর্থ হইয়াছে। বিদেশী কোম্পানীর মারফৎও মোটা মোটা টাকা পাঠানো হইয়াছে। সে সব দেশের সহিত বাণিজ্যের লেন দেনে এই টাকা আমাদেরই দিকে গিয়া পড়িতেছে।"*

বাংলার রাজস্বের যে অংশ ইংলণ্ডে পাঠানো হইয়াছিল, আইনের বুলিতে তাহার নাম দেওয়া হয় কোম্পানীর "লগ্নী টাকা।" ১৭৮৩ সালে কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটি এই ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রদত্ত রিপোর্টে বলেন :

"বহু বৎসর ধরিয়া বাংলার রাজস্বের একটা অংশ ইংলণ্ডে রপ্তানির জন্য জিনিসপত্র ক্রয় বাবদ আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাকেই লগ্নী বলা হইয়া থাকে। কোম্পানীর বড় বড় চাকুরীয়াদের যোগ্যতা সাধারণত যে মানদণ্ডে বিচার করা হইয়াছে, তাহা হইল এই লগ্নীর পরিমাণ, এবং ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সৃষ্টির এই প্রধান কারণকেই সাধারণত ঐশ্বর্য্য এবং সমৃদ্ধির নিরিখ বলিয়া ধরা হইয়াছে।...বস্তুত, দেশের কল্যাণকর বাণিজ্য নহে, কর দেওয়াটাই এই চটকদার মনভুলানো রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।...

"বাংলা এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যে লেনদেন চলিতেছে তাহা বাণিজ্য নহে। ইহার হিসাব যখন লওয়া হইবে, তখন লগ্নী ব্যবস্থার অনিষ্টকর ফল অতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে। তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, দেশের যে সমস্ত রপ্তানি জিনিসপত্রের সহিত কোম্পানীর কোন সম্পর্ক আছে, তাহার মধ্যে কোনটাকেই বিনিময় বলা চলে না। প্রতিদানে অন্য কিছু জিনিসপত্র বা পয়সা কড়ি না দিয়াই তাহার সবটুকু লইয়া যাওয়া হয়।" †

বাংলা দেশের লোকের উপর এই ব্যবস্থার ফলাফল সহজেই অনুমান করা যায়। ক্রমবর্দ্ধমান লুণ্ঠনের অবিরত নূতন দাবী ভূমি-রাজস্বকেও এমন বেপরোয়া ভাবে উঁচুতে ঠেলিয়া লইয়া চলিল যে, অনেক ক্ষেত্রে উহা কৃষকদের

* এল. স্ক্রাফ্টন : 'রিফ্লেকসনস্ অন দি গভর্নমেণ্ট অফ্ হিন্দুস্থান,'—১৭৬৩

† 'হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্ট,' ১৭৮৩, পৃঃ ৫৪-৫৫

নিকট হইতে বীজ এবং বলদ পর্য্যন্ত কাড়িয়া লওয়ার শামিল হইয়া দাঁড়াইল। ১৭৬৪-৬৫ সালে বাংলার শেষ ভারতীয় শাসকের শাসনের শেষ বৎসরে ৮১৭০০০ পাউণ্ড ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হইয়াছিল। ১৭৬৫-৬৬ সালে কোম্পানীর শাসনের প্রথম বৎসরে বাংলার ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হয় ১,৪৭০, ০০০ পাউণ্ড। ১৭৭১-৭২ সালের মধ্যে উহাই আবার ২৩৪১০০০ পাউণ্ডে গিয়া ঠেকিয়াছে এবং ১৭৭৫-৭৬ সালে গিয়া উঠিয়াছে ২৮১৮০০০। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন তিনি ৩৪,০০,০০০ পাউণ্ড ভূমি-রাজস্ব ধার্য্য করিয়া দিলেন।

এই ভাবে কয়েক বৎসরের ভিতর দেশের দ্রুত সর্ব্বনাশ সাধন, ইহার ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষে দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হ্রাস, এবং সারা দেশের এক তৃতীয়াংশের "কেবল বন্যজন্তুর বাসভূমিতে" রূপান্তরিত হওয়ার কথাই সকল সমসাময়িক পর্য্যবেক্ষকরা বলিয়া গিয়াছেন।

১৭৬৯ সালে কোম্পানীর মুর্শিদাবাদস্থ রেসিডেণ্ট বেচার কোম্পানীর কাছে রিপোর্ট দাখিল করেন:

"কোম্পানীর দেওয়ানী ভার পাওয়ার পর এ দেশের লোকের অবস্থা যে পূর্ব্বের চেয়ে খারাপ হইয়াছে এমন কথা চিন্তা করার কারণ থাকাটাই ইংরেজের পক্ষে বেদনাদায়ক; তবু কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।...সর্ব্বাপেক্ষা স্বেচ্ছাচারী এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনেও এই সুন্দর দেশ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে; আজ যখন শাসন ব্যবস্থার উপর ইংরেজের এতখানি হাত রহিয়াছে, তখনও কিন্তু উহা সর্ব্বনাশের কিনারায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।...

"এই দেশে যখন অবাধ বাণিজ্য ছিল তখনকার কথা আমার বেশ মনে পড়ে; সেদিন ইহার যে সমৃদ্ধ অবস্থা ছিল, তাহাও আমার মনে পড়িতেছে। ইহার বর্ত্তমান সর্ব্বনাশও আমি উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি। আমার স্থির বিশ্বাস যে, গত কয়েক বৎসরের ভিতর কোম্পানীর নামে দেশের প্রায় সকল উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যে একচেটিয়া ব্যবসায় চলিয়াছে—তাহাই এই সর্ব্বনাশের জন্য বহুলাংশে দায়ী।"

১৭৭০ সালের মধ্যেই "এই সর্ব্বনাশা অবস্থার" পিছু পিছু আসিল দুর্ভিক্ষ। কোম্পানীর সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী সে-দুর্ভিক্ষ "বর্ণনার অতীত। একদা-সমৃদ্ধ পূর্ণিয়া প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশের বেশী লোক মারা গিয়াছে এবং অন্যান্য

স্থানেও দুর্দ্দশা সমানই।" এক কোটি লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা যায় বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভূমিরাজস্ব যে কেবল কড়াকড়ি করিয়া আদায় করা হইয়াছিল তাহা নহে, উহার পরিমাণও এই সময় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৭৭১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিল রিপোর্ট দাখিল করিয়া বলেন:

> "গত দুর্ভিক্ষের সময় দেশে দারুণ কষ্ট এবং তাহার ফলে দেশের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মৃত্যু সত্ত্বেও ১৭৬৮ সালের চেয়ে ১৭৭১ সালের নীট আদায় বেশীই হয়। এত বড় একটা সর্ব্বনাশের অন্যান্য ফলাফলের সঙ্গে রাজস্ব হ্রাসও যে তালে তাল দিয়া চলিবে—এইরূপ আশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু গায়ের জোরে উহা পূর্ব্বের আদায়পত্রের সঙ্গে সমান সমান করিয়া রাখার জন্যই আদায় কমে নাই।" *

পনেরো বৎসর পর পার্লামেন্টের সদস্য উইলিয়াম ফুলারটন বিশ বৎসর ব্যাপী কোম্পানীর শাসনে বাংলাদেশের রূপান্তর বর্ণনা করিয়া বলেন:

> "পূর্ব্বে বাংলা দেশ ছিল বিভিন্ন জাতির শস্যভাণ্ডার; প্রাচ্যের বাণিজ্য, ঐশ্বর্য্য এবং শিল্পেরও ভাণ্ডার ছিল এই দেশ।...
>
> "কিন্তু আমাদের কুশাসনের শক্তি এমনই দুর্জ্জয় যে এই অতি অল্প বিশ বৎসরের মধ্যেই এই দেশের অনেক অংশই মরুভূমির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মাঠগুলিতেও আর চাষ আবাদ করা হয় না; বহু-বিস্তৃত অঞ্চল বনজঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে; কৃষক হইতেছে লুণ্ঠিত; শিল্পদ্রব্যের উৎপাদকের উপর অত্যাচার চলিতেছে। দুর্ভিক্ষ বারবার দেখা দিতেছে; লোকসংখ্যা হ্রাস পাইতে শুরু করিয়াছে।" †

বার্ক তাঁহার অলঙ্কারবহুল নিন্দাভাষণে বলিয়াছিলেন: "আজ যদি আমাদের ভারত হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে, আমাদের গৌরববিহীন আধিপত্যের আমলে ভারত যে বনমানুষ বা বাঘের চেয়ে ভালো কোনো জীবের অধিকারে ছিল, তেমন কথা বলিবার মতো কিছুই থাকিবে না।"

১৭৮৯ সালের মধ্যেই গভর্নর-জেনারেল কর্নওয়ালিসের বিবরণীর ভিতর এই অলঙ্কারবহুল উক্তির তথ্যসমন্বিত প্রতিধ্বনি মিলিবে:

* ওয়ারেন হেস্টিংস্: "রিপোর্ট টু দি কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্," ৩রা নভেম্বর, ১৭৭২।

† উইলিয়ম ফুলারটন (পার্লামেন্টের সদস্য): "এ ভিউ অফ্ দি ইংলিশ ইণ্টারেস্টস্ ইন ইণ্ডিয়া", ১৭৮৭।

"আমি নিরাপদে বলিতে পারি যে, হিন্দুস্থানে কোম্পানীর জমি জায়গার এক-তৃতীয়াংশ এখন কেবল বন্য পশুরই বাসভূমি।"*

২। ভারত ও শিল্পবিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারত লুণ্ঠনের ভিত্তিতেই আধুনিক ইংলণ্ড গড়িয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ড প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশই ছিল। ১৭৫০ সালেও নর্দার্ন কাউণ্টিগুলির জনসংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশেরও কম, গ্লস্টারশায়ারে ল্যাঙ্কাশায়ারের চেয়ে ঘন বসতি ছিল (এ. টয়েনবি: "শিল্পবিপ্লব", পৃঃ ৯-১০)। তখনও পর্য্যন্ত পশমজাত দ্রব্যাদির শিল্পই প্রধান শিল্প। বেইনের মতে ("হিস্টরি অফ্ দি কটন্ ম্যানুফ্যাক্চার", পৃঃ ১১২), ১৭৭০ সালে পশমজাত দ্রব্যাদির রফ্তানিই দেশের মোট রফ্তানির এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ অধিকার করিয়াছিল। বেইন্স্ লিখিতেছেন: "তুলাজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারীর জন্য যে-যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইত, তাহা ১৭৬০ সাল পর্য্যন্ত ভারতে উক্ত কার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির মতোই সাদাসিদা ধরনের ছিল" (পৃঃ ১১৫)।

শ্রেণীবিভাগ, সর্ব্বহারা শ্রেণী সৃষ্টি, এবং নিরাপদ বুর্জোয়া শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করিলে, সমাজের দিক দিয়া শিল্পগত পুঁজিতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবার উপযোগী অবস্থা তখন ছিল। তখন বাণিজ্যগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শিল্পগত পুঁজিতন্ত্রের স্তরে অগ্রসর হইতে গেলে প্রথমেই যে-পরিমাণ পুঁজি জমিয়া উঠা দরকার, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে তাহা ছিল না।

তারপর ১৭৫৭ সালে আসিল পলাশীর যুদ্ধ, এবং ভারতের ঐশ্বর্য্য অবিরত স্ফীত ধারায় দেশে প্রবেশ করিয়া দেশকে ভাসাইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

যে-সব ধারাবাহিক বিরাট আবিষ্কার শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করিয়া দিয়াছিল, তাহা ঠিক ইহার অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয়। ১৭৬৪ সালে হারগ্রীভ্সের বয়নযন্ত্র দেখা দিল। ১৭৬৫ সালে আসিল ওয়াট্সের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন (১৭৬৯ সালে উহার পেটেণ্ট্ করা হয়); ১৭৬৯ সালে আর্ক্রাইটের ওয়াটার-ফ্রেম্; তাহার পর ১৭৭৫ সালে তাঁহারই কার্ডিং, ড্রয়িং ও স্পিনিং মেশিনের পেটেণ্ট করা হয়; ১৭৭৯ সালে ক্রম্প্টনের মিউল, ১৭৮৫ সালে কার্টরাইটের

* লর্ড কর্ণওয়ালিসের মন্তব্য, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯।

পাওয়ার-লুম ; ১৭৮৮ সালে ব্লাস্ট ফারনেস, বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন প্রয়োগ করা হয়।

এই যে-সব আবিষ্কার একের পর এক এই সময়টাতেই ভীড় করিয়া আসিল, ইহাতে এই কথাটিই বুঝা যায় যে উহাদের প্রয়োগ এবং ব্যবহারের জন্য সামাজিক অবস্থা তখন উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বের আবিষ্কার তো লাভজনক ভাবে ব্যবহার করাই হয় নাই। "১৭৩৩ সালে কে তাঁহার ফ্লাই-শাট্‌ল্‌-এর এবং ১৭৩৮ সালে ওয়াট তাঁহার জলশক্তি-চালিত রোলার স্পিনিং মেশিনের পেটেন্ট লন। কিন্তু ইহাদের কোনটিকেই কাজে লাগানো হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না (জি. এইচ্‌. পেরিস : 'দি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হিস্টরি অফ্‌ মডার্ন ইংল্যাণ্ড', পৃঃ ১৬)।

ইংলণ্ডের শিল্প-ইতিহাস বিষয়ে মুখ্য পণ্ডিত ডাঃ কানিংহাম তাঁহার "আধুনিক যুগে ইংলণ্ডে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি" নামক বইয়ে দেখাইয়া দিয়াছেন যে "উদ্ভাবনী প্রতিভার কোনো বিশেষ ও অনধিগম্য হঠাৎ আবির্ভাবের উপরই" আবিষ্কারের যুগের বিকাশ নির্ভর করে নাই ; উহা নির্ভর করিয়াছে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি জমিয়া উঠার উপর এবং এমন একটা অপরিহার্য্য অবস্থার উপর যাহাতে সেই পুঁজি ভালো ভাবে খাটানো যায় :

> "আবিষ্কার ইত্যাদি অনেক সময় আকস্মিক বলিয়া মনে হইতে পারে ; লোকে মনে করিয়া থাকে নূতন যন্ত্রাদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবনী প্রতিভার বিশেষ এবং সহসা আবির্ভাবের ফল। কিন্তু আর্করাইট ও ওয়াট সম্পর্কে যদি বলা হয় যে তাঁহারা ভাগ্যবান ছিলেন এই বিষয়ে যে সময় তাঁহাদের পক্ষে অনুকূল ও উপযোগী ছিল, তাহা হইলে তাঁহাদের ছোট করা হইবে না। উইলিয়ম লী এবং ডোডা ডাডলীর দিন হইতে বহু উদ্ভাবনক্ষম ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের যুগের অবস্থা তাঁহাদের সাফল্যের অনুকূল ছিল না।
>
> "ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রাদি বা কর্ম্মপদ্ধতি চালু করিতে গেলে মোটা রকমের টাকা খাটানো চাই। যত উদ্যমশীল লোকই হউক না কেন, যদি তাহার বেশ মোটা মূলধন না থাকে, এবং বিস্তৃত বাজারের সহিত তাহার যোগা-যোগ না থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোনো রকম চেষ্টা করাটাই কাজের হইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই-সব অবস্থা ক্রমে ক্রমে বাস্তবে রূপান্তরিত হইতেছিল। ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংলণ্ড এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ফলে মূলধন গঠনের কাজে বিরাট প্রেরণার সৃষ্টি হয় ; এবং যোগ্য

ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসা পরিচালনায় ব্যয়সাপেক্ষ উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহ করা তখনকার দিনে যেমন সম্ভব হইয়াছিল, তেমন আর পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।"*

অবশ্য ১৬৯৪ সালে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড প্রতিষ্ঠাই গোড়ার দিককার পুঁজি সঞ্চয়ের পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের মূলধন এবং চলতি মূলধন কমই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে সঞ্চিত মূলধন পাওয়ার এত সুবিধা হঠাৎ কোথা হইতে আসিল? মার্ক্স্ দেখাইয়া দিয়াছেন যে বুর্জোয়া প্রগতির প্রথমাবস্থা এবং তাহার পরের দিককার অবস্থার মতোই আধুনিক জগতে প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ও হইয়া থাকে প্রথমত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার কল্যাণে লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তি হইতে—মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রূপা হইতে, দাস-ব্যবসায় হইতে ও ভারতকে লুণ্ঠন করিয়া। ("অজিয়ারের মতে অর্থ যদি 'তাহার এক গণ্ডে সহজাত রক্তকলঙ্কের চিহ্ন লইয়া আসে', তাহা হইলে মূলধন যখন অবতীর্ণ হয় তখন মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে, তাহার প্রতিটি রোমকূপ হইতে রক্ত এবং ক্লেদ ঝরিয়া পড়িতে থাকে: 'ক্যাপিটাল,' ১ম খণ্ড, ৩১শ পরিচ্ছেদ)। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইংলণ্ডে সহসা যে-মূলধন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আসিয়াছিল প্রধানত ভারত হইতে লুঠ করা ঐশ্বর্য্য হইতে।

"ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড প্রতিষ্ঠার পর ষাট বছর পর্য্যন্ত তাহার সব চেয়ে কম মূল্যের নোট ছিল ২০ পাউণ্ডের। এত অধিক মূল্যের নোট বাজারে সহজে চলিত না এবং লম্বার্ড স্ট্রীট হইতে বেশী দূর পর্য্যন্ত দৌড় ইহার খুই কমই ছিল। ১৭৯০ সালে বার্ক্ বলিয়াছিলেন যে তিনি যখন ১৭৫০ সালে ইংলণ্ডে আসেন তখন প্রদেশগুলিতে 'বারোটি ব্যাঙ্কারের দোকানও" ছিল না; যদিও এখন (১৭৯০ সালে) উহা প্রত্যেক শহরেই রহিয়াছে। কাজেই বাংলার রূপা আসিয়া শুধু যে টাকার পরিমাণই বাড়াইল তাহা নয়, উহার চলাচলও বাড়াইয়া দিল। কারণ ১৭৫৯ সালে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড সরাসরি দশ এবং পনেরো পাউণ্ড নোট বাজারে ছাড়িল এবং বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিও দেশে কাগজের (টাকার) বন্যা বহাইয়া দিল।" †

---

*ডব্লিউ কানিংহাম: "আধুনিক যুগে ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি", পৃঃ ৬১০।

† ব্রুক্স্ এ্যাডামস্: 'দি ল অফ্ সিভিলাইজেশন এ্যাণ্ড ডিকে,' পৃঃ ২৬৩-৬৪।

"ভারতের ঐশ্বর্য্য আসিয়া দেশের নগদ পুঁজি বেশ ভালোভাবে বাড়াইয়া দিয়া শুধু যে ইহার মজুত শক্তির পরিমাণই বৃদ্ধি করিল তাহা নয়; উহার প্রসারক্ষমতা ও চলাচলের গতিবেগও বাড়াইয়া দিল। পলাশীর পরেই বাংলা হইতে লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য লণ্ডনে আসিতে আরম্ভ করে, এবং উহার ফলাফলও সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া যায়; কারণ, সকল বিশেষজ্ঞই এ বিষয়ে একমত যে, যে-শিল্পবিপ্লব উনবিংশ শতাব্দীকে উহার পূর্ব্বের আর সব যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ১৭৬০ সালেই আরম্ভ হয়। বেইন্‌সের মতে, ১৭৬০ সালের পূর্ব্বে ল্যাঙ্কাশায়ারে সূতা কাটিবার যে-যন্ত্র ব্যবহৃত হইত তাহা প্রায় ভারতের যন্ত্রের মতোই সরল ছিল; এবং জ্বালানির জন্য বন-জঙ্গল নষ্ট করিয়া ফেলার দরুন ১৭৫০ সালে ইংলণ্ডে লৌহশিল্প তো পুরাপুরি অবনতির দিকেই নামিয়া যাইতেছিল। সে-সময়ে দেশে যে-পরিমাণ লৌহ ব্যবহৃত হইত তাহার পাঁচ ভাগের চার ভাগই আসিত সুইডেন হইতে।

"পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ সালে। তাহার পর যেমন তাড়াতাড়ি পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহার বোধ হয় আর তুলনা নাই। ১৭৬০ সালে 'ফ্লাইং শাট্‌ল্‌' আসিল এবং ধাতু গলাইয়া পরিষ্কার করার কাজে কাঠের বদলে কয়লার ব্যবহার শুরু হইল। ১৭৬৪ সালে হারগ্রীভ্‌স্‌ 'স্পিনিং জেনি' আবিষ্কার করিলেন, ১৭৭৬ সালে ক্রম্পটন 'মিউল' বাহির করিলেন। ১৭৮৫ সালে কার্টরাইট 'পাওয়ার লুম্‌'-এর পেটেণ্ট লইলেন; এবং সব চেয়ে বড় কথা, ১৭৬৮ সালে ওয়াট কেন্দ্রীকৃত শক্তির সর্ব্বোত্তম নির্গমপথ 'স্টীম ইঞ্জিন'কে সুপরিণত অবস্থায় আনিলেন। সেই সময়কার যে গতিবেগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এই সব যন্ত্র তাহার নির্গমপথ হিসাবে কাজ করিলেও, তাহারাই কিন্তু এই বেগবৃদ্ধির কারণ নহে। আবিষ্কার আপনা হইতে নিষ্ক্রিয়, জরুরী বহু আবিষ্কার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জড়ের ন্যায় পড়িয়া ছিল; যে-শক্তির ভাণ্ডার তাহাদের সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারিবে, তাহার জন্যই ইহারা অপেক্ষা করিয়া ছিল। সেই শক্তির আধার সর্ব্বদাই অর্থের রূপ পরিগ্রহ করে—মজুত করা অর্থ নহে, চালু অর্থ। ভারতের ঐশ্বর্য্য আমদানী এবং তাহার পর লগ্নী বাড়িয়া উঠার আগে এই কাজের জন্য যে-পরিমাণ শক্তির দরকার তাহা ছিল না; এবং ওয়াট যদি পঞ্চাশ বছর আগে আসিতেন,

তাহা হইলে হয়তো তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবিষ্কারও ধ্বংস হইয়া যাইত। ভারত লুঠ করিয়া যে-পরিমাণ লাভ হইয়াছে, পৃথিবীর শুরু হইতে এমনটি বোধ করি আর কোনো কিছুতে হয় নাই। কারণ, প্রায় পঞ্চাশ বছর কাল গ্রেট বৃটেনের আর কোনো প্রতিযোগীও ছিল না। ১৬৯৪ সাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) পর্য্যন্ত বৃদ্ধিটা অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে হইয়াছে। ১৭৬০ এবং ১৮১৫ সালের মধ্যে উহা অত্যন্ত দ্রুত এবং আশ্চর্য্য ভাবে সাধিত হইয়াছে।"*

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব করিয়া তোলার কাজে যে মূলধন সঞ্চয় এক অত্যাবশ্যক ভূমিকার অভিনয় করে, তাহার গোপন উৎস ছিল ভারত লুঠ করা সম্পদ।

কিন্তু ভারতের লুণ্ঠিত সম্পদের সাহায্যে ইংলণ্ডে একবার যখন শিল্পবিপ্লব সাধিত হইয়া গেল, তখন তৈয়ারী জিনিসপত্র বাহির করিয়া দিবার পথ খোঁজাটাই একটা নূতন বড় কাজ হইয়া দাঁড়াইল। ইহার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতরও একটা বিপ্লব দরকার হইয়া পড়িল। বাণিজ্যগত পুঁজিতন্ত্রের নীতির বদলে আসিল অবাধ-ব্যবসায়মূলক পুঁজিতন্ত্রের নীতি। আবার ইহারই সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত রীতিপদ্ধতিতেও একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল।

এই নূতন প্রয়োজনের তাগিদে ভারতে পূর্ব্বেকার একচেটিয়া অধিকারের বদলে একটা খোলা বাজার সৃষ্টির দরকার হইয়া পড়িল। সারা জগতে তুলাজাত দ্রব্যাদির রফ্তানিকারক দেশ হইতে ভারতকে তুলাজাত দ্রব্যাদির আমদানিকারী দেশে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হইল। ইহার অর্থ হইল ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক বিপ্লব। সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহার অর্থ হইল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোটা পুরাতন ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন সাধন। প্রয়োজন হইল ভারতকে শোষণ করিবার ব্যবস্থারও একটা রূপান্তর—এমন একটা রূপান্তর যাহা কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারী কায়েমী স্বার্থের দৃঢ় বাধার বিরুদ্ধে সংসাধিত করিতে হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পনেরো বৎসরের ভিতর এই পরিবর্ত্তন সাধনের পথ পরিষ্কার করা হইয়াছিল।

* ঐ পৃঃ ২৫৯-৬০।

ভালোভাবে শোষণ চালাইবার খাতিরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তাহার কর্ম্মচারীদের পাইকারী, নিয়মবিহীন ও ধ্বংসাত্মক শোষণনীতির কিছু অদল-বদল না করিলে যে চলিবে না তাহা স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল। কয়েক বৎসর পর ইংলণ্ডে ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যবসাদারদের অসীম লোভ যেমন নয় পুরুষের লোককে এক পুরুষেই সাবাড় করিয়া দিয়াছিল, তেমনি কোম্পানী ও তাহার কর্ম্ম-চারীদের নির্বোধ ও উচ্ছৃঙ্খলতামূলক লোভ শোষণের ভিত্তিটাকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল; এবং সারা পুঁজিপতি শ্রেণীর তরফ হইতে ভবিষ্যৎ শোষণের মুখ চাহিয়া রাষ্ট্রকে যেমন সেই লোভ দমন করিতে হইয়াছিল (আক্রমণটা আসিয়াছিল তাহাদের অর্থনৈতিক প্রতিযোগী, ভূমিগত স্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণীর নিকট হইতে), তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরের ভিতর ভারতে কোম্পানীর কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সাহায্য চাহিতে হইয়াছিল। এখানেও আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছিল বিরোধী স্বার্থ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরোধী অসংখ্য দল উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য মিলিত হইয়াছিল। এই সময়ে ইহারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুশাসনের বিরুদ্ধে এক বিরাট সাহিত্য রচনা করে; সম্পূর্ণ তথ্য, খুঁটিনাটি এবং প্রামাণিক বিবরণীর সাহায্যে এই সাহিত্য যেভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে, তাহার জুড়ি আর কোনকালে মেলে নাই।

অপেক্ষাকৃত ভালো ভারতীয় বস্ত্র আমদানী করিয়া ভয়াবহ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ইতিপূর্ব্বেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছিল। ১৭২০ সালের মধ্যেই তাহারা ইংলণ্ডে ভারতীয় সিল্ক ও ছিট আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হয়; তাহা ছাড়া ক্রমেই ভারতে প্রস্তুত তুলাজাত দ্রব্যের উপর শুল্কের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইতে থাকে। ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি লইয়া কোম্পানী যে-ব্যবসায় চালাইতে থাকে, তাহাতে বিলাতের বন্দরগুলি কেবল যেন গুদাম রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে; অর্থাৎ ভারত হইতে আমদানী জিনিস-পত্রগুলি বিলাতের বন্দর মারফৎ ইওরোপের অন্যান্য দেশে চালান দেওয়া হইত।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরের ভিতর যে নূতন আক্রমণ সংগঠিত হয় তাহা ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দোষদুষ্ট সারা একচেটিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল। কেবল যে ইংলণ্ডের উদীয়মান উৎপাদকদের

সমর্থনই ইহার পিছনে ছিল তাহা নহে, ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার হইতে যে-সব শক্তিশালী বণিকদল বাদ পড়িয়াছিল, তাহারাও ছিল ইহার সমর্থক। ইহারা হইল নূতন শিল্পগত পুঁজিতন্ত্রের অগ্রগামী। ইহাদের দাবী ছিল, ভারতের বাজারে ইহাদের বিনা বাধায় প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং ব্যক্তিগত অসাধুতা ও শোষণের দরুন সেই বাজার ভালোভাবে শোষণের পথে যে-সব বাধা রহিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে।

অবাধ-বাণিজ্যমূলক পুঁজিতন্ত্রের জনক এবং নূতন যুগের পুরোহিত এ্যাডাম স্মিথই যে ১৭৭৬ সালে এই আক্রমণ আরম্ভ করেন, সেকথাটি কিন্তু বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাঁহার 'ওয়েল্‌থ্‌ অফ্‌ নেশন্‌স' ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। উইলিয়ম পিট যে নূতন রাজনীতিক ভাবধারার প্রতিনিধি সেই দলের রাজনীতিকদের কাছে এই বই একেবারে বাইবেল বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার এক অংশে এ্যাডাম্ স্মিথ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সারা ভিত্তিটার উপরই নির্ম্মম আক্রমণ চালান। স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন :

"এই ধরনের একচেটিয়া কোম্পানীগুলি সব দিক দিয়াই বিরক্তিকর এবং ক্ষতিকর; যে-সব দেশে ইহারা প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের পক্ষে ইহারা সর্ব্বদাই কম বেশী অসুবিধাজনক; এবং যে-সব দেশের ইহাদের শাসনাধীনে আসিবার দুর্ভাগ্য হয়, তাহাদের পক্ষে ইহারা ধ্বংসাত্মক।

"সার্ব্বভৌম শাসক হিসাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ হইতেছে তাহাদের আবিষ্কৃত ভারতীয় রাজ্যে প্রেরিত ইওরোপীয় পণ্যাদি সেখানেই যেন যত সম্ভব সস্তায় বিক্রী হইয়া যায়, এবং ভারত হইতে আনীত দ্রব্যাদি যেন যতদূর সম্ভব চড়া দরে বিক্রী হয়। কিন্তু ব্যবসায়ী হিসাবে তাহাদের লক্ষ্য হইতেছে ঠিক ইহার উল্টা। তাহাদের শাসিত দেশের যাহা স্বার্থ, শাসক হিসাবে তাহাদের স্বার্থও ঠিক তাহাই। ব্যবসায়ী হিসাবে তাহাদের স্বার্থ ঠিক তাহার উল্টা।

"যে-গভর্নমেণ্টের শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত প্রত্যেকটি লোক দেশ হইতে চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে, কাজে কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব সেই গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কাটান-ছিড়ান করিতে চাহে এবং নিজের সমস্ত ধনসম্পত্তি লইয়া দেশ ছাড়িবার দিনই, সারা দেশ ভূমিকম্পের কবলে পড়িলেও দেশের স্বার্থ

সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হইয়া উঠে— সে-গভর্নমেণ্ট তো অদ্ভুৎ এবং অসাধারণ বটেই।"*

"কোর্ট অব প্রোপ্রাইটরস অর্থাৎ মালিক সভায় একটা ভোট থাকিলে যে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা আশা করা যায়, কেবল তাহারই জন্য প্রায় খুব পয়সাওয়ালা এবং মাঝে মাঝে কম পয়সাওয়ালা লোকেরাও ভারতের শেয়ারের হাজার পাউণ্ড শেয়ার কিনিতে চাহে। ইহাতে সে ভারত হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ না পাইলেও ভারত লুণ্ঠনকারীদের নিয়োগে তাহার কতকটা হাত থাকে।......যদি কয়েক বৎসর এই প্রভাব থাকে এবং তাহার সাহায্যে কয়েকজন বন্ধুর সে কিছু একটা করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সে ডিভিডেণ্ড বা এমন কি যে-শেয়ারের জন্য তাহার ভোট তাহার দরদাম লইয়াও খুব কমই মাথা ঘামায়। ভোটের জোরে যে বিরাট সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় তাহার হাত রহিয়াছে, তাহার সমৃদ্ধির কথা লইয়া সে আদৌ ভাবে না। এই ধরনের একটা ব্যবসাদার কোম্পানীর বেশীর ভাগ মালিক অনিবার্য্য কারণ বশত তাহাদের প্রজাদের সুখ দুঃখ, তাহাদের রাজ্যের উন্নতি অবনতি, তাহাদের শাসনব্যবস্থার গৌরব অগৌরব সম্বন্ধে যতটা উদাসীন হইতে বাধ্য, ততটা উদাসীন অন্য কোনো শাসক কখনও ছিল না, হইতে পারেও না।"+

ইহাই হইল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক ভিত্তির বিরুদ্ধে নূতন অভ্যুত্থানশীল ব্যবসায়ীর কণ্ঠস্বর এবং পুরাতন ব্যবস্থার সহিত সংগ্রামে শিল্পপতি পুঁজিদারদের জয়ের পূর্ব্বাভাস।

১৭৮২-৮৩ সালে কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির বিবরণীর ভিতর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুরাতন ভিত্তির উপর এই আক্রমণ চলিয়াছে এবং উহা পরিবর্ত্তনের দাবী ধ্বনিত হইয়াছে। ১৭৮৩ সালে ফক্সের ইণ্ডিয়া বিল আসিল। এই বিলে কোর্ট অব ডাইরেকটরস এ্যাণ্ড প্রোপ্রাইটারস তুলিয়া দিয়া তাহার বদলে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত "কমিশনার্স্" রাখার কথা বলা হয়, কিন্তু কোম্পানীর বিরোধিতার ফলে এই বিল পাস হইতে পারে নাই। এই

* এডাম্ স্মিথ: 'ওয়েলথ অফ নেশনস,' ৪র্থ খণ্ড, ৭ম অধ্যায়
+ ঐ, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়

পরাজয়ের ফলে ফক্সের গভর্নমেণ্টের পতন হয়; এবং তাহার বদলে আসেন পিট। তাহার পর কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইঁহারই হাতে ক্ষমতা থাকে। এই সঙ্কটকালে দেখা গেল যে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে ভারতের প্রশ্নই সবচেয়ে বড় কথা। ১৭৮৪ সালে পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে দ্বৈতশাসন দিয়া ফক্সের প্রস্তাবের মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা করা হইলেও উহাও কিন্তু রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্বের নীতি প্রতিষ্ঠা করে। এই বিল হেস্টিংস ও কোম্পানীর বিরোধিতা সত্বেও পাস হয়। শাসনব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসকে গভর্নর-জেনারেল রূপে পাঠানো হইল। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ হইতে ১৭৮৫ সাল পর্য্যন্ত গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। ১৭৮৮ সালে তাঁহার বিরুদ্ধে অসাধুতা ও কুশাসনের অভিযোগ উঠিল। এই অভিযোগ আসলে একটা সরকারী আইন। পিটের সিদ্ধান্তের বলে ইহা বৈধ বলিয়া গৃহীত হয়। ফক্স, বার্ক, শেরিডানের ন্যায় বড় বড় রাজনীতিকরা ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে আক্রমণ ইহা যতটা না ছিল, তাহার চেয়ে বেশী ছিল একটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ।

ফরাসী বিপ্লব পিটের শাসনকালের সংস্কারমূলক যুগ শেষ করিয়া দেয় ও বিশ্বের প্রতিবিপ্লবের নেতা হিসাবে ইংলণ্ডের বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকাও উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়; এবং ফরাসী বিপ্লবের সর্ব্বজাগতিক প্রশ্নগুলির দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত এই আক্রমণের গতি ব্যাহত হয়। ভারতে অত্যাচার ও কুশাসন সম্পর্কে বার্কের তীব্র নিন্দাবাদ উদারনৈতিকদের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তিনিই আবার পরে ফ্রান্সে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরুদ্ধে তীব্রতর নিন্দাবাদ করিয়া ইওরোপের রাজাদের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ভারতের গভর্নরের কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস কাউন্সিলের ভিতরে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া গিয়াছিলেন; হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মামলার সময় তিনিই বার্ক এবং অন্যান্য সকলকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করেন। অথচ ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে বার্কের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা দেখিয়া তিনিই আবার অত্যন্ত ঘৃণাভরে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মামলাকে গদাইলস্করী চালে সাত বছর পর্য্যন্ত গড়াইয়া চলিতে দেওয়া হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৭৯৫ সালে হেস্টিংস বেকসুর খালাস পাইয়া গেলেন। পিট্ তাঁহার প্রথম দিককার অবাধ বাণিজ্যের মনোভাব হইতে ফরাসী যুদ্ধের সুদৃঢ় রক্ষামূলক ব্যবস্থার দিকে ঢলিয়া পড়িলেন। ১৮১৩ সালে ভারতের প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া তোলা হইল। ততদিনে ফরাসী যুদ্ধ শেষ

হইতে চলিয়াছে, শিল্পের পুঁজিও বেশ পাকাপোক্ত ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীদের শোষণ এবং অরাজকতাময় ব্যক্তিগত অসাধুতা দূর করিবার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর-জেনারেল হইয়া শাসনব্যবস্থার অদল বদল করেন। যথেচ্ছভাবে ক্রমাগত ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির যে-ব্যবস্থা ছিল তাহা দেশকে অরণ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছিল, শোষণের ভিত্তিকেও নষ্ট করিয়া দিতেছিল; কর্নওয়ালিস উহার বদলে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করিতে চাহিলেন; উহার ফলে বৃটিশ শাসনের সামজিক ভিত্তি হিসাবে একটা নূতন জমিদার শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্টকেও বাঁধাধরা হিসাব মতো একটা টাকা দেওয়া স্থির হইয়া গেল।

এই সব ব্যবস্থাই সংস্কার বলিয়া চালাইবার ইচ্ছা ছিল। আসলে কিন্তু সমগ্র পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থের খাতিরে ভারতকে আরও বৈজ্ঞানিক উপায়ে শোষণের পথ সাফ করিবার জন্য যে-সব ব্যবস্থা দরকার ছিল, এইগুলি তাহাই। এই সব সংস্কার শিল্পপুঁজির সাহায্যে শোষণের নূতন পর্য্যায়ে উপনীত হইবার পথই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বের বিশৃঙ্খল লুণ্ঠনের চেয়ে এই শোষণ ভারতের অর্থনীতির ঢের বেশী সর্ব্বনাশ সাধন করে।

৩। শিল্পের ধ্বংস

অবশেষে ১৮১৩ সালে শিল্পপতি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক স্বার্থের আক্রমণ সফল হইল এবং ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারও খতম হইয়া গেল। কাজেই শিল্পপুঁজির দ্বারা ভারত শোষণের নূতন পর্য্যায় ১৮১৩ সালেই আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

১৮১৩ সালের পূর্ব্বে ভারতের সহিত ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত কমই ছিল। *ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-রূপান্তর সাধিত হয় সিলি ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত "ইংলণ্ডের সম্প্রসারণ" নামক* বইয়ে তাহার কথা লিখিয়া গিয়াছেন:

> "এ্যাডাম স্মিথের গ্রন্থের সংস্করণে প্রদত্ত ভারত সম্পর্কিত টীকা টিপ্পনিতে ম্যাক্‌কুলক বলিয়াছেন যে, ১৮১১ সালে অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ের দিনে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য একেবারে অকিঞ্চিৎ-কর ছিল এবং উহা ইংলণ্ড ও জার্সি অথবা 'আইল অফ্ ম্যান'-এর মধ্যে বাণিজ্যের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।...

> "কিন্তু এখন ভারতের সহিত আমাদের বাণিজ্য জার্সি বা 'আইল্ অব্ ম্যান'-এর সঙ্গে তুলনা না করিয়া, আমরা যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্সের সঙ্গেই উহার তুলনা করিয়া থাকি।...ইংলণ্ড হইতে পণ্যদ্রব্যের আমদানীকারক হিসাবে ভারত ফ্রান্সকে এবং যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে।" *

তেমনি কোম্পানীর ১৮১২ সালের সরকারী রিপোর্টও পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছিল যে, সে-সময়ে প্রত্যক্ষ কর বা লুণ্ঠনের উৎস হিসাবেই ভারতের দাম ছিল, জিনিস-পত্রের বাজার হিসাবে নহে :

> "ভারতের লোকেরা আমাদের দেশে প্রস্তুত জিনিসপত্র ব্যবহার করার ফলে আমাদের ব্যবসায়ীরা যে-সব সুবিধা পাইয়া থাকে তাহা দিয়া আমাদের দেশের কাছে উহার গুরুত্বের পরিমাপ না করিয় এই বিরাট সাম্রাজ্য যেভাবে বছর বছর দেশের ঐশ্বর্য্য ও পুঁজি বাড়াইয়া দেয় তাহা দিয়াই বরং আমাদের দেশের কাছে উহার গুরুত্বের হিসাব করিতে হইবে।"†

নূতন করিয়া সনদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার উঠাইয়া দিবার পূর্ব্বে, ১৮১৩ সালে পার্লামেন্টের তদন্তের বিবরণীতে দেখা যায় যে তখন হইতে উন্নতিশীল বৃটিশ যন্ত্রশিল্পের বাজার হিসাবে ভারতকে ভালো করিয়া গড়িয়া তোলার নূতন উদ্দেশ্যের দিকেই সমস্ত চিন্তাধারা সতত পরিচালিত হইয়াছে। হেস্টিংসের ন্যায় যাঁহারা পুরাতন দিনের প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহাদের উত্তর হইতে দেখা যাইবে যে ভারতের বাজার হিসাবে গড়িয়া উঠার সম্ভাবনার কথাই তাঁহারা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

এই তদন্তের সময় ভারতের তৈয়ারী ছিট ইংলণ্ডে আমদানীর উপর শুল্ক ছিল শতকরা ৭৮ টাকা। এই রকম চড়া শুল্ক ছাড়া বৃটিশ তুলা শিল্প গোড়ার দিকে উন্নতি লাভ করিতে পারিত না।

> "(১৮১৩ সালে) সাক্ষ্যে বলা হয় যে, সে-সময় পর্য্যন্ত ভারতে প্রস্তুত তুলাজাত দ্রব্য এবং সিল্ক ইংলণ্ডে প্রস্তুত তুলাজাত দ্রব্যাদি এবং সিল্কের চেয়ে শতকরা

* জে. আর. সিলি : "ইংলণ্ডের সম্প্রসারণ," ১৮৩৩, পৃঃ ২৯৯

† ১৮১২ সালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রিপোর্ট, 'সাম আস্পেক্টস্ অব ইণ্ডিয়াজ ফরেইন ট্রেড,' পৃঃ ৪৯

৫০-৬০ ভাগ কম দরে বৃটিশ বাজারে বেচিলেও তাহাতে লাভ থাকিত। তাহার ফলে শেষোক্ত শিল্পকে রক্ষা করার জন্য হয় শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ হারে শুল্ক বসানো, না-হয় একেবারে উহার আমদানী বন্ধ করা প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তাহা না হইলে, আমদানী বন্ধের জন্য চড়া শুল্ক এবং বিধিনিষেধ প্রয়োগ না করিলে, পেইস্‌লে ও ম্যাঞ্চেস্টারের মিলগুলি শুরুতেই বন্ধ হইয়া যাইত; এবং এমন কি বাষ্পশক্তির সাহায্যেও তাহাদের আবার চালু করা যাইত না। ভারতে প্রস্তুত জিনিসপত্র বলি দিয়া এইগুলি সৃষ্টি করা হয়।"*

বৃটেনের বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য ভারতীয় দ্রব্যের উপর চড়া শুল্ক বসাইবার নীতি কার্য্যে পরিণত হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে। ১৮৪০ সালের পার্লামেণ্টের তদন্তে বলা হয় যে ভারতে আমদানী বৃটেনের তুলা ও সিল্কজাত দ্রব্যের উপর শুল্কের হার ছিল শতকরা ৩½ ভাগ এবং পশমের জিনিসের উপর ছিল শতকরা দুই ভাগ, অথচ বৃটেনে আমদানী ভারতের তুলাজাত দ্রব্যের উপর শুল্কের হার ছিল শতকরা ১০ ভাগ, সিল্কের উপর ছিল শতকরা ২০ ভাগ এবং পশমের জিনিসের উপর ছিল শতকরা ৩০ ভাগ।

কাজেই কেবল যন্ত্রশিল্পের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের জন্যই নহে, প্রত্যক্ষ সরকারী সাহায্যে এক পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য অবাধ বাণিজ্যের দ্বারাই ভারতের বাজারে বৃটিশের পণ্যদ্রব্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ভারতের শিল্পগুলি নষ্ট হইয়া যায়। (ভারতে বৃটিশ পণ্য বিনা শুল্কে বা কার্য্যত বিনা শুল্কে আমদানী, অথচ বৃটেন ভারতীয় দ্রব্য পাঠাইবার বেলা শুল্কের বাধা সৃষ্টি এবং 'ন্যাভিগেশন' আইনের সাহায্যে ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য বন্ধ করা—এইগুলি প্রত্যক্ষ সরকারী সাহায্যের মধ্যে পড়ে।)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই নীতি একেবারে মোক্ষমভাবে কাজে পরিণত করা হয়। কিন্তু সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া, এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও, ইহার ফল ফলিতে দেখা যায়।

১৮১৪-৩৫ সালের মধ্যে ভারতে বৃটেনের তুলাজাত দ্রব্যাদি রফ্‌তানীর পরিমাণ বাৎসরিক দশ লক্ষ গজেরও কম হইতে ৫১০ লক্ষ গজেরও উপরে গিয়া উঠে। ঠিক এই সময়ের মধ্যেই কিন্তু বৃটেনে আমদানী ভারতীয় বস্ত্রাদির

* এইচ. এইচ. উইলসন: "বৃটিশ ভারতের ইতিহাস," প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫

পরিমাণ ১২½ লক্ষ টুক্‌রা হইতে কমিয়া তিন লক্ষ ছয় হাজার টুক্‌রায় গিয়া নামে। ১৮৪৪ সালে উহা আরও কমিয়া গিয়া দাঁড়ায় ৬৩ হাজার টুকরায়।

দরদামের দিক দিয়াও এই প্রভেদটা কিছু কম আশ্চর্য্যজনক নহে। ১৮১৫ সাল হইতে ১৮৩২ সালের মধ্যে ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যাদির রফ্‌তানী ১৩ লক্ষ পাউণ্ড হইতে নামিয়া এক লক্ষ পাউণ্ডেরও কম হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ সতেরো বৎসরের মধ্যে তেরো ভাগের বারো ভাগ ব্যবসায়ই কমিয়া যায়। ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই ভারতে আমদানী বৃটেনের তুলাজাত দ্রব্যের মূল্য ২৬ হাজার পাউণ্ড হইতে ৪ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া ঠেকে; অর্থাৎ মূল্যের পরিমাণ বাড়ে ১৬ গুণ। যে-ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সারা জগতে তুলাজাত দ্রব্য রফ্‌তানী করিয়া আসিতেছিল, সেই দেশই কিন্তু ১৮৫০ সালের মধ্যে বৃটেনের সমস্ত রফ্‌তানী তুলাজাত দ্রব্যাদির চার ভাগের এক ভাগ আমদানী করিতে আরম্ভ করিল।

ইংলণ্ড হইতে আমদানী মেশিনে তৈয়ারী তুলাজাত জিনিসপত্র যেমন তন্তুবায়দের ধ্বংস করিয়া দিল, মেশিনে তৈয়ারী সূতাও তেমনি জোলাদের জীবিকা নষ্ট করিল। ১৮১৮ সাল হইতে ১৮৩৬ সালের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ভারতে সূতা রফ্‌তানী ৫২০০ গুণ বাড়িয়া যায়।

সিল্ক এবং পশমজাত দ্রব্য, লৌহ, মৃৎশিল্প, কাঁচ এবং কাগজের বেলাতেও এই একই ব্যাপার দেখা যাইবে।

এই ভাবে ভারতের সমস্ত শিল্প আগাগোড়া ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর তাহার ফল কী দাঁড়াইল—সেকথা কল্পনা করিয়া লওয়া যায়। ইংলণ্ডে পুরাতন ধরনের তাঁত নষ্ট হইবার পরে নূতন যন্ত্রশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতে লক্ষ লক্ষ শিল্পী এবং কারিগর ধ্বংস হইয়া গেল। অথচ সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধরনের কোনো শিল্পও গড়িয়া উঠিল না; ঢাকা, মুর্শিদাবাদ (ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে এই শহরকে "লণ্ডনের ন্যায় বৃহৎ, জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন), সুরাটের ন্যায় প্রাচীন জনবহুল শহরগুলি বৃটিশ শাসনের কৃপায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই যেমন নিখুঁত ভাবে নষ্ট হইয়া গেল তেমনটি কোনো বড় যুদ্ধ বা বিদেশী অভিযানেও হইতে পারিত না। স্যার চার্ল্‌স্ ট্রেভেলিয়ান ১৮৪০ সালে পার্লামেণ্টের তদন্তের সময় বলেন: "ঢাকা নগরীর জনসংখ্যা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইতে কমিয়া ৩০ অথবা ৪০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে; ম্যালেরিয়া এবং নগরটি তাড়াতাড়ি জঙ্গলে

ছাইয়া যাইতেছে।...ঢাকা ছিল ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার। সেই ঢাকাই কিন্তু এক সমৃদ্ধিশালী নগরী হইতে এক অতি দরিদ্র ও জীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সত্য সত্যই এখানকার দুঃখকষ্টেরও অবধি নাই।" বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক প্রাচীন ঐতিহাসিক মণ্টগোমেরী মার্টিন এই তদন্তের সময় বলেন: "সুরাট, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং দেশী শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্রগুলির পতন এবং ধ্বংস এমনই ক্লেশদায়ক ব্যাপার যে উহা লইয়া আলোচনাও করা যায় না। সাধু উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে যে এমনটি হইয়াছে, তাহা আমার মনে হয় না। আমি মনে করি যে দুর্ব্বলের উপর সবলের শক্তি প্রয়োগের ফলেই ইহা ঘটিয়াছে।" স্যার হেনরি কটন ১৮৯০ সালে লেখেন: "একশ' বছরেরও কম সময় আগে ঢাকার বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা, আর ইহার লোকসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। ১৭৮৭ সালে ৩০ লক্ষ টাকার ঢাকাই মসলিন ইংলণ্ডে রফ্তানী হয়; ১৮১৭ সালের মধ্যে কিন্তু রফতানী একেবারে বন্ধ হয়া যায়। সুতা কাটা ও তাঁত বোনা বহু যুগ ধরিয়া অসংখ্য লোকের অন্ন জোগাইয়া আসিতেছিল; তাহা এখন একেবারে উঠিয়া গেল। বহু সমৃদ্ধিসম্পন্ন পরিবার বাধ্য হইয়া শহর ছাড়িয়া উদরান্নের জন্য গ্রামে চলিয়া গেল।... শুধু ঢাকাতেই নহে, সব জেলাতেই এই অধঃপতন। দেশের সর্ব্বত্র উৎপাদক শ্রেণীরা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে; এমন বছরই যায় না যখন কমিশনাররা বা জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা এই ধরনের ব্যাপার গভর্নমেণ্টের গোচরীভূত না করেন।"

১৯১১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে দেখা গিয়াছিল যে, ব্যাপারটা তখনও এইভাবেই চলিতেছে। ১৯১১ সালের রিপোর্টে বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে লেখা ছিল যে, গত দশ বছরের মধ্যে ভারতে কাপড় তৈয়ারীর কাজ বাড়িলেও ঐ সময়ের ভিতর বস্ত্রশিল্পের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ছয় জন করিয়া কমিয়া গিয়াছে। "হাতে সুতা কাটা প্রায় একেবারে বন্ধ" হওয়া এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ বলিয়া দেখানো হইয়াছে।

১৯১১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে আরও দেখা যায়, চামড়া এবং ধাতুর ব্যবসায়ে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ছয়জন কমিয়াছে। অথচ ধাতুর ব্যবসায়ীর সংখ্যা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছয়গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এখানেও কারণটা স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইয়াছে:

"দেশী তামা পিতলের বাসনপত্রের বদলে ইওরোপ হইতে আমদানী এনামেল ও এলুমিনিয়মের বাসনপত্রের প্রচলনের ফলেই প্রধানত ধাতুশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়াছে ও ধাতুর জিনিসপত্রের ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে।"*

লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পের ভিতরও ঐ একই ছবি দেখা যায়:

"দেশে লৌহ গলাইয়া পরিষ্কার করিবার যে-শিল্প ছিল, রেল লাইনের নাগালের কাছাকাছি জায়গায় বিদেশ হইতে আমদানী সস্তা লৌহ ও ইস্পাত তাহাকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে; তবে দেশের অপেক্ষাকৃত দূর অঞ্চলে ইহা এখনও টিঁকিয়া আছে।"†

"ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য, সাজসজ্জার কাজে এবং যন্ত্রপাতির জন্য লৌহ ব্যবহৃত হইত, এবং খুব উঁচু দরের জিনিসই এখানে প্রস্তুত হইত। পুরাতন দেশী অস্ত্রশস্ত্রের জুড়ী ছিল না। বলা হইয়া থাকে যে, প্রসিদ্ধ দামাস্কস তরবারী ভারতের হায়দরাবাদ হইতে আমদানী করা ইস্পাতেই তৈয়ার হইত। দিল্লীর প্রসিদ্ধ কুতুবমিনারের ওজন হইল ছয় টনেরও অধিক; ৪১৫ খৃষ্টাব্দে লেখা এক স্তম্ভলিপি ইহাতে উৎকীর্ণ আছে। সে-সময়ে এতবড় একটা জিনিস পোড়াইয়া পিটাইয়া কি করিয়া তৈয়ারী হইল, তাহা আজও কেহ বুঝিতে পারে না। ভারতের সর্ব্বত্র হাপরের যে-সব ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়, তাহা প্রাক-আধুনিক যুগের ইওরোপেব হাপরের ভগ্নাবশেষের সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যায়। ...

"লৌহ গলাইবার ব্যবসা ছিল আগারিয়াদের। তাহারা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ছিল। যে-সব স্থানে লৌহ উৎপন্ন হয়, তাহাদের অনেকেরই নাম দেওয়া হইয়াছিল লোহারা। কিন্তু সস্তা ইওরোপীয় লৌহের প্রচলন হওয়াতে আগারিয়াদের সব কাজকর্ম্মই চলিয়া গিয়াছে এবং ইহাদের প্রায় বেশীর ভাগই এখন অদক্ষ শ্রমিকে পরিণত হইয়াছে। প্রায় এক শত পঁচিশ বছর আগে ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানন ইহাদের অনেককে দেখিয়াছিলেন।"‡

---

* ভারতের আদমশুমারির রিপোর্ট—১৯১১

† ইম্পীরিয়াল গেজেটিয়ার অব্ ইণ্ডিয়া, ১৯০৭, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫

‡ ডি. এইচ. বুকানন: "ভারতে পুঁজিবাদী ব্যবসায়ের বিকাশ", ১৯৩৪, পৃঃ ২৭৪

শুধু যে প্রাচীন উৎপাদনকেন্দ্র এবং শহরগুলিই ধ্বংস হইয়া গেল তাহা নহে, তাহাদের অধিবাসীরাও গ্রামে গিয়া ভিড় বাড়াইয়া তুলিল; এবং সকলের উপর মারাত্মক আঘাত পড়িল কৃষি এবং পারিবারিক শিল্পের সংমিশ্রণে গড়া প্রাচীন গ্রাম্য অর্থনীতির উপর। রুজি রোজগার যাওয়ার ফলে শহরের এবং গ্রামের লক্ষ লক্ষ শিল্পী, কারিগর, বয়নবিদ, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, লৌহশিল্পীর পক্ষে কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রে ভিড় কমানো ছাড়া আর কোনো উপায় রহিল না। এইভাবে ভারতবর্ষ কৃষি এবং উৎপাদন-শিল্পের দেশ হইতে ক্রমে উৎপাদনকারী বৃটিশ পুঁজিপতিদের কৃষিনির্ভর উপনিবেশে রূপান্তরিত হইল। বৃটিশ শাসনের এই যুগ হইতে এবং বৃটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ভারতের কৃষির উপর মারাত্মক চাপ পড়িয়াছে। সরকারী কাগজপত্রে এখনও ইহা বেশ মোলায়েম ভাবেই বর্ণনা করা হইয়া থাকে—যেন উহা একটা স্বাভাবিক লক্ষণ বই আর কিছু নয়। পল্লবগ্রাহী এবং মূর্খের দল এখনও ইহাকে লোকবাহুল্যের লক্ষণ বলিয়া চালাইয়া দেয়। বস্তুত বৃটিশ আমলেই কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল উনবিংশ শতাব্দীতেই যে উহা ক্রমাগত বাড়িয়াছে তাহা নহে, বিংশ শতাব্দীতেও বাড়িয়াছে। আদমশুমারির হিসাব-পত্র দেখিলেই একথা প্রমাণ হইয়া যাইবে। (কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত ১৮৯১ সাল হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে শতকরা ৬১ ভাগ হইতে শতকরা ৭৩ ভাগে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব হিসাবপত্র সপ্তম পরিচ্ছেদে আরও ভালো করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে।)

১৮৪০ সালেই পূর্ব্বোল্লিখিত পার্লামেণ্টারি তদন্তের সমক্ষে মণ্টগোমেরি মার্টিন ভারতকে "ইংলণ্ডের খামারে পরিণত করার" সম্বন্ধে এবং ভারতের ভয়াবহ রূপান্তরের সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন :

> "ভারত যে কৃষিপ্রধান দেশ এ মতে আমি সায় দিই না। ভারত যতটা কৃষির উপর নির্ভরশীল, ঠিক ততটাই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। যে তাহাকে একেবারে কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশে পরিণত করিতে চাহে, সে এই দেশকে উন্নতির সোপানশ্রেণী হইতে নীচের দিকে নামাইয়া দিতে চাহে। আমি মনে করি না যে, ভারতকে ইংলণ্ডের গোলাবাড়ীতে পরিণত হইতে হইবে। ভারত শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহার বহু প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য বহু যুগ ধরিয়া রহিয়াছে, এবং ন্যায্য ভাবে প্রতি-যোগিতা করিতে গিয়া অন্য কোনো দেশের জিনিস তাহাদের সঙ্গে পারিয়া

উঠে নাই ... এখন ভারতকে কৃষির উপর নির্ভরশীল করার অর্থ হইল তাহার উপর অবিচার করা।"

একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার পাওয়ার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ব্যবসায়ের চেয়ে রাজস্বের দিকেই ঝুঁকিবে তাহা স্বাভাবিক। ভারতে যে 'বাণিজ্যবিপ্লব' সংসাধিত হইতেছিল, ১৮২৯ সালে কোম্পানী তাহার এক বিষাদপূর্ণ চিত্র তুলিয়া ধরে। গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেণ্ডিস-বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৩০শে মে তারিখে তাঁহাব মন্তব্যে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স্-দের যে মতামত লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতেই ইহা পাওয়া যাইবে:

"যে বাণিজ্যবিপ্লব ভারতের অগণিত শ্রেণীর ভিতর বর্ত্তমান এই যে দুর্দ্দশা সৃষ্টি করিয়াছে বাণিজ্যের ইতিহাসে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। বোর্ড অব্ ট্রেডের রিপোর্টে প্রদত্ত সেই বিপ্লবের বিষাদপূর্ণ চিত্র কোর্টের গভীর সহানুভূতি উদ্রেক করিয়াছে।"

কিন্তু উৎপাদনকারীরা তাহাদের স্বার্থ লইয়া আগাইয়া যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ১৮৪০ সালে পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে তদন্তের সমক্ষে ম্যাক্‌ক্লেস্‌ফিল্ড-এর শিল্পপতি মিঃ কোপ বলেন: "ভারতীয় শ্রমিককে দেখিয়া সত্যই আমার দয়া হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবারের চেয়ে আমার নিজের পরিবার সম্পর্কে আমি আরও সংবেদনশীল. ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা আমার অবস্থার চেয়ে খারাপ; কাজেই তাহার জন্য আমার নিজের পরিবারের আরাম বিসর্জ্জন দেওয়া অন্যায় বলিয়াই আমি মনে করি।"

ভারত সম্পর্কে শিল্পাশ্রয়ী পুঁজিপতিদের নীতি বেশ স্পষ্টভাবেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে নীতি হইল: ভারতকে বৃটিশ পুঁজিবাদের কৃষি-উপনিবেশে পরিণত করা; সে-উপনিবেশ কাঁচা মাল জোগান দিবে আর বিদেশের তৈয়ারী জিনিস খরিদ করিবে। ১৮৪০ সালে পার্লামেণ্টের তদন্তের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি টমাস বেজলি স্পষ্টভাবে বলেন যে, ইহাই হইল তাঁহাদের উদ্দেশ্য:

"ভারতের মতো বিরাট দেশ পড়িয়া রহিয়াছে; আর এখানকার অধিবাসীরা প্রচুর বৃটিশ পণ্য ব্যবহার করিবে। ভারতীয়দের সহিত আমাদের ব্যবসায়ের পুরা প্রশ্নটা হইল এই যে, আমাদের দেশে তৈয়ারী যে-সব জিনিস আমরা তাহাদের দেশে পাঠাইতে প্রস্তুত আছি, তাহারা তাহাদের দেশের মাটিতে উৎপন্ন জিনিসপত্র দিয়া তাহার দাম শোধ করিতে সমর্থ কিনা।"

ক্লাইভ্ প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারত শোষণের এক পর্য্যায়ে যেমন স্পষ্টভাবে হিসাবপত্র করিয়াছিলেন, ভারত শোষণের নূতন পর্য্যায়ের এই হিসাব ঠিক তেমনই তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট।

ভারতের বাজার বাড়াইতে গেলে ভারতে কাঁচা মালের উৎপাদন এবং রফ্‌তানীও বাড়ানো দরকার ছিল। বৃটিশের নীতি এখন এই দিকে পরিচালিত হইল।

> "শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলণ্ডের কাছে ভারতের প্রয়োজনীয়তা ছিল এই যে, ভারত ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের জন্য অত্যাবশ্যক কাঁচা মালের মধ্যে কতকগুলি —যথা, চামড়া, তৈল, রং, পাট এবং তুলা সরবরাহ করিত; সঙ্গে সঙ্গে আবার ভারতে ইংলণ্ডে প্রস্তুত লৌহ এবং তুলাজাত দ্রব্যের বাজারও ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছিল।"*

১৮৩৩ সালে স্থির হয় যে, ইংরাজদের ভারতে জমি জায়গা কিনিতে দেওয়া হইবে, এবং তাহারা এখানে ক্ষেতখামার গড়িয়া তুলিতে পারিবে। নীতির একটা নূতন পর্য্যায়ের ইঙ্গিত এই সিদ্ধান্তের ভিতর পাওয়া যাইতেছে। ঠিক সেই বছরই পশ্চিম-ভারতীয় দীপপুঞ্জে দাস-প্রথা উঠিয়া যায়। এই নূতন চাষের ব্যবস্থা দাস-প্রথার এক নূতন রূপ বই আর কিছুই নহে। উহা ভারতে সঙ্গে সঙ্গে জাঁকিয়া উঠিল। আদি প্ল্যাণ্টারদের অনেকেই যে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসের মালিক ছিল সে কথাটাও লক্ষ্য করিবার মতো। (পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে অভিজ্ঞ প্ল্যাণ্টারদের আনা হয়। ... উগ্র অভদ্র ধরণের প্ল্যাণ্টাররাই এই অঞ্চলে আকৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিল 'আমেরিকায়' দাসপ্রভু, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুরাতন দাস-পীড়নের বদ অভ্যাসগুলিও লইয়া আসিয়াছিল। বুকানন: "ডেভলপমেণ্ট অব্ ক্যাপিটালিস্ট এণ্টারপ্রাইজ ইন ইণ্ডিয়া" পৃঃ ৩৬-৩৭) ইহার ফলে যে বিভীষিকা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ১৮৬০ সালের নীল কমিশনের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়। আজ দশ লক্ষেরও বেশী শ্রমিক অর্থাৎ কাপড়, কয়লাখনি, ইঞ্জিনিয়ারিং, লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকেরও বেশী শ্রমিক—চা, কফি এবং রবার চাষে নিযুক্ত রহিয়াছে।

---

* এল. সি. এ. নোল্‌স্: "ইকনমিক ডেভলপমেণ্ট অব দি ওভারসীজ এম্পায়ার" ৩০৫ পৃঃ।

বিশেষ করিয়া ১৮৩৩ সালের পরে কাঁচামালের রফ্‌তানী খুব বাড়িয়া যায়। ১৮১৩ সালে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের কাঁচা তুলা রফ্‌তানী হইয়াছিল। ১৮৩৩ সালে উহা বাড়িয়া হয় ৩২০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৮৪৪ সালে ৮৮০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৮৩৩ সালে ৩৭০০ পাউণ্ড ওজনের ভেড়ার লোমে তৈয়ারী পশম রফ্‌তানী হয়। ১৮৪৪ সালে হয় ২৭ লক্ষ পাউণ্ড। ১৮৩৩ সালে ২১০০ বুশেল তিসি রফ্‌তানী হয়। ১৮৪৪ সালে হয় ২ লক্ষ ৩৭ হাজার বুশেল। (পোর্টার : "প্রোগ্রেস অব্ দি নেশন", ১৮৪৭, পৃঃ ৭৫০)।

১৮৩৯ সাল হইতে ১৯১৪ সালের মধ্যে টাকার দিক দিয়া কাঁচা তুলা রফতানী ১৭ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ২২০ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া উঠিয়াছে। এখন ওজনের দিক দিয়া বিচার করা যাক। ১৮৩৩ সালে ৩২০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের কাঁচা তুলা রফ্‌তানী হয়। ১৯১৪ সালে হয় ৯৬৩০ লক্ষ পাউণ্ড। এখানে রফ্‌তানী ত্রিশ গুণ বাড়িয়াছে। ১৮৪৯ সালে ৬৮ হাজার পাউণ্ড মূল্যের পাট রফ্‌তানী হয়। ১৯১৪ সালে হয় ৮৬ লক্ষ পাউণ্ড। দেখা গেল পাটের বেলায় রফ্‌তানী বাড়িয়াছে ১২৬ গুণ।

উপবাসী ভারত হইতে খাদ্যশস্যের রফ্‌তানী বৃদ্ধিটা আরও তাৎপর্য্যপূর্ণ। খাদ্যশস্য—প্রধানত চাউল ও গম ১৮৪৯ সালে রফ্‌তানী হয় ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার পাউণ্ড। ১৮৫৮ সালে উহা ৩৮ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া উঠে। ১৮৭৭ সালে গিয়া দাঁড়ায় ৭৯ লক্ষ পাউণ্ডে। ১৯০১ সালে হয় ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯১৪ সালের মধ্যে গিয়া উঠে ১৯৩ লক্ষ পাউণ্ডে। এখানে রফ্‌তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে ২২ গুণ।

ইহারই সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা এবং তীব্রতাও অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সাত বার দুর্ভিক্ষ হয় এবং হিসাব মতো ১৫ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে চব্বিশ বার দুর্ভিক্ষ হয় (১৮৫১ হইতে ১৮৭৫ সালের ভিতর ৬ বার, ১৮৭৬ হইতে ১৯০০ সালের ভিতর ১৮ বার), সরকারী নথিপত্রের হিসাব মতো ইহাতে লোক মারা যায় মোট দুই কোটি। "মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে একশত বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় দুর্ভিক্ষ এবং অভাবের সংখ্যা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় চার গুণ।" (উইলিয়ম ডিগবি— "প্রসপেরাস বৃটিশ ইণ্ডিয়া," ১৯০১) ডব্লিউ. এস, লিলে তাঁহার "ইণ্ডিয়া

এ্যাণ্ড ইট্‌স্‌ প্রোব্লেম্‌স্‌" নামক বইতে সরকারী হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন :

বছর	দুর্ভিক্ষে মৃত
১৮০০—২৫	১,০০০,০০০
১৮২৫—৫০	৪০০,০০০
১৮৫০—৭৫	৫,০০০,০০০
১৮৭৫—১৯০০	১৫০০০,০০০

ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষের সমস্যা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য ১৮৭৮ সালে এক দুর্ভিক্ষ-কমিশন নিযুক্ত হয়। ইহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে। রিপোর্টে বলা হয়, "ভারতে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ ফলাফলের একটি প্রধান কারণ এবং কার্য্যকরীরূপে সাহায্য দিবার পথে সবচেয়ে বড় বাধাগুলির মধ্যে একটি প্রধান বাধা এই যে, ভারতের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে; এবং জনসাধারণের কোনো একটা বড় অংশকে পোষণ করিবার মতো অন্য কোন একটা শিল্পও এখানে নাই।"

> "ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য এবং খাদ্যদ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতার সময় তাহাদের যে-সব ঝুঁকি মাথায় লইতে হয় সে সবের মূলে রহিয়াছে এক শোচনীয় অবস্থা। সে-অবস্থা হইতেছে এই যে, কৃষিই হইল ভারতের অধিক সংখ্যক লোকের একমাত্র জীবিকা। বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রতিকার ব্যবস্থার ভিতর যদি বিভিন্ন বৃত্তি ও জীবিকার স্থান না থাকে, তাহা হইলে সেই প্রতিকার ব্যবস্থা কখনও পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। নূতন বৃত্তির মারফৎ বাড়তি লোকদের কৃষি হইতে অন্যদিকে সরাইয়া আনা যাইতে পারে এবং হয় শিল্প না-হয় অন্য কোনো কাজ কর্ম্মের ভিতর জীবিকা খুঁজিয়া লওয়ার পথে তাহাদের পরিচালিত করা যাইতে পারে।"*

এই কথাগুলির মধ্যেই ভারতে শিল্প-পুঁজির কীর্তি-কলাপ চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

*ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট, ১৮৮০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভারতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ

'শাসন যেখানে শোষণও সেখানে'—১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের উক্তি

১৯১৪—১৮ সালের যুদ্ধের পর হইতে ভারতে সাম্রাজ্যতন্ত্র যে নূতন পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার সহিত পুরাতন যুগের যে খুব কমই মিল আছে ইহা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরাতন স্বৈরশাসন ১৯১৭ সালের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। এই ঘোষণা নূতন যে লক্ষ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহা হইল "সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গ হিসাবে ক্রমে ক্রমে ভারতে এক দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা," এবং ইহার পরের ইতিহাস—পর পর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের এবং মন্ত্রি-মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই জুন তারিখের ঘোষণার দ্বারা সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার ইতিহাস বলিয়াই দেখা যাইবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতে শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সেই পুরাতন অবাধ বাণিজ্য নীতির বৈরিতার পরিবর্ত্তে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে করা হয় ও বৃটিশ শাসনের সযত্ন তদারকে এবং বৃটিশ পুঁজির সহায়তায় সেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ভারতকে এক নূতন শিল্পসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করিতেছে বলিয়া ধরা হয়।

১৯১৮ সালের পরের যুগের সমস্ত তথ্যাদি আরও একটু তলাইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাহা দিয়া এক প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদের পতনের দিনের এই চিত্র সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে না।

পুরাতন অবাধ বাণিজ্যগত শিল্প পুঁজির শোষণ হইতে ভারতে একটা রূপান্তর নিঃসন্দেহে আসিয়াছে বটে, কিন্তু ১৯১৪ সালের যুদ্ধই নূতন ও পুরাতনের ভিতরকার ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া প্রথম প্রথম যতই মনে হোক না কেন, বাস্তবিক ঐ সময়েই আসল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পনেরো বছরের মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই যে-পরিবর্ত্তন রূপ গ্রহণ করিতেছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাহার সুদূরপ্রসারী ফলাফল লইয়া তাহারই মধ্যে আসিয়া পড়িল। অবাধ বাণিজ্যের শিল্প-পুঁজির পর্য্যায় হইতে ব্যাঙ্ক-পুঁজি ও তাহার দ্বারা ভারত শাসনের যুগে উত্তীর্ণ হওয়ার ভিতরই এই পরিবর্ত্তন নিহিত রহিয়াছে। এই অবস্থান্তরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছিল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের ফলে এই ক্রমবিকাশের অগ্রগতির বেগ বৃদ্ধি পায়; পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কট দেখা দেয় এবং ভারতবর্ষে উপর্য্যুপরি কতকগুলি অভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক গণসংগ্রাম শুরু হয়। এই দ্বৈত বিকাশের ভিতর দিয়াই ভারতে আধুনিক যুগের বিশিষ্ট প্রকৃতি রূপ পাইয়াছে। এই যুগে ব্যাঙ্ক-পুঁজির শাসনের সকল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে; পূর্ব্বেকার যুগে এইগুলি অংশত এবং অসম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার এই যুগে উপর্য্যুপরি গণসংগ্রামের তরঙ্গাঘাতে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের ভিৎ টলিয়া গিয়াছে। এই দুই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিই আজিকার ভারতকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কিছু নূতন আবিষ্কার নহে। ১৮৬১ সালে কাউন্সিল এ্যাক্ট (ই. এ. হর্নের "পলিটিক্যাল সিস্টেম অব্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া" একখানা প্রামাণিক বই। এই বইয়ে কাউন্সিল এ্যাক্ট "বৃটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রথম বীজ বপন করিয়াছিল"—বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।) ১৮৬৫ এবং ১৮৮২ সালে মিউনিসিপ্যাল এবং ডিষ্ট্রিক বোর্ডগুলির উন্নতি, ১৮৯২ সালে কাউন্সিল এ্যাক্ট এবং ১৯০৯ সালের মর্লে-মিণ্টো সংস্কার—এই ভাবে বিভিন্ন সংস্কার ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ১৯১৭ সালকে সাধারণত আধুনিক পর্য্যায় আরম্ভের সাল তারিখ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। আসলে কিন্তু ১৯১৪ সালের ঠিক পূর্ব্বে মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই উহা আরম্ভ হইয়াছিল। মর্লে-মিণ্টো সংস্কার, আসল সব ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদেরই হাতে রাখিয়া বলপ্রয়োগের পাশাপাশি উদারনৈতিক সংস্কার ও সুবিধা দেওয়া আরম্ভ করিয়া দেয়। এই সব সংস্কার লইয়া খুব ঢাক পেটাপেটি চলিয়াছে। নিজের অগ্রগতি দেখাইবার জন্য মণ্টেগু-চেমসফোর্ড

রিপোর্ট মর্লে-মিন্টো সংস্কারকে ছোট এবং তুচ্ছ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিল বটে ("সেই সময়ে উৎসাহের আতিশয্যে তাহাদের জন্য অতিরিক্ত দাবী করা হইয়াছিল"); কিন্তু উত্তরকালে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাও ইহার দ্বৈত শাসনব্যবস্থাকে কম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন নাই। পূর্ব্বের পরিকল্পনাগুলি যে স্বায়ত্তশাসন দেয় নাই, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সমালোচনা পরবর্ত্তী পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ১৯১৮ সালের পরের যুগকে কর্ত্তৃত্বের মুঠি শিথিল করিয়া দেওয়ার এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের যুগ বলিয়া বৃটিশ জনসাধারণের কাছে চিত্রিত করা হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতের জনসাধারণের কাছে ছবিটা ঠিক ইহার উল্টা। সুবিধা এই যুগে দেওয়া হইয়া থাকিলেও তাহারই পাশাপাশি ছিল সযত্ন সম্পাদিত ব্যাপক দমননীতি, হিংসাবৃত্তি ও গুলিচালনা এবং গুরুতর বাধানিষেধাত্মক আইন প্রবর্ত্তন। এ সময়ে যে হারে লোককে জেলে পোরা হয়, তাহাও আর পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই।

তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নূতন পর্য্যায়ের প্রাথমিক লক্ষণগুলি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার বছরগুলির মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন নূতন "বাণিজ্য দফতর" প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ১৯০৭ সালে প্রথম শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। ১৯১৪ সালের পরের কুড়ি বৎসরের চেয়ে ১৯১৪ সালের পূর্ব্বের কুড়ি বৎসরের ভিতরই ভারতীয় কাপড়ের কলের বেশী উন্নতি হইয়াছিল। ইহা শুধু আপেক্ষিক সত্য নহে, নির্ব্বিশেষ সত্য কথা। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নীতি পরিবর্ত্তনের ঘোষণা ইহার পূর্ব্বের চেয়ে পরেই বেশী দেখা দিয়াছে; নূতন শুল্ক নীতিও ১৯১৮ সালের পরের যুগের। কিন্তু এ কথা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে, প্রয়োজন এবং সম্ভাবনার তুলনায় ফল অত্যন্ত কমই হইয়াছে; এবং উৎপাদনমূলক বিকাশের গতি প্রতিহত করিবার জন্য বিরোধিতা পূর্ব্বের মতই চলিয়াছে; নূতন নূতন রূপে তাহার তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নূতন স্তরে ভারতীয় জনসাধারণ উপনীত হওয়ার ফলে যে রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহাই আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন। সাম্রজ্যবাদের বিরোধিতা করিয়াই ভারতের জনসাধারণ এই ভাবে অগ্রসর হইয়াছে।

আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মূলে কোন শক্তির খেলা তাহা

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চাবিকাঠি আছে শিল্পপুঁজির যুগ হইতে ব্যাঙ্ক-পুঁজির যুগে উত্তীর্ণ হওয়ার ভিতর। এই যুগকে বুঝিতে গেলে সবার আগে ইহার রীতি ও ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

১। ব্যাঙ্ক-পুঁজির যুগে সংক্রমণ

শিল্প-পুঁজির দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত শোষণের বিশিষ্ট রূপগুলি হইতে পূর্ব্বেকার যুগের প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন চালানোর নীতিকে বাদ দেওয়া চলে না। এই প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন এই সময়েও চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপান্তরও ঘটে।

সরকারী মুখপাত্ররা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যাহাকে খোলাখুলি ভাবে "কর" বলিয়া অভিহিত করিতেন তাহা বলিতে বোঝায় "হোম চার্জের" দাবীর অজুহাতে এবং বেসরকারীভাবে বছর সালিয়ানা লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ঐশ্বর্য্য বিলাতে চালান দেওয়া। ইহার বদলে এক ইংলণ্ড হইতে আনীত সামান্য পরিমাণ সরকারী মালপত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাইত না। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া এই করের পরিমাণ ব্যবসায় বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত গতিতে বাড়িয়া উঠে। বিংশ শতাব্দীতে ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত কমিয়া গেলেও করের বোঝা কিন্তু আরও তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে।

১৮১৮ সালে পশ্চিম ও পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে চা এবং চিনির চাষ সম্পর্কে কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ডিরেক্টর কর্নেল সাইকস 'করের' পরিমাণ হিসাব করিয়া বলেন যে, বছরে এই কর বাবদ ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া যায়। "কেবল আমদানীর চেয়ে বেশী রফতানী করিয়াই ভারতবর্ষ এই কর বহন করিতে পারে।" তেমনি এন. আলেকজাণ্ডার নামে ইস্ট ইণ্ডিয়ার এক ব্যবসায়ী উক্ত কমিটির নিকট বলেন, "১৮৪৭ সাল পর্য্যন্ত ভারতের আমদানীর মূল্য ছিল ৬০,০০,০০০ পাউণ্ড এবং রফতানীর মূল্য ছিল ৯০,০০,০০০ পাউণ্ড। এই দুয়ের ভিতরকার তফাৎটা হইল উক্ত দেশ হইতে কোম্পানীর পাওয়া কর। ইহার পরিমাণ প্রায় ৪০,০০,০০০ পাউণ্ড।"

১৮৫১ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক বেসরকারীভাবে টাকা পাঠান বাদ দিয়া, শাসনক্ষমতার অধিকারীবর্গ কর্তৃক হোমচার্জ বাবদ প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সাত গুণ বৃদ্ধি পায় (২৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৭৩ লক্ষ পাউণ্ড)। ইহার মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ পাউণ্ড হইতেছে মালপত্র কেনার দাম বাবদ। ১৯১৩-১৪ সালের মধ্যে করের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া হয় ১৯৪ লক্ষ

পাউণ্ড, তাহার ভিতর মাত্র ১৫ লক্ষ পাউণ্ড হইল মালপত্রের দাম। ১৯৩৩-৩৪ সালের মধ্যে, গভর্নমেণ্টের দেওয়া হিসাব মতো ইংলণ্ডে নীট খরচের পরিমাণ দাঁড়াইল ২৭৫ লক্ষ পাউণ্ড, তাহার মধ্যে মাত্র ১৫ লক্ষ পাউণ্ড হইল মালপত্রের দাম। ১৯১৪ সালের বিনিময় হার টাকা পিছু ১ শিলিং ৪ পেন্স হইতে ১৯৩৩ সালে টাকা পিছু এক শিলিং ছয় পেন্সে পরিবর্ত্তিত হওয়ার ফলে ইহা পরিশোধ করিবার জন্য ভারতে যত টাকা প্রয়োজন হইত তাহার পরিমাণ কমিয়া গেল বটে, কিন্তু ভারতের মূল্য-মান ১৯১৪ সালের ১৪৭ হইতে ১৯৩৩ সালে ১২১-এ নামিয়া আসার ফলে, ভার সামঞ্জস্য না হইয়া ভারতের ঘাড়েই আরও বেশী বোঝা চাপিল, এবং ১৯১৪ সালের মূল্যের নিরিখে ভারতের বোঝার পরিমাণ দাঁড়াইল ৩০০ লক্ষ পাউণ্ড।

১৮৫১ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে, পণ্যদ্রব্যাদি এবং ধনরত্ন জড়াইয়া ভারতে আমদানীর চেয়ে ভারত হইতে রফতানীর আধিক্য তিন গুণ বাড়িয়া যায়—৩৩ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১১০ লক্ষ পাউণ্ড (পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ২৭৪ লক্ষ পাউণ্ড)। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই বাড়তি রফ্‌তানীর পরিমাণ আরও তাড়াতাড়ি উঠিতে থাকে। ১৯০১ ও ১৯১৩-১৪ সালের মধ্যে উহা ১১০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৪২ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া উঠে (মাত্র পণ্যদ্রব্যাদি ৩৮৪ লক্ষ পাউণ্ড)। গড়পড়তা ধরিলে, ১৯১৩-১৪ সালে ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণ বছরের চেয়ে নীচের দিকেই ছিল। ১৯১০ হইতে ১৯১৩-১৪ পর্য্যন্ত যুদ্ধের পূর্ব্বের এই পাঁচ বছরের একটা গড়পড়তা ধরিলে, বছর পিছু আমদানীর চেয়ে বেশী রফ্‌তানীর পরিমাণ হইল ২২৫ লক্ষ, অর্থাৎ দশ বৎসরের ভিতর উহা বাড়িয়া ১৯০১ সালের দুই গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। (ভারতীয় রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট, ১৯২২, পৃঃ ২০ দ্রষ্টব্য)।

১৯৩১-৩৩ সালের মধ্যে ভারতে আমদানীর চেয়ে রফতানীর আধিক্যের নীট পরিমাণ ৬৯৭ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া উঠে, ইহার মধ্যে ছিল ২৬৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্যদ্রব্য এবং ৪২৯ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ধনরত্ন।

এই শেষোক্ত সংখ্যাটি অস্বাভাবিকরূপে বিরাট হওয়ার কারণ হইতেছে এই যে, ইংলণ্ড তাহার মুদ্রাসঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ভারত হইতে সোনা হাতাইয়া লয়। আরও ভালোভাবে তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য, যদি ১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৫-৩৬ সালের গড়পড়তা লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উহার পরিমাণ হইল ৫৯২ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ উহা ১৪ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বের

পাঁচ বছরকার (১৯১০-১৪) স্তরের প্রায় তিন গুণ, এবং ১৯০১ সালের স্তরের পাঁচ গুণেরও অধিক। ভারতের রফ্তানী এবং আমদানীর মধ্যে মূল্য-মানের ফারাখ থাকার ফলে আরও যে শোষণ চলিত তাহার কথা বাদ দিয়াই যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ভারত কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই প্রত্যক্ষ করের বৃদ্ধি একটা নির্ঘণ্টের আকারে সাজানো যায়, তাহা হইলে আধুনিক যুগে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারত শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধির রূপটা প্রথম নজরেই ধরা পড়িবে; অথচ এই নির্ঘণ্টের ভিতরও শোষণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র মিলিবে না।

ভারত কর্ত্তৃক ইংলণ্ডকে প্রদত্ত কর বৃদ্ধির হিসাব

(লক্ষ পাউণ্ডের হিসাবে)

	১৮৫১	১৯০১	১৯১৩-১৪	১৯৩৩-৩৪
হোম চার্জ	২৫	১৭৩	১৯৮	২৭৫
ভারত হইতে বাড়তি রফতানী	৩৩	১১০	১৪২	৬৯৭

পাঁচ বছর করিয়া সময় ধরিয়া হিসাব করিলে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কের আরও একটা ভালো ছবি দেখিতে পাইব।

পাঁচ বছর হিসাবে বাৎসরিক গড় হিসাব

(লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে)

	১৮৫১-৫৫	১৮৯৭-১৯০১	১৯০৯-১০ হইতে ১৯১৩-১৪	১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৫-৩৬
ভারত হইতে বাড়তি রফ্তানী	৪৩	১৫৩	২২৫	৫৯২

শোষণের এই যে রেখা সিধাভাবে উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে, ইহা হইতে কেবল পরিমাণ-বৃদ্ধির কথাই পরিস্ফুট হইয়া ওঠে না; শোষণের রীতি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তনও ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, দ্রুত এবং প্রচুর কর বৃদ্ধি এবং বিংশ শতাব্দীতে উহার বেগ বৃদ্ধি আসলে শোষণের নূতন রূপটাই ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখে। শোষণের এই নূতন রূপ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবাধ বাণিজ্যের

পুঁজিবাদের যুগের অবস্থা হইতে পুষ্টিলাভ করিয়া বিংশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্ক-পুঁজির শোষণের নূতন পর্য্যায়ে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে অবাধ বাণিজ্যগত পুঁজিতন্ত্রের প্রয়োজনে ভারতে বৃটিশ নীতি নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হয়।

প্রথমত কোম্পানীকে একেবারে চিরকালের জন্য উঠাইয়া দিয়া উহার বদলে সারা বৃটিশ পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ১৮৩৩ সালের নূতন সনদে উহা অংশত কার্য্যে পরিণত হইলেও চূড়ান্তভাবে সম্পাদিত হয় ১৮৫৮ সালে।

দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক মর্ম্মমূলে আরও গভীরভাবে প্রবেশ করিবার জন্য ভারতকে আরও ভালো করিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিবার প্রয়োজন হয়। রেলপথ প্রতিষ্ঠা, পথঘাটের উন্নতি, বৃটিশ আমলে যে সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল তাহারই প্রতি মনোযোগ প্রদানের সূচনা, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ও সর্ব্বত্র একই ধরনের ডাক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন; কেরানী এবং অধীন দালাল যোগাড় করিবার জন্য ইংরেজী ধরনের শিক্ষার সীমাবদ্ধ প্রথম সূচনা, এবং ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রচলন, এ সমস্ত ইহারই জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহার অর্থ হইল এই যে সরকারী পূর্ত্তকার্য্যের দিক দিয়া এশিয়াতে দেশ শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাথমিক কাজগুলিও একশত বছর ধরিয়া অবহেলা করিবার পর শোষণের প্রয়োজনের তাগিদে বৃটিশ বাধ্য হইয়া নূতন ভাবে কাজ আরম্ভ করিতে বাধ্য হইল। অবশ্য ইহাও অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে হয় এবং শিল্পোন্নতির গলা টিপিয়া উহাকে নিস্ফল করিয়া দেয়। বিদেশীরা যাহাতে এদেশে ঢুকিয়া পড়িতে পারে, কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া, কেবল বিদেশীর ব্যবসায়ের প্রয়োজনের খাতিরেই এবং টাকাকড়ির দিক দিয়া জনসাধারণের পক্ষে অতীব কষ্টকর শর্ত্তে এই চেষ্টা আরম্ভ হয়!

১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসির রেলওয়ের উপর প্রসিদ্ধ মন্তব্য বিরাট আকারে রেলপথ নির্ম্মানের কাজে প্রথম চূড়ান্ত প্রেরণা প্রদান করে। উহাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যবসায়গত উদ্দেশ্যের কথাও বলা হয়। সে উদ্দেশ্য হইল বৃটিশ পণ্যের বাজার এবং কাঁচা মালের উৎস হিসাবে ভারতের উন্নতি সাধন করা।

"আমার প্রকৃত বিশ্বাস যে এইগুলি প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভারত উহা হইতে যে বাণিজ্যিক ও সামাজিক সুবিধা লাভ করিবে, তাহা বর্ত্তমানে হিসাবের বাইরে। যে তুলা ভারত এখনই কিছু পরিমাণে উৎপাদন করে, এবং

কেবল দূরস্থ প্রদেশ হইতে জাহাজে বোম্বাই করিবার বন্দরে উহা আনিবার জন্য উপযুক্ত যানবাহনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই যাহা ভারত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিবে—সেই তুলা ইংলণ্ড তারস্বরে চাহিতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে ব্যবসায়ের সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী বাজারেও ইওরোপে তৈয়ারী জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িয়াছে।......পৃথিবীর এই দিকে এমন অবস্থার ভিতর নূতন বাজার খুলিয়া যাইতেছে যে উহার মূল্য নিরূপণ করা বা ভবিষ্যৎ আকার হিসাব করা সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তির দূরদৃষ্টিরও অতীত।"*

বাণিজ্যের দিক দিয়া ভারতের ভিতর সিঁধাইয়া পড়িবার জন্য এবং লৌহ, ইস্পাত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার তৈয়ারী করিবার জন্য শিল্প-পুঁজির প্রয়োজন অনুসারে এইভাবে উন্নতি সাধন, বিশেষ করিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ দরকার হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু উহার সঙ্গে আরও একটি অনিবার্য্য ফল দেখা দিল। তাহা হইল একটা নূতন পর্য্যায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা—ভারতে বৃটিশ পুঁজি নিয়োগের শ্রীবৃদ্ধি করা।

সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ইহাকে পুঁজি রফ্‌তানী বলিয়া অভিহিত করা হইবে। কিন্তু ভারতের বেলায় আসল ঘটনাকে যদি ভারতে বৃটিশ পুঁজি রফ্‌তানী বলিয়া চালানো যায়, তাহা হইলে উহা বাস্তবের এক তীব্র বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই হইবে না। আসলে যে-পরিমাণ পুঁজি রফ্‌তানী হইয়াছিল, তাহা খুবই কম। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত, সারা যুগটার মধ্যে কেবল ১৮৫৬-৬২ এই সাত বছর রফ্‌তানীর চেয়ে আমদানী বেশী হয়। উহার পরিমাণ হইল ২২৫ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯১৪ সালের মধ্যে যে লগ্নী করা পুঁজির পরিমাণ শেষ পর্য্যন্ত ৫০০০ লক্ষ পাউণ্ডের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার তুলনায় ইহাকে কি খুব একটা বড় কিছু বলিয়া ধরা যায়? সমস্ত সময়টার মধ্যে, পুঁজি খাটাইবার বেলাতেও বৃটেন হইতে ভারতে পুঁজি রফ্‌তানীর চেয়ে ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত করের পরিমাণ বহুগুণ বেশী হইয়া যায়। **এইভাবে ভারতে লগ্নীকৃত বৃটিশ পুঁজি বাস্তবিক ভারতের বুকে বসিয়াই ভারতীয় জনসাধারণকে প্রথমে লুণ্ঠন করিয়াই তোলা হয়, তাহার**

* (১৮৪৮ সাল হইতে ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত গভর্নর-জেনারেল) লর্ড ডালহৌসির রেলওয়ে সম্পর্কিত মন্তব্য, ১৮৫৩।

পর বৃটেনের কাছে ভারতের জনসাধারণের ঋণ বলিয়া উহা লেখা-জোখা হইয়া যায়। সেই হইতে তাহাদের উহার উপর সুদও গণিতে হইতেছে, লভ্যাংশও দিতে হইতেছে।

ভারতে বৃটিশ-পুঁজি লগ্নী করিবার বীজ হইল "জনসাধারণের ঋণ" (পাবলিক ডেট); বৃটেনের ধনী মোড়লেরা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্বদেশেও এই প্রিয় কৌশলটি ইতিপূর্ব্বেই ব্যবহার করিয়াছিল। ১৮৫৮ সালে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যখন শাসনভার গ্রহণ করিল তখন তাহারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ৭০০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণও গ্রহণ করিল, ভারতীয় লেখকরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে ভারতের বাহিরে আফ্‌গানিস্তান, চীন এবং অন্যান্য দেশে বৃটেনের যুদ্ধের খরচ ভারত বহন তো করিয়াছেই তাহার উপর আবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত হইতে ১৫০০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর কর হিসাবে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঠিক মত হিসাব করিলে ভারতের পাওনাই থাকিয়া যাইতেছে ; কিন্তু ইহা সত্বেও পাওনা হিসাবে ঋণের জের টানিয়া লইয়া যাওয়া এবং দ্রুত হারে উহা বাড়িয়া উঠার পথে বাধা কোথায় ?

বৃটিশ গভর্নণ্টের হাতে পড়িয়া "জনসাধারণের ঋণ"—আঠারো বছরের ভিতর বাড়িয়া ৭০০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৪০০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হয়। ১৯০০ সালে উহার পরিমাণ হয় ২২৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯১৩ সালে হয় ২৭৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে উহার পরিমাণ হয় ১১৭৯০০ লক্ষ টাকা (৮৮৪২ লক্ষ পাউণ্ড), তাহার মধ্যে ৭০৯৯০ লক্ষ টাকা (৫৩২৪ লক্ষ পাউণ্ড) হইল ভারতে তোলা ঋণ এবং ৩৫১৮ লক্ষ পাউণ্ড (৪৬৯১০ লক্ষ টাকা) হইল স্টার্লিং ঋণ অথবা ইংলণ্ডে তোলা ঋণ। কাজেই দেখা যাইতেছে যে প্রায় ৭৫ বছর প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনের মধ্যে ঋণের পরিমাণ বারো গুণেরও অধিক বাড়িয়া গিয়াছিল।

ইংলণ্ডে স্টার্লিং ঋণের অনুপাত বৃদ্ধিটা বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। কোম্পানীর শাসনের শেষ দিকে, এমন কি ১৮৫৬ সালেও, ইংলণ্ডে ঋণের পরিমাণ ৪০ লক্ষ পাউণ্ডেরও কম ছিল। ১৮৬০ সালে উহা একেবারে লাফ দিয়া ৩০০ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া উঠে। ১৮৮০ সালে উহার পরিমাণ হয় ৭১০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯০০ সালের মধ্যে উহা দাঁড়ায় গিয়া ১৩৩০ লক্ষ পাউণ্ডে—এবং ১৯১৩ সালে পরিণত হয় ১৭৭০ লক্ষ পাউণ্ডে—এবং ১৯৩৯ সালে উহা ৩৫১৮ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া ঠেকে।

এই ঋণের সৃষ্টি হয় প্রথমতঃ ভারতের ঘাড়ে যুদ্ধের খরচ এবং অন্যান্য খরচ চাপাইয়া এবং পরে গভর্নমেণ্ট প্রবর্ত্তিত রেলপথ এবং পূর্ত্তকার্য্যের খরচের দ্বারা। প্রথম ৭০০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণের বেশীর ভাগই হয় লর্ড ওয়েলেসলীর আমলের যুদ্ধ, প্রথম আফগান যুদ্ধ, শিখযুদ্ধ এবং ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের ব্যয়ের জন্য। তাহার পরের যে ৭০০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া ফেলেন, তাহার মধ্যে মাত্র ২৪০ লক্ষ পাউণ্ড রেলপথ নির্ম্মাণ ও সেচ কার্য্যে ব্যয় করা হইয়াছিল। যে কোনো ধরনের খরচ, এমন কি যাহার সহিত ভারত বা ভারতে বৃটিশ শাসন খুব কমই সংশ্লিষ্ট বা যাহার সহিত তাহাদের সংস্রব আজগুবি খেয়াল খাটাইয়াও পাওয়া যায় না ; যেমন তুরস্কের সুলতানের লণ্ডনে অভ্যর্থনা, চীন এবং পারস্যে বৃটেনের কনসালের অফিসপত্র রাখা, আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অথবা ভূমধ্যসাগরস্থিত নৌ বাহিনীর খরচের অংশ —এই সব ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়াই বাকি ঋণের বেশীর ভাগ গড়িয়া উঠে।

"ভারতের উপর যে-সব বোঝা চাপানোর সুবিধা ছিল, তাহা একেবারে অসঙ্গত এবং অসম্ভব। বিদ্রোহের খরচ, কোম্পানীর অধিকার সম্রাটের নিকট হস্তান্তরের খরচ, একসঙ্গে চীন এবং আবিসিনিয়ার যুদ্ধের খরচ, ভারতের সহিত যাহার মাথামুণ্ডু কোন সম্পর্কই নাই। লণ্ডনে তেমনি সরকারী খরচপত্র যথা, ভারত দফ্‌তরের দাসীর মাহিনা, যে-সব জাহাজ বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিল বটে কিন্তু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নাই, তাহার খরচপত্র, ভারত যাত্রার পূর্ব্বে বিলাতে ছয় মাস ভারতীয় রেজিমেণ্টের শিক্ষার খরচপত্র—এ সবই যাহার হিসাবের ঘরে লিখিয়া রাখা হইত সে হইতেছে সেই রায়ত, যাহার হইয়া বলিবার জন্য কোনো প্রতিনিধি ছিল না। ১৮৬৮ সালে তুরস্কের সুলতান লণ্ডনে যান ; ভারত দফতরে তাঁহার জন্য সরকারীভাবে বল-নাচের আয়োজন হয়, খরচটা পড়ে ভারতের ঘাড়ে। ইলিং-এ এক পাগলা গারদের খরচ, জাঞ্জিবার মিশনের সদস্যদিগকে প্রদত্ত উপহার, চীন এবং পারশ্যে বৃটেনের প্রতিনিধির দফ্‌তর এবং কূটনৈতিক দফ্‌তর, ভূমধ্যসাগরস্থিত নৌবাহিনীর আংশিক খরচপত্র, ইংলণ্ড এবং ভারতের মধ্যে একটি টেলিগ্রাফ লাইনের পুরা খরচপত্র—এ সবই ১৮৭০ সালের পূর্ব্বেই ভারতীয় কোষাগারের ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে। সম্রাটের শাসনের প্রথম তেরো বৎসরের মধ্যে ভারতীয় রাজস্ব যে ফুলিয়া ফাঁপিয়া

৩৩০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৫২০ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া উঠে এবং ১৮৬৬ সাল হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে যে ১১৫ লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতি জমিয়া উঠে—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ১৮৫৭ এবং ১৮৬০ সালের মধ্যে তিন কোটি পাউণ্ড ('হোম ডেট') সৃষ্টি হয় এবং উহা বেশ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে; এবং মাথা খাটাইয়া ভারতীয় আয়ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করায় বৃটিশ রাজনীতিকরা তাঁহাদের অর্থনৈতিক জ্ঞান বুদ্ধির জন্য প্রশংসা লাভ করেন।"*
রাষ্ট্রের সাহায্যে এবং যে-সব বেসরকারী কোম্পানী রেলপথ তৈয়ারী করিতেছিল তাহাদের গ্যারাণ্টি দিয়া রেলপথের উন্নতি সাধন, তাহার উপর পরে প্রত্যক্ষ ভাবে রেলপথ নির্ম্মাণের ফলে ঋণ ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল, রেলপথ নির্ম্মাণের কাজে বৃটিশ পুঁজিপতিরা যে টাকাই খরচ করুক না কেন তাহার উপর শতকরা ৫ টাকা সুদের গ্যারাণ্টি দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে যে চূড়ান্ত অপচয় এবং অমিতব্যয়িতা হইবে, তাহা জানা কথা। ১৮১২ সাল পর্য্যন্ত যে ৬০০০ মাইল রেলপথ তৈয়ারী হয়, তাহার খরচ পড়ে ১০০০ লক্ষ পাউণ্ড অথবা মাইল পিছু ১৬০০০ পাউণ্ডেরও উপর। ১৮৭২ সালে আয় ব্যয় সম্পর্কে পালামেণ্টারী তদন্ত কমিটির সমক্ষে রেলের হিসাব পত্রের প্রাক্তন সরকারী হিসাব পরীক্ষক বলেন, "এই ধরনের একটা বোঝাপড়া ছিল উহা (ব্যয়) খুব কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে না......হিসাব দাখিল না করা পর্য্যন্ত কত টাকা যে খরচ হইয়াছে তাহার কিছুই জানা যাইত না।" ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব ডবলিউ. এন. মেসি ঐ তদন্ত কমিটির সমক্ষে বলেন: "প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, পরিমিত ব্যয়ের কোনো অভিপ্রায় ঠিকাদারদের ছিল না। সমস্ত টাকাটাই আসিত ইংরেজ পুঁজিওয়ালাদের নিকট হইতে, আর যতক্ষণ তাহারা ভারতের রাজস্ব হইতে শতকরা পাঁচ টাকা সুদের গ্যারাণ্টি পাইত, ততক্ষণ তাহাদের ধার দেওয়া টাকা গঙ্গায় ফেলিয়াই দেওয়া হোক অথবা ইট চুন সুরকিতেই পরিণত করা হোক, তাহাদের কাছে সে কথার কোন গুরুত্বই ছিল না।......আমার মনে হয়, এই সব কাজে যত বাজে খরচ হইয়াছে, তেমন আর কোথাও কখনই হয় নাই।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ২২৬০ লক্ষ পাউণ্ড রেলপথের জন্য খরচ হয়। ফলে কিন্তু লাভ না হইয়া বরং ৪০০ লক্ষ পাউণ্ড লোকসান হইল, তাহাও পড়িল

* এল-এইচ জেঙ্কস: দি মাইগ্রেশন অব বৃটিশ ক্যাপিট্যাল, পৃঃ ২২৩-২৪

গিয়া ভারতের বাজেটে। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পর রেলপথ হইতে কিছু লাভ নিংড়াইয়া বাহির করা হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে রেলপথ বাবদ স্টার্লিং ঋণ প্রত্যর্পণ করা হইল; সে-পর্য্যন্ত রেলপথ সম্পর্কিত ঋণ বাবদ বাৎসরিক প্রায় ১০০ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৩৩-৩৪ সালে ৯৭ লক্ষ পাউণ্ড) ভারত হইতে ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হইত।

রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং চা, কফি, এবং রবারের চাষ ও ছোট খাট আরও কয়েকটা ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বৃটেন হইতে ভারতে বেসরকারী ব্যক্তিগত পুঁজি খাটানো তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিল।

এই সময়ে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ উঠিয়া যাইবার পরে বেসরকারী বৃটিশ ব্যাঙ্কও ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিতে শুরু করিয়াছিল। ১৮৭৬ সালের প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক আইন সরকারী রক্ষামূলক ব্যবস্থা অনুসারে তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করিত। উহারা পরে ১৯২১ সালে এক হইয়া সর্ব্বশক্তিমান 'ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায়' পরিণত হয়। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির হেড্‌কোয়াটার (সদর অফিস) ছিল ভারতের বাহিরে। ইহাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় চারিটি ব্যাঙ্ক হইল চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এ্যাণ্ড চায়না, (ইহারা সনদ পায় ১৮৫৩ সালে); দি মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (ইহার মূল হইতেছে আগেকার আমলের এক ব্যাঙ্ক; ইহাও ঐ একই বৎসরে সনদ পায়); দি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া; দি হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন। ইহারা প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলির সহিত একজোটে বৃটিশ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে ভারতের অর্থনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য এবং শিল্পের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া এদেশে তাহাদের কাজ বাড়াইতে লাগিল। তাহাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার চেষ্টা ভারতীয় জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্কগুলি করিল বটে, কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্ক বেশী সুবিধা পাইত বলিয়া প্রথমোক্তরা মোটেই সফল হইল না। ১৯১৩ সালের মধ্যে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির (প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক এবং এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক) হাতে ব্যাঙ্কে জমা টাকার চার ভাগের তিন ভাগের বেশী গিয়া পড়িল, আর চার ভাগের এক ভাগেরও কম টাকা রহিল ভারতীয় জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্কগুলিতে।

১৯১১ সালে রয়াল স্ট্যাটিসটিকাল সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধে স্যার জর্জ পেইশ হিসাব করিয়া বলেন যে, ১৯০৯-১০ সালে ভারত ও সিংহলে কোনো

কোম্পানীর পুঁজি ছাড়া ব্যক্তিগত পুঁজি (অর্থাৎ যে পুঁজি সম্বন্ধে কোনো দলিল দস্তাবেজে লেখা সাক্ষ্যপ্রমাণ হাতের কাছে পাওয়া যায় নাই তাহা) বাদ দিয়াও মোট বৃটিশ লগ্নী পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩৬৫০ লক্ষ পাউণ্ড। কি ধরনের ব্যবসায়ে কত টাকা খাটিতেছিল, তাহা নীচে দেখান হইয়াছে (জার্নাল অফ্ রয়্যাল স্ট্যাটিসটিকাল সোসাইটি, ৭৪ শ খণ্ড, ১ম ভাগ, জানুয়ারী ২, ১৯১১, পৃঃ ১৮৬):

	লক্ষ পাউণ্ডের হিসাব
সরকার এবং মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কিত	১৮২৫
রেলওয়ে	১৩৬৫
চাষ (চা, কফি এবং রবার)	১৪২
ট্রামওয়ে	৪১
খনি	৩৫
ব্যাঙ্ক	৩৪
তৈল	৩২
শিল্পবানিজ্য	২৫
অর্থ, ভূমি ও ইন্‌ভেস্টমেণ্ট	১৮
বিবিধ	৩৩

উপরোক্ত তালিকাটি খুবই শিক্ষাপ্রদ। ইহা হইতে দেখা যাইবে, ভারতে বৃটিশ পুঁজি খাটাইবার ব্যবস্থা বা তথাকথিত "বৃটিশ পুঁজি রফতানী"র মধ্যে কোনো দিক দিয়াই ভারতে আধুনিক শিল্পের উন্নতির কথা ছিল না। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে লগ্নী বৃটিশ পুঁজির শতকরা ৯৭ ভাগই খাটিত গভর্নমেণ্ট, যানবাহন, চাষ ও অর্থ সম্পর্কিত কাজে ; অর্থাৎ বাণিজ্যের দিক দিয়া ভারতে প্রবেশ করা এবং কাঁচা মালের উৎস ও বৃটিশ পণ্যের বাজার হিসাবে ভারতকে শোষণ করার কাজেই পুঁজি নিয়োগ করা হইত : শিল্পোন্নতি সাধনের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্কই থাকিত না।

স্যার জর্জ পেইশের হিসাবে সব জিনিস কম করিয়া দেখানোর কথা স্বীকার করা হইয়াছে। যাহা জানা সম্ভব নহে তেমন কথা ইহা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৯১৪ সালের পূর্ব্বের ভারতে লগ্নী বৃটিশ পুঁজির অন্য যে-সব হিসাব আছে তাহার মধ্যে এইচ্-ই হাউয়ার্ডের 'ইণ্ডিয়া এণ্ড দি গোল্ড

স্ট্যাণ্ডার্ড' (১৯১৯) বইয়ে উহাকে ৪৫০০ লক্ষ পাউণ্ড বলিয়া ধরা হইয়াছে ; এবং ১৯০৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকার 'আওয়ার ইনভেস্টমেণ্ট এ্যাব্রড' নামক এক প্রবন্ধে ৪৭৫০ লক্ষ পাউণ্ড বলিয়া দেখানো হইয়াছে।

২। ব্যাঙ্ক-পুঁজি ও ভারত

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ ব্যাঙ্ক-পুঁজি কর্ত্তৃক ভারত শোষণের বনিয়াদ মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেও পরবর্ত্তী যুগেই শোষণের রীতি পুরাপুরি কার্য্যকরী হয়।

শিল্প-পুঁজি এবং বাণিজ্যগত শোষণের অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। তাহা হইতে জন্মলাভ করিয়া, সুরু হইতেই বাণিজ্যিক অবস্থার উহা সহায়তাই করিয়াছে, নিজে উহার স্থান অধিকার করে নাই। ১৯০৯-১০ সালের মধ্যে ভারতে লগ্নীকৃত বৃটিশ পুঁজি যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, স্যার জর্জ পেইস্ কর্ত্তৃক তাহা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই ইহা দেখা গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পরে যে ভাবে অনু-পাতের পরিবর্ত্তন হয় তাহা আধুনিক যুগের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বৃটিশ শিল্পের একচেটিয়া অধিকার ও জগতের বাজারের উপর তাহার আধিপত্য ক্ষীণ হইয়া পড়িতে সুরু করে। নূতন ইওরোপীয় ও মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে এই ভাবে হটিয়া যাওয়াটা পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও বেশ পরিলক্ষিত হয়। রাজ-নৈতিক আধিপত্যের জোরে ভারতের গলার ফাঁসটা বেশ ভালভাবেই কষিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া, এ দেশে পতন খুব ধীরে ধীরেই হয়। এমন কি ১৯১৪ সালের যুদ্ধ পর্য্যন্ত ভারতের বাজারের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ বৃটিশ আয়ত্তে রাখিয়া দিতে পারিয়াছিল, বাকিটার উপর আধিপত্য করিত পৃথিবীর আর সকল দেশ মিলিয়া। কিন্তু ভারতেও উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষ হইতে এই পতন ধীরে এবং নির্দ্দিষ্টভাবে ঘটিতে লাগিল।

১৮৭৪-৭৯ সাল এই পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতের মোট আমদানীর মধ্যে বৃটিশের অংশ ছিল শতকরা ৮২ ভাগ ; ইহার উপর সাম্রাজ্যের বাকি অংশের হাতে ছিল শতকরা আরও ১১ ভাগ। কাজেই বাকি বাহিরের জগতের জন্য ভারতের বাজারের চৌদ্দ ভাগের এক ভাগেরও কম খোলা ছিল। ১৮৮৪-৮৯ সালের মধ্যে কিন্তু বৃটিশের শতকরা ৮২ ভাগ কমিয়া ৭৯তে আসিয়া দাঁড়ায় ;

১৮৯৯-১৯০৪ সালের মধ্যে আরও কমিয়া হয় শতকরা ৬৬ ভাগ, ১৯০৯-১৪ সালের মধ্যে উহা আরও কমিয়া শতকরা ৬৩ ভাগে পরিণত হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে আবার লগ্নীকৃত মূলধনের মুনাফা এবং হোম চার্জের পরিমাণ একভাবে বাড়িয়া যাইতেছিল। ১৯১৩-১৪ সালে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে মোট ১১৭০ লক্ষ পাউণ্ডের কাজ কারবার হইয়াছিল। বৃটেন হইতে ভারতে অথবা ভারত হইতে বৃটেনে চালান দেওয়া মাল—এই সবের উপরই শতকরা ১০ভাগ হারে মুনাফা ধরিলে মোট ১২০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। তাহার উপর আবার ভারতে রফতানী সমস্ত বৃটিশ পণ্যের উপর শতকরা ১০ ভাগ মাল-প্রস্তুতকারকের মুনাফা হিসাবে ধরিলে (অর্থাৎ ৭৮০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর ৮০ লক্ষ পাউণ্ড) এবং জাহাজে মালপত্র প্রেরণ বাবদ ৮০ লক্ষ পাউণ্ড আয় (১৯১৩ সালের বাণিজ্য বোর্ডের তদন্ত অনুযায়ী জাহাজে মালপত্র প্রেরণ বাবদে বৃটেনের যে মোট আয় হয় তাহাতে ভারতের অংশ ছিল শতকরা ৯ভাগ হারে ১৯১৩ সালে মোট ৯৪০ লক্ষ পাউণ্ড) যোগ করিলে ১৯১৩ সালে ভারত হইতে বৃটেনের ব্যবসায়, জিনিসপত্র তৈয়ারী এবং জাহাজে মাল পাঠান ইত্যাদি বাবদ মুনাফার পরিমাণ হয় সর্ব্বসাকুল্যে ২৮০ লক্ষ পাউণ্ড।

কিন্তু এইচ. ই. হাওয়ার্ড প্রণীত 'ভারত এবং স্বর্ণমাণ' (ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড দি গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড) নামক গ্রন্থে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ১৯১১ সালের মধ্যে ভারতে লগ্নীকৃত বৃটিশ মূলধন মোট ৪৫০০ লক্ষ পাউণ্ডে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং ১৯১৪ সালের যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ৫০০০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর। ইহার সুদের হার কমাইয়া গড়ে শতকরা পাঁচ পাউণ্ড হিসাবে ধরিলে, তাহাতেই ২৫০ লক্ষ পাউণ্ড আসিয়া যাইবে। ইহার উপর আবার ব্যবসাদার কোম্পানীগুলি ছাড়া অন্যান্য যেসব ধরনের মূলধন ভারতে খাটিতেছিল, (যেমন চা, রবার, কফিচাষ, পাট, খনি ইত্যাদি বাবদ; ইহা হইতে অনেক সময় শতকরা ৫০ ভাগ হারেও লভ্যাংশ মিলিত) তাহাদের মুনাফা ইত্যাদি আনুপাতিক হিসাবে ধরিতে হইবে; ইহা ছাড়া আবার ছিল কমিশন, বিনিময় ব্যবস্থা, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম, বীমার কাজকর্ম্ম ইত্যাদি। এইগুলি খুব কম করিয়াও ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড ধরিলে মোটমাট ৪০০ লক্ষ পাউণ্ড আসিয়া যাইতেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ঋণের উপর, সুদের হিসাব বাদ দিয়াও ১৯১৩-১৪ সালে হোমচার্জ ৯০ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া ঠেকিয়াছে; লগ্নীকৃত মূলধনের মুনাফা এবং প্রত্যক্ষ কর হইয়া দাঁড়াইতেছে মোট ৫০০ লক্ষ পাউণ্ডের কাছাকাছি।

তুলনামূলক আলোচনার সময় এই ধরনের হিসাব পত্রের মূল্য খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু একথা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, ১৯১৪ সালের মধ্যে লগ্নীকৃত মূলধনের সুদ এবং মুনাফা ও প্রত্যক্ষ কর মিলিয়া মোট ব্যবসা বাণিজ্য, জিনিসপত্র তৈয়ারীর এবং জাহাজে মাল চালান দেওয়ার মুনাফা ইত্যাদিকে ছাপাইয়া যাইতেছে এবং বিংশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্ক-পুঁজিবাদীর ভারত শোষণ প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ এবং তাহার পরবর্ত্তী যুগ ইহার গতি আরও দ্রুত করিয়া তোলে। ভারতের বাজারে বৃটিশের অংশ তিন ভাগের দুই ভাগ হইতে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগের কিছু উপরে আসিয়া দাঁড়ায়। শুল্ক এবং সাম্রাজ্যিক সুবিধাদির সুযোগ গ্রহণ সত্ত্বেও জাপানী, মার্কিন এবং ক্রমে ক্রমে নূতন করিয়া জার্মান প্রতিযোগিতাও তীব্র হইয়া উঠে। অত্যন্ত গুরুতর বিপত্তি, টাকা পয়সার অসুবিধা এবং দমাইয়া দিবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও (এই নীতি ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে খোলাখুলিভাবে এবং যুদ্ধের পরে কিছুটা আড়ালে কাজ করিয়া আসিয়াছে) ভারতের শিল্প উৎপাদন, বিশেষ করিয়া লঘু শিল্প বেশ অগ্রসর হয়।

১৯১৩ এবং ১৯৩১-৩২ সালের মধ্যে ভারতে মোট আমদানীর মধ্যে বৃটেনের শতকরা অংশ ৬৪ ভাগ হইতে কমিয়া শতকরা ৩৫ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। পরে ভারতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে অটোয়া-চুক্তি ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহার ফলে ১৯৩৪-৩৫ সালের মধ্যে উহা অনুপাতটাকে জোর করিয়া বাড়াইয়া শতকরা ৪০.৬ ভাগে তুলিয়া দেয়। কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ সালে উহা আবার শতকরা ৩৮·৮ ভাগে এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে ৩৮·৫ ভাগে নামিয়া যায়। ১৯১৩-১৪ সালে জাপানের অনুপাত ছিল শতকরা ২·৬ ভাগ ; ১৯৩৫-৩৬ সালে তাহাই দাঁড়াইল শতকরা ১৬·৩ ভাগে। ঐ সময়ের মধ্যে জার্মানীরও অনুপাত শতকরা ৬·৯ হইতে ৯ ভাগে গিয়া উঠিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুপাত ২·৬ হইতে ৬·৭ ভাগে পরিণত হইল। (ইকনমিস্ট, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭)

১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার ফলে সরকারী হিসাব পত্রের উপর তাহার প্রভাব যে থাকিবে তাহা স্বাভাবিক। ভারত সরকারের আর্থনীতিক উপদেষ্টা কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতের ব্যবসায় সমালোচনা' (রিভিউ অব্ দি ট্রেড অব ইণ্ডিয়া) নামক বাৎসরিক রিপোর্টে ব্রহ্মদেশ বাদ দিয়া কেবল ভারতীয় বাজারের অনুপাত এইভাবে দেখান হইয়াছে :

ারতে আমদানার অনুপাত

(শতকরা হিসাব)

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৯-৪০
বৃটেন	৩১.৭	২৯.৯	২৫.২
ব্রহ্মদেশ	১৭.৫	১৪.৯	১৯.০
জাপান	১৩.০	১২.৮	১১.৭
জার্মানী	৭.৯	৮.৮	৪.০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫.৬	৭.৪	৯.০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভিতর ভারতের ব্যবসায়ে একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তন ঘটে। শত্রুদেশগুলির সহিত ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে, ভারতের বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইরান, আরব, ইরাক, তুরস্ক, মিশর ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির অংশ বেশ বাড়িয়া গেল, '১৯৪২-৪৩ সালের ভারতের ব্যবসায় সমালোচনা' (রিভিউ অব্ দি ট্রেড অব্ ইণ্ডিয়া) হইতে এই হিসাবগুলি দেওয়া যাইতেছে :—১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের আমদানীতে বৃটেনের অংশ ছিল শতকরা ২৬.৮ ভাগ (১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ২৫.২ ভাগ); মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ১৭.৩ ভাগ (১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ৯.০ ভাগ); কানাডার শতকরা ৫.০ ভাগ (১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ০.৮ ভাগ); অষ্ট্রেলিয়ার শতকরা ২.৯ ভাগ (১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ১.৪ ভাগ); এবং মিশর বাদ দিয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির শতকরা ২০.২ ভাগ (১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ২.৯ ভাগ)। ১৯৩২-৪৩ সালে মিশরের অংশ ছিল শতকরা ৭.৪ ভাগ।

"সিংহের ভাগটা" তখন পর্য্যন্ত বৃটেনের দখলে ;—তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী তিনটি দেশের ভাগ মিলাইয়া যতটা হয়, বৃটেনের অংশ তাহারও চেয়ে বেশী। কিন্তু এই সিংহের ভাগ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; এবং সিংহ মহাশয়কে নিজের ভাগ বাঁচাইবার জন্য মরিয়া হইয়া বিদেশী এবং ভারতীয় প্রতি-যোগিতার বিরুদ্ধে তাহার নখদন্ত ব্যবহার করিতে হইতেছে। ১৯৩৬ সাল হইতে ভারত (ব্রহ্মদেশকে ধরিয়াও) আর আগেকার একশ বছরের মত বৃটেনের সবচেয়ে বড় -খরিদ্দার নহে, ১৯৩৭ সালে ভারত খরিদ্দারদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে এবং ১৯৩৮ সালে তৃতীয় স্থানে নামিয়া আসিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প-পুঁজি কর্ত্তৃক ভারত শোষণের প্রধান ক্ষেত্র

ছিল তুলাজাত দ্রব্য ভারতে রফ্‌তানী। ভারতের বাজারে বৃটেনের অংশ এইভাবে ১৯১৮ সালের পরের যুগে তাড়াতাড়ি কমিয়া যাওয়ার ভিতরে সেই তুলাজাত দ্রব্যের বাজার নষ্ট হইয়া যাইবার চিত্র প্রতিফলিত হইতেছে। শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে তদন্তের জন্য নিযুক্ত ব্যালফুর কমিটি দেখিলেন যে, ১৯১৩-১৯২৩ সালের মধ্যে ভারতে বৃটিশ কাপড়ের ছিট ইত্যাদির রফ্‌তানী শতকরা ৫৭ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সালে ভারতে রফ্‌তানীর মোট পরিমাণ ছিল ৩০৫৭০ লক্ষ গজ অথবা ল্যাঙ্কাশায়ারের মোট রফ্‌তানীর প্রায় (৭০৭৫০ লক্ষ গজ) অর্দ্ধেকের কাছাকাছি। ১৯২৮ সালের ভিতর উহা কমিয়া ১৪৫২০ লক্ষ গজে এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ১৪৪০ লক্ষ গজে দাঁড়ায়। ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে উহা আমদানী হইয়াছিল মাত্র ১১০ লক্ষ গজ।

কিন্তু পুরাতন বনিয়াদ যখন এইভাবে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তখন তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক-পুঁজিবাদী শোষণ দ্বারা মুনাফা শিকারের নূতন ভিত্তি আবার গড়িয়া উঠিতেছিল এবং বিস্তার লাভও করিতেছিল। 'ফিনান্সিয়াল টাইমস'-এ বোম্বাই চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সেক্রেটারী মিঃ সেয়ার হিসাব করিয়া দেখান যে, ১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতে লগ্নীকৃত বৃটিশ মূলধন খুব কম করিয়া ধরিলেও ৫৭৩০ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া উঠিয়াছে। এবং সম্ভবত উহার ঠিক পরিমাণ হইল ৭০০০ লক্ষ পাউণ্ড। তাঁহার হিসাবে উহাকে এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হয়:

লক্ষ পাউণ্ডের হিসাবে

সরকারী স্টার্লিং ঋণ	২৬১০	পাউণ্ড
রেলওয়ে সম্পর্কিত গ্যারাণ্টী প্রদত্ত ঋণ	১২০০	”
শতকরা ৫ হারে সুদের যুদ্ধের ঋণ	১৭০	”
ভারতে রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানীতে মূলধন	৭৫০	”
ভারতের বাহিরে রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানীতে মূলধন	১০০০	”

ভারতে কাজ কারবার করিতেছে এমন সব কোম্পানীর লগ্নীকৃত টাকার পরিমাণ ১৭৫০ লক্ষ পাউণ্ড ধরা হইলেও, ঐ হিসাবে যে উহা কম করিয়া দেখান হইয়াছে তাহা একরকম স্থির নিশ্চয়। তাঁহার মতে ভারতে যে টাকা খাটিতেছে তাহার পরিমাণ ৭০০০ লক্ষ পাউণ্ড ধরিলে উক্ত আসল হিসাবের "খুব দূর ঘেঁষিয়া যাইবে না।" তিনি আরও বলেন:

"বোধ হয় অতি অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞই কেবল ভারতে আমাদের আর্থনীতিক ঝুঁকির গুরুত্বটা হৃদয়ঙ্গম করেন। বেশীর ভাগ লোকেরই ইহার বিরাটত্ব অথবা বৈচিত্র্যের কোন বাস্তব ধারণা নাই। যাঁহারা হাতে কলমে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতেছেন, তেমন অনেক ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার বা পণ্য উৎপাদনকারীর পক্ষেও প্রকৃত পুঁজির পরিমাণ এবং যে সব কাজ কর্ম্মের ভিতর সেই পুঁজি খাটিতেছে তাহার আসল পরিমাপের কাছাকাছি একটা হিসাব তৈয়ারী করা কঠিন হইয়া উঠিবে। বাহিরের পুঁজি এত বিভিন্নরূপে ভারতে প্রবেশ করিয়া থাকে যে তাহার যত হিসাবই করা যাক না কেন প্রধানত উহা একটা আন্দাজ মাফিক হিসাবই হইবে।

(ফিনান্সিয়াল টাইম্‌স্, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৩০)

ভারতে (বৃটিশ) এসোসিয়েটেড চেম্বারস্ অব কমার্স কর্ত্তৃক প্রদত্ত সর্ব্বাপেক্ষা কাছাকাছি সময়ের (১৯৩৩ সালের) হিসাবে মোট অর্থের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে ১০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড। উহার মধ্যে ৩৭৯০ লক্ষ পাউণ্ড হইল সরকারী স্টার্লিং ঋণ, ৫০০০ লক্ষ পাউণ্ড হইল ভারতের বাহিরে রেজেষ্ট্রীকৃত ও ভারতে ব্যবসায়ে রত কোম্পানীর টাকা এবং বাকিটা ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত কোম্পানীতে এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যবসায়ে খাটিতেছে।[১]

নিজের দেশের বাহিরে বৃটিশের মোট টাকা খাটিতেছে ৪০০০০ লক্ষ পাউণ্ড। দেখা যাইতেছে যে, তাহার মধ্যে এক ভারতবর্ষেই ১০০০০ লক্ষ পাউণ্ড লগ্নী করা রহিয়াছে। ১৯১১ সালে হিসাবটা তৈয়ারী করিবার সময়

১। ভারতে লগ্নীকৃত বৃটিশ পুঁজির কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।
"স্ট্যাটিস্টিকাল এ্যাবস্ট্রাকট ফর বৃটিশ ইণ্ডিয়া" নামক বইয়ে দেখান হইয়াছে যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বাহিরে রেজেষ্ট্রীকৃত অথচ ভারতে ব্যবসায়ে রত জয়েন্ট স্টক কোম্পানীসমূহের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ৭৪১১ লক্ষ পাউণ্ড। ইহাতে ভারত গভর্নমেণ্টের স্টার্লিং ঋণ এবং ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত কোম্পানীসমূহের ভারতীয় টাকার পুঁজি বাদ দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলেও ১৯১২ সালের হিসাবপত্রের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ২৬ বছরের ভিতর ভারতে লগ্নীকৃত স্টার্লিংয়ের পরিমাণ ৬৬৭৬ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৮-১৯ সাল হইতে বাড়িয়াছে ২৬৮০ লক্ষ পাউণ্ড। যে সব কোম্পানী ব্যাঙ্কের ব্যবসায় করিয়া থাকে ও টাকাকড়ি কর্জ্জ দিয়া থাকে, তাহাদের লগ্নীকৃত টাকা ১৯১৮-১৯ সালের ২৮৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে দাড়াইয়াছে ৯৬২ লক্ষ পাউণ্ড এবং ব্যবসায়ী ও পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী কোম্পানীগুলির অর্থের পরিমাণ ঐ সময়ের ভিতর ২০৫৪ লক্ষ হইতে ৩৪৪৯ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া উঠিয়াছে।

স্যার জর্জ পেইস দেখেন যে, ভারতে লগ্নীকৃত বৃটিশ পুঁজি হইল সারা জগতে বৃটিশের লগ্নীকৃত টাকার শতকরা ১১ ভাগ। উগ্র ক্রমে নয় ভাগের এক ভাগ হইতে চার ভাগের এক ভাগে, শতকরা ১১ ভা' হইতে শতকরা ২৫ ভাগে পরিণতি লাভ করার মধ্যেই দেখা যাইবে যে, আজ বৃটিশ ব্যাঙ্ক-পুঁজির কাছে ভারতের গুরুত্ব কতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদী নীতির চাবিকাঠি এবং ভারতে বৃটিশের আর্থনীতিক স্বার্থ রক্ষাকল্পে প্রবর্ত্তিত বিশেষ বিলিব্যবস্থার হিসাবও ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে।

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে শোষণের দ্বারা বছর বছর ভারত হইতে যে কর ইংলণ্ডে চলিয়া যায়, তাহার মোট পরিমাণ কত? দুইজন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ কে. টি, শা এবং কে. জে, খাম্বাটা ১৯২৪ সালে প্রকাশিত 'ওয়েল্‌থ্‌ এ্যাণ্ড ট্যাক্সেবল্‌ ক্যাপাসিটি অব্‌ ইণ্ডিয়া' নামক বইয়ে তাহার হিসাব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯২১-২২ সালের যে সব তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছিল, তাহারই ভিত্তিতে হিসাব কষিয়া তাঁহারা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। (তাঁহাদের দেওয়া টাকার হিসাবের পাশে, ১৯২১-২২ সালে প্রচলিত গড়ে টাকা পিছু এক শিলিং চার পেন্স বিনিময়ের হারে স্টার্লিং-এর হিসাবও দেখান হইয়াছে)।

ভারত হইতে বৃটেনে ও বাহিরে প্রেরিত বাৎসরিক কর (১৯২১-২২)

	লক্ষ টাকার হিসাবে	লক্ষ পাউণ্ডের হিসাবে
রাজনৈতিক কর বা হোম চার্জ	৫০০০	৩৩৩
ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত বিদেশী পুঁজির সুদ	৬০০০	৪০০
বিদেশী কোম্পানীকে প্রদত্ত	৪১৬৩	২৭৭
মালপত্র এবং যাত্রী বহনের টাকা	১৫০০	১০০
ব্যাঙ্কিং কমিশন বাবদ ভারতে বিদেশী ব্যবসায়ী ও মুনাফা ইত্যাদি...	৫৩২৫	৩৫৫
	২১৯৮৮	১৪৬৫

মোটামুটি এই ২২০ কোটি টাকা বা ১৫০০ লক্ষ পাউণ্ড বৃটেনের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে মাথা পিছু ৩ পাউণ্ড করিয়া পড়ে; হিসাবের সময়ে বৃটেনে যত লোক সুপার ট্যাক্স দিত তাহাদের মধ্যে টাকাটা সমভাবে ভাগ করিয়া দিলে বছরে তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে ১৭০০ পাউণ্ড করিয়া পড়ে।

১৯২১-২২ সালের অত্যন্ত উচ্চস্তর হইতে দরদাম পড়িয়া যাইবার পর স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত তাঁহার "প্ল্যান্ড ইকনমি অফ ইণ্ডিয়া" বইয়ে মোট করের পরিমাণটা হিসাব করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলাফল নীচে দেওয়া হইল। টাকায় প্রদত্ত তাঁহার হিসাবের পাশাপাশি গড়ে টাকা পিছু ১ শিলিং ও ৬ পেন্স হারে বিনিময়ের ভিত্তিতে স্টার্লিংয়ের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে।

	লক্ষ টাকার হিসাবে	লক্ষ পাউণ্ডের হিসাবে
বৃটিশ এবং বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর কাজকর্ম্ম বাবদ	৩৫০০	২৬০
বিনিময় এবং অন্যান্য কাজকর্ম্ম বাবদ বিদেশী ব্যাঙ্কের কমিশন	২১০০	১৬০
ভারতের শিল্পে নিযুক্ত ইংরেজদের ব্যবসায়ের মুনাফা, বেতন ইত্যাদি	৪০০০	৩০০
ভারতে লগ্নীকৃত বৃটিশ মূলধনের সুদ	৬৫০০	৪৯০
	১৬১০০	১২১০

"পেন্সন এবং অন্যান্য হোমচার্জ বাবদ সরকারী ভাবে ইংলণ্ডে অর্থ প্রেরণ এবং ভারতের সহিত বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ অবৃটিশ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত দায়িত্ব" বাদ দিয়াই এই হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে ঋণের সুদ ব্যতীত হোমচার্জ বাবদ আরও ১৪০ লক্ষ পাউণ্ড ধরিতে হইবে, আর মোট টাকাটা দাঁড়াইবে ১৩৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২১ সালে ভারতের দরদামের সূচী ছিল ২৩৬; ১৯৩৩ সালে উহা কমিয়া হয় ১২১। কাজেই উপরোক্ত মোট টাকার পরিমাণ ঠিক ভাবে হিসাব করা হইয়া থাকিলে, উহা হইতে দেখা যাইবে যে, ঠিক পূর্ব্বের দশ বছরের চেয়ে এবার টাকার পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে। অবশ্য

অনেক জিনিসের সঠিক তথ্যাদি না থাকায় এইসব হিসাবে বৃদ্ধির কেবল একটা মোটামুটি নিদর্শন পাওয়া যায়।

"ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফর কলোনিয়েল এশিয়া—দি কস্ট টু দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড" (ঔপনিবেশিক এশিয়ার স্বাধীনতা ও পাশ্চাত্য জগতের নিকট উহার মূল্য) শীর্ষক রিপোর্টে ভারত কর্তৃক বৃটেনকে প্রদত্ত বাৎসরিক করের সবচেয়ে আধুনিক হিসাব পাওয়া যাইবে। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা হইতেছেন মিঃ লরেন্স কে. রোজিঙ্গার এবং প্রকাশক ফরেন পলিসী এ্যাসোসিয়েশন অব্ আমেরিকা। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী বাৎসরিক করের পরিমাণ হইল ১৩৫০ লক্ষ পাউণ্ড। নিম্নলিখিত ভাবে রিপোর্ট রচয়িতা উহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

৬৭০০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর		
শতকরা ৬-৭-৮	হারে সুদ	৪৬০ লক্ষ পাউণ্ড
	হোমচার্জ	৩৩০ " "
	ব্যবসায়	৩৩০ " "
	জাহাজ ব্যবসায় হইতে	২০০ " "
	ভারতে কর্ম্মে নিয়োজিত ইংরেজদের প্রেরিত অর্থ	৩০ " "
	মোট	১৩৫০ " "

(হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, কলিকাতা, ৩রা জুলাই ১৯৪৫)

যে সমস্ত বিষয়ের যথাযথ হিসাব অসম্ভব, সেগুলির সম্পর্কে হিসাবের যথাসম্ভব অদলবদলের কথা ধরিলেও, মোটামুটি নির্ঘাৎ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বের চেয়ে আধুনিক যুগেই ভারতের শোষণ অনেক তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। হিসাব মত দেখা যায় যে সম্রাট কর্ত্তৃক ভারতের শাসন ভার লওয়ার সময় হইতে ধরিয়া বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে ৭৫ বছরের ভিতর, ভারত হইতে সংগৃহীত করের মোট পরিমাণ হইল ১৫০০ লক্ষ পাউণ্ড, আধুনিক যুগে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের ২০ বছরের ভিতর ভারত হইতে বৃটেনে প্রেরিত করের পরিমাণ হইল ১৩৫০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৫০০ লক্ষ পাউণ্ডের কাছাকাছি। ব্যাঙ্ক-পুঁজির আওতায় ভারতকে

তীব্রতরভাবে শোষণের ভিতরই রহিয়াছে ভারতের বর্ত্তমান ঘনায়মান সঙ্কট এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্রোহ।

৩। শিল্প-বিস্তারের প্রশ্ন

মাঝে মাঝে এমন বলা হইয়া থাকে যে, বৃটিশ শাসনাধীন আধুনিক ব্যাঙ্ক-পুঁজিবাদী যুগে, বিশেষ করিয়া ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পর, শোষণের তীব্রতা বাড়িয়া উঠিয়াছে সত্য। তবু অবাধ বাণিজ্য-যুগের শিল্প পুঁজির আমলের ক্ষয়ের বদলে এযুগে অন্ততঃ শিল্প বিস্তার ও আর্থনীতিক প্রগতি আসিতে পারিয়াছে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী প্রচার ভারতকে জগতের "শিল্পোন্নত জাতিসমূহের নেতৃস্থানীয় এক দেশ" বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করে; (কেবলমাত্র আন্তর্জ্জাতিক শ্রম-দফ্তরের গবর্নিং বডিতে একটা বেশী আসন হাত করিবার জন্য বৃটিশ গবর্নমেণ্ট অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভর করিয়া ১৯২২ সালে জেনেভাতে যে বাগাড়ম্বর পূর্ণ দাবী উপস্থাপিত করে তাহা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য)[১] সেই প্রচার উপরোক্ত মতকে সমর্থন করে এবং ভারতে শিল্পোন্নতি সম্পর্কে নীতির দিক দিয়া একটা মৌখিক হিতৈষণার ভাব দেখায়।

আসল ঘটনাবলী বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এই মত মোটেই টিকিতে পারে না। আধুনিক যুগে ১৯১৪ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরে ভারতে কিছুটা শিল্পোন্নতি হইয়াছে বটে,

১—ভারত গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে লীগ অব নেশনের কাউন্সিলের অধিবেশনে ঘোষণা করেন:

"শিল্পের দিক দিয়া সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আটটি দেশের মধ্যে পরিগণিত হইবার জন্য ভারতের বিশেষ দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণ করা বাকি রহিয়াছে। তাহার দাবী সুস্পষ্ট সাধারণ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং উহার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য পরিশ্রম করিয়া তথ্যাদি দিবার প্রয়োজন নাই। ভারতের যে সব লোক শিল্পে নিয়োজিত থাকিয়া রুজি রোজগার করে, তাহাদের সংখ্যা মোটামুটি ২ কোটি হইবে।"

এই শিল্পে নিয়োজিত "দুই কোটি লোকের" মধ্যে বেশীর ভাগই যে হাতের কাজ করে এবং বেশীর ভাগই যে গৃহশিল্পের শ্রমিক, সে কথা বলিতে তিনি বাদ দিয়া গিয়াছেন। যে সব কলকারখানায় দশ বা ততোধিক ব্যক্তি কাজ করিত, তাহাদের মোট শ্রমিকসংখ্যা যে ১৯২১ সালের শিল্প সম্পর্কিত আদমশুমারীর হিসাব মত ২৬ লক্ষ এবং ইহাদের মধ্যে যে প্রায় দশ লক্ষ চা. কফি ইত্যাদি চাষের কাজ করিয়া থাকে, তাহারা যে প্রকৃত শিল্পে নিয়োজিত নহে—একথাও তিনি বলিতে বাদ দিয়াছেন, ফ্যাক্টরী আইনের অধীনে যে সব শ্রমিক কাজ করিত তাহাদের সংখ্যা যে ১৩ লক্ষ ইহাও তিনি বলেন নাই।

কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই ইওরোপ ভিন্ন অন্যান্য বড় দেশের মধ্যে যতটা শিল্পোন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার কাছে উহা কোন দিক দিয়াই দাঁড়াইতে পারে না। যে টুকুও বা শিল্পোন্নতি এখানে হইয়াছে, তাহার জন্যও আবার উহাকে কি আর্থনীতিক বা কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ ব্যাঙ্ক পুঁজির তীব্র বিরোধিতার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। এদিকে ওদিকে খাপছাড়া ভাবে কাটছাঁট করিয়া উহা সম্ভব হইয়াছে, তাহাও আবার কেবল লঘুশিল্পে; প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ গুরু-শিল্পগুলিতে অগ্রগতি হইয়াছে অতি দুর্ব্বলভাবে। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রাথমিক আলোচনাতেই দেখা গিয়াছে যে, ভারতে সাধারণ শিল্পবিস্তার যে হইয়াছে—এ কথা বলা আজও অসম্ভব।

১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতে শিল্প বিস্তার প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ছিল প্রকাশ্য; উহার আর কোন ঢাকাঢাকি ছিল না। মার্কিন স্বাধীনতার যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার সহিত বৃটিশের সম্পর্ক যে মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হইত, যে মনোভাব আমেরিকার উপনিবেশের ভিতর ইস্পাত গলানো ফার্ণেস (অগ্নিকুণ্ড) সংস্থাপন একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল (এ্যাডাম্ স্মিথ—ওয়েল্‌থ অফ নেশন্‌স্, ৪র্থ ভাগ, ৭ম পরিচ্ছেদ, ২য় পৃঃ) সেই বৃটিশ নীতিই ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত—ভারতে চলিয়া আসিয়াছিল। "পুরাপুরি ভারতীয় প্রচেষ্টা" সম্পর্কে "যে সরকারী ঈর্ষার ভাব" ১৯১৪ সালের যুদ্ধ পর্য্যন্ত খোলাখুলিভাবেই বর্ত্তমান ছিল, সে সম্পর্কে স্যার ভেলেণ্টাইন শিরোল ১৯২২ সালে বলেন:

> "ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে আমাদের অতীত সব সময় খুব গৌরবজনক নহে; এবং কেবল যুদ্ধের প্রয়োজনের চাপে পড়িয়াই গভর্ণমেণ্ট পুরাপুরি ভারতীয় শিল্প প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাহার পূর্ব্বের আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব এবং ঈর্ষার মনোভাব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।
>
> (সার ভেলেণ্টইান শিরোল, অবজার্ভার, ২রা এপ্রিল, ১৯২২ সাল।)

তেমনি ১৯২১ সালের সরকারী বাৎসরিক রিপোর্টে লেখা হইল:

> "যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে শিল্পোন্নতির পথ দেখাইয়া দিবার জন্য কলকারখানা প্রতিষ্ঠা এবং সরকারী সাহায্যের দ্বারা ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের প্রচেষ্টাকে হোয়াইট হলে দাঁড়াইয়া ভালভাবেই নিরুৎসাহ করা হয়।"
>
> (মরেল এ্যাণ্ড মেটিরিয়েল প্রগ্রেস অব ইণ্ডিয়া—১৯২১, ১৪৪ পৃঃ)

স্যার জন হিউয়েট ১৯০৭ সালে বলিলেন:

> "বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প সম্পর্কিত শিক্ষার প্রশ্নটি গভর্নমেণ্ট এবং জনসাধারণের সম্মুখে বিশ বছরের অধিক কাল রহিয়াছে, বোধ হয় এমন আর কোন বিষয় নাই যাহা লইয়া এত বেশী লেখা বা বলা হইয়াছে এবং এত কম কাজ করা হইয়াছে।"
>
> (ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে যুক্ত প্রদেশের লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার জন হিউয়েটের উক্তি—১৯০৭)

ভারতীয় শিল্প প্রসারের প্রচেষ্টাকে হোয়াইট হল হইতে "ভাল করিয়া নিরুৎসাহিত করা" সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে যে ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ঘটে, লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ১৯০৫ সালে বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৮ সালে মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক একজন ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রিজ নিয়োগের পর। মাদ্রাজের শিল্প বিভাগের কার্য্যক্রম "স্থানীয় ইওরোপীয় ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে বিরোধিতা জাগাইয়া তুলিল। তাঁহারা ধরিয়া লইলেন যে, ইহা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের পক্ষে গুরুতর ভীতিজনক; এবং রাষ্ট্র কর্তৃক গভর্নমেণ্টের এলাকা বহির্ভূত ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ" (ভারতীয় শিল্প কমিশনের রিপোর্ট, পৃঃ ৭০)। ১৯১০ সালে এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার উপর সেক্রেটারী অব স্টেট লর্ড মর্লের স্বাক্ষরিত এক নির্দ্দেশের রূপে হোয়াইট হলের নিষেধাজ্ঞা নামিয়া আসিল।

> "প্রদেশের ভিতর নূতন শিল্প সৃষ্টির প্রচেষ্টা সম্পর্কে মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট যে বিবরণী দিয়াছেন তাহা আমি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি। উহার নজীরের ভিতর প্রচুর পরিশ্রম এবং চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও, উহা এমন কিছু নহে যাহাতে এই দিকে রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার সার্থকতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে; অবশ্য সে প্রচেষ্টা যদি শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং বাণিজ্যিক প্রচেষ্টার রূপ পরিহার করে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। যদি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করার মত কোন কিছু না করিয়া শিল্প সম্পর্কিত সংবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় অথবা এই রূপ কোন কেন্দ্র হইতে নূতন শিল্প সম্বন্ধে সংবাদ বা পরামর্শ প্রচার করা হয় তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"
>
> (লর্ড মর্লে, ১৯১০ সালের ২৯শে জুলাই তারিখের পত্র)

এই পত্রের "মারাত্মক ফলাফলের" কথা ভারতীয় শিল্প কমিশনের রিপোর্টে (পৃঃ ৪) লিপিবদ্ধ আছে।

ভারতের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিত করিয়া দেওয়া শুধু শাসকদের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উহার পিছনে আবার ছিল এক সুস্পষ্ট শুল্ক নীতি। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ এবং সপ্তম দশকে অতি দুর্ব্বল ভারতীয় তুলা শিল্প উন্নতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে এই বলিয়া আন্দোলন শুরু হইয়া গেল যে,......আমদানী শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হোক। তুলাজাত দ্রব্যাদি আমদানীর উপরেও এই শুল্ক দিতে হইত। ১৮৭৪ সালে ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক এই মর্ম্মে এক আরজি করা হয় এবং ১৮৭৭ সালে এ সম্পর্কে কমন্স সভায় এক প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব পাঠাইবার সময় লর্ড স্যালিসবারি খোলাখুলি ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া আতঙ্কিত ভাবে বলেন, "আরও পাঁচটি মিলের কাজ আরম্ভ হইতে যাইতেছে; ইহাও হিসাব করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ১৮৭৭ সালের মার্চ মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে ভারতে ১২৩১,২৮৪ টাকু চালু হইয়া যাইবে।" (গভর্নর জেনারেলের নিকট লর্ড স্যালিসবারির পত্র, ৩০শে আগস্ট, ১৮৭৭) কাজেই ১৮৭৯ সালে মোটা কাপড়চোপড়ের উপরে আমদানী শুল্ক তুলিয়া দেওয়া গেল; (এই সব জিনিসে প্রতিযোগিতা ছিল;) এবং ১৮৮২ সালে কেবল লবণ ও মদ ছাড়া অপর কোন জিনিসের উপর আর আমদানী শুল্ক রহিল না। ১৮৯৪ সালে আর্থনীতিক প্রয়োজনে যখন সমগ্রভাবে একটা আমদানী শুল্ক বসান হইল, যায় তুলাজাত দ্রব্যের উপরেও, তখন ভারতের মিলে তৈয়ারী সব কাপড় চোপড়ের উপরেও একটা আবগারী শুল্ক বসাইবার নূতন ফন্দী খুঁজিয়া বাহির করা হইল। কোন দেশের আর্থনীতিক ইতিহাসে এই ধরনের ফন্দিবাজীর আর তুলনা মিলিবে না। ১৮৯৬ সালে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে এই যে আবগারী শুল্ক বসান হইল, তাহা ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত পুরাদমে চলিতে থাকে; ১৯১৭ সালে আমদানী শুল্ক শতকরা সাড়ে তিন টাকা হইতে সাড়ে সাত টাকায় বাড়াইয়া আবগারী শুল্কের কুফল অংশতঃ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হয় ১৯২৫ সালে (তাহাও আবার মিল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের চাপে পড়িয়া)।

এই অবস্থায় ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত শিল্প বিস্তার খুবই ধীরে ধীরে হয়; উহার পরিমাণও খুবই সামান্য। ১৯১৪ সালের মধ্যে ফ্যাক্টরী আইনের ভিতর পড়িত মাত্র ৯৫১০০০ শ্রমিক। শিল্পের যেটুকু প্রসার দেখা গিয়াছিল, তাহাও

হইয়াছিল তুলা-শিল্প এবং পাট-শিল্পে। তুলা-শিল্পে ভারতীয় পুঁজি অগ্রসর হইয়া পথ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল এবং পাট-শিল্পের বেলায় বৃটিশ পুঁজি পাট-শিল্পে নিয়োজিত বৃটিশ শ্রমিকের দাবীর বিরুদ্ধে ভারতের সস্তা মজুরিকে একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিতেছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে ছিল মেরামত করার কারখানাগুলি—তাহাও প্রধানতঃ রেলওয়ের জন্য। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে লোহ ও ইস্পাত শিল্প কোনমতে আরম্ভ হইয়াছিল; যন্ত্রপাতির উৎপাদন মোটেই ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্ট নীতি একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়ার কথা ঘোষণা করিলেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে যেমন দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য বলিয়া বিঘোষিত হইল, আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও তেমনি শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারকেও লক্ষ্য বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইল।

বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১৫ সালে এই নূতন নীতি সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করিলেন:

"বৃহত্তর জাতিগুলির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যে তাহাদের আর্থনীতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে একথা যতই প্রতীয়মান হইয়া উঠিবে, ততই বিদেশী জাতিগুলি বাজার দখলের জন্য তীব্রভাবে প্রতিযোগিতা শুরু করিয়া দিবে। ভারতকে যদি এই সব জাতির তৈয়ারী মাল জমা করিবার আস্তানা না হইতে হয়, তাহা হইলে যুদ্ধের পর যে ভারতের শিল্প-শক্তির উন্নতির জন্য একটা সুনির্দ্দিষ্ট এবং আত্মসচেতন নীতি অবলম্বন করিতে হইবে—ইহা ক্রমশঃই অধিকতর রূপে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এ প্রশ্ন সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণের মনোভাব সর্ব্ববাদিসম্মত এবং উহার কথাও না ধরিয়া পারা যায় না।......

"যুদ্ধের পর পণ্যপ্রস্তুতকারী দেশ হিসাবে নিজের স্থান দখল করিবার জন্য তাহার গভর্নমেণ্টের সাধ্যানুযায়ী এবং অবস্থানুযায়ী সাহায্যের দাবী করিবার অধিকারী বলিয়া ভারত নিজেকে মনে করিবে।"

(ভারতের সেক্রেটারি অব্ স্টেটের নিকট লর্ড হার্ডিঞ্জের পত্র, ২৬শে নভেম্বর, ১৯১৫)

ইহার পর ইন্স্টিটিউট্ অব মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার্সের সভাপতি স্যার টমাস হল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে ১৯১৬ সালে ভারতীয় শিল্প কমিশন নিযুক্ত হইল। ১৯১৮ সালে উহার রিপোর্ট বাহির হইল। ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার

সম্পর্কে ১৯১৮ সালের মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টেও ঐ একই ভাবে উদ্দেশ্যের বিবরণী দেওয়া হইয়াছে :

"কেবল ভারতকে আর্থনীতিক স্থায়িত্ব দিবার জন্য নহে, তাহার অধিবাসীবৃন্দের আশা, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্যও, সকল দিক দিয়াই শিল্পোন্নতি সম্পর্কে একটা প্রগতিশীল নীতি প্রয়োজন।......

"আর্থনীতিক এবং সামরিক—এই দুই দিক দিয়াই সাম্রাজ্যের স্বার্থও এই দাবী করিতেছে যে, এখন হইতে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ আরও ভাল করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে, শিল্পোন্নত ভারত, সাম্রাজ্যের শক্তির সহিত আরও যে কতখানি শক্তি যোগাইতে পারিবে তাহার আমরা পরিমাপ করিতে পারি না।"

(মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট, পৃঃ ২৬৭)

এই বিঘোষিত নীতি পরিবর্ত্তনের কারণ যে আসিয়াছিল যুদ্ধের অবস্থার ভিতর হইতে তাহা সরকারী বিবৃতির মধ্যেই দেখা যায়। এ সম্পর্কে যুক্তির তিনটি প্রধান ধারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, সামরিক কৌশল সম্পর্কিত কারণাবলী। যুদ্ধের অবস্থা, যানবাহন, যোগাযোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থার বিপর্য্যয়, তাহার উপর মেসোপোটেমিয়ার কেলেঙ্কারীর কথাটাও এখানে একটা কম কারণ নয়—এই সবগুলি প্রাচীন ধরনের ভারত সাম্রাজ্য এবং প্রাচ্যে বৃটেনের সামরিক অবস্থার দুর্ব্বলতা উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। ইহার মূলে ছিল কি? ভারতে আধুনিক শিল্পের অত্যন্ত প্রাথমিক ভিত্তিটাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং কাজে কাজেই অত্যন্ত জরুরী সামরিক প্রয়োজনেও বহু দূর সাগর পার হইতে আনীত সরবরাহের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এই প্রয়োজনটি যে কি ভাবে বৃটিশ শাসকদের মনে রেখাপাত করিয়াছিল তাহা মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। "প্রাচ্য রণাঙ্গনের" ঘাঁটি হিসাবে ভারতকে আধুনিক করিয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই রিপোর্টে বলা হয় :

"সমুদ্র পথে যানবাহনের সম্ভাবনা সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায়, প্রাচ্যের রণাঙ্গনে রক্ষামূলক যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের একটি ঘাঁটি হিসাবে আমরা ভারতের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছি। যুদ্ধোপকরণগুলি সম্পর্কে আজকাল শিল্পোন্নত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রস্তুত দ্রব্যাদি পরিমাণে না হোক প্রকৃতি এবং গুণের দিক দিয়া খুব বেশী রকম মিলিয়া যায়। তাই আজ

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতিবিধান প্রায় সামরিক প্রয়োজনেরই সামিল হইয়া পড়িয়াছে।"

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতামূলক আর্থনীতিক কারণ। বিদেশী প্রতিযোগীরা ভারতের বাজারে বৃটিশের একচেটিয়া ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটেনের শিল্পের অবস্থা দুর্ব্বল হইয়া পড়ার দরুণ এ ভয়ও ছিল যে, যুদ্ধের পর বিদেশীরা দ্রুতগতিতে আরও অগ্রসর হইয়া পড়িবে এবং ভারতের বাজার বৃটিশের হাতছাড়া হইয়া যাইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ তো খোলাখুলি বলিয়াই দিয়াছিলেন,—বিপদটা হইতেছে এই যে, ভারত "বিদেশী জাতির পণ্য দ্রব্যের আস্তানা হইয়া উঠিবে।" ইহা নিবারণের জন্য একটা শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলে দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। প্রথমতঃ, ভারতের ভিতর্ শিল্পোন্নতির ফলে বিদেশী শিল্পপতিরা সরিয়া যাইবে বটে, কিন্তু আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের জোরে বৃটিশ তাহার পুঁজি খাটাইয়া শেষ মুনাফাটুকু বাহির করিয়া লইবার বেশী সম্ভাবনা পাইয়া যাইবে; বাজার অন্য কোন স্বাধীন বিদেশী পুঁজিবাদী শক্তির খপ্পরে গিয়া পড়িলে—সে সম্ভাবনা থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দ্বারা সাম্রাজ্যিক সুবিধাগ্রহণের (ইম্পিরীয়াল প্রেফারেন্স) পথ তৈয়ারী করা যাইতে পারে। ভারতের বাজার পুনরুদ্ধারের জন্য উহা বৃটেনকে সাহায্য করিবে।

তৃতীয়তঃ, ভিতরকার রাজনতিক কারণ। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে বিক্ষোভের সময় ভারতের উপর ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ভারতীয় মালিকশ্রেণীর সহযোগিতা লাভ করা ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়, যাহাতে তাহাদের সাহায্য পাওয়া যায় সেই জন্য আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক কয়েকটা সুবিধা এবং সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়াও দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই জন্যই বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—"ভারতের জনসাধারণের মনোভাবের কথাটাও না ধরিয়া পারা যায় না।"

এই নীতি পরিবর্ত্তন কাজে পরিণত করার জন্য যে রীতি ব্যবহৃত হয়, তাহা হইল একটা রক্ষামূলক শুল্ক ব্যবস্থার বিকাশসাধন। প্রথম ব্যবস্থা হইল তুলাজাত ছিট প্রভৃতির উপর শুল্ক বৃদ্ধি। ১৯১৭ সালে শুল্কের হার করা হইল শতকরা ৭½ টাকা, ১৯২১ সালে উহা বাড়িয়া হইল শতকরা ১১ টাকা; ১৯২৫ সালে একেবারে তুলিয়া না দেওয়া তক আবগারী শুল্ক কিন্তু রহিল শতকরা ৩½ টাকা। সাধারণ আমদানী শুল্ক বাড়াইয়া ১৯২১ সালে করা হইল শতকরা

১১ টাকা এবং ১৯২২ সালে শতকরা ১৫ টাকা। ১৯২১ সালে যে রাজস্ব কমিশন বসান হয় ১৯২২ সালে তাহার রিপোর্টে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দ্বারা "প্রভেদাত্মক রক্ষা ব্যবস্থার" স্বপক্ষে বলা হইল। পাঁচ জন ভারতীয় সদস্যের এক ''মতভেদ পত্রে" 'সম্পূর্ণ রক্ষাব্যবস্থার' হইয়া রায় দেওয়া হইল। রাজস্ব কমিশন যে শুল্ক বোর্ডের সুপারিশ করিয়াছিল, তাহা ১৯২৩ সালে বসান হয়। বড় প্রশ্নগুলির মধ্যে যেটি ইহার সম্মুখে প্রথমে আসে তাহা হইল লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পের জরুরি প্রশ্ন। ১৯২৪ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প শতকরা ৩৩/⅓ হারে রক্ষা-ব্যবস্থা লাভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে আবার সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হইল।

এই সময়ে সরকারের সাহায্যমূলক প্রগতিশীল নীতি সম্পর্কে ভারতের শিল্প-পুঁজির মালিকরা খুব আশান্বিত হইয়া উঠেন। এই সময়টা ছিল স্বরাজ পার্টি বা ভারতের প্রগতিশীল পুঁজিবাদের পার্টির যুগ। ইহাই ১৯২৩ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ নীতিকে পরাস্ত করিয়া ১৯২৩-২৬ সালে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রথমে ইহাদের নীতি ছিল ভিতর হইতে সংগ্রাম চালানর জন্য কাউন্সিলে প্রবেশ করা এবং পরে "সম্মানজনক সহযোগিতা।"

কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে শিল্প পুঁজির মালিকদের এই আশার উপর তীব্র আঘাত পড়ে।

৪। শিল্পোন্নতির পথে বাধা

১৯২৪ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে যে রক্ষামূলক ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় তাহাই ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধোত্তর-কালে শিল্পোন্নতি-কল্পে প্রদত্ত গভর্নমেন্টের সাহায্যের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। ইহার পর হইতে সাহায্যদানে ক্রমেই ভাটা পড়িয়া আসে।

প্রদেশে প্রদেশে বিস্তৃত প্রাদেশিক শাখা সহ ইম্পিরীয়াল ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাসট্রীজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় শিল্প কমিশনের বিস্তারিত পরিকল্পনার কিছুই হইল না। কেন্দ্রীয় সংগঠন কোন্‌দিনই প্রতিষ্ঠিত হইল না, আর প্রাদেশিক বিভাগগুলি, শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ "হস্তান্তরিত" বিষয়গুলির মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইল; অর্থাৎ এইগুলি টাকার অভাবে শুকাইয়া মরিতে লাগিল এবং নিষ্ক্রিয়তার দায়িত্বটা গিয়া পড়িল ভারতীয় মন্ত্রীদের ঘাড়ে। ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত

যে উন্নতি হইয়াছিল বাহিরের একজন সুযোগ্য পরিদর্শক তাহা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

"দুর্ভাগ্যবশতঃ কেন্দ্রীয় সংগঠন এখনও স্থাপিতই হয় নাই ; এবং ১৯১৯ সালের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সঙ্গে প্রাদেশিক সংগঠনকেও শিক্ষার ন্যায় "হস্তান্তরিত" বিষয় করিয়া দিয়া নির্ব্বাচিত আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল লোকাল গভর্নমেণ্টের হাতে দেওয়া হইয়াছে। ইহাও দুর্ভাগ্যের কথা যে, টাকা একেবারেই পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় খুব জরুরী কোন কার্য্যক্রমও চালু করা যায় নাই। তাহার উপর শিল্পকে উৎসাহ দিতে গেলে কেবল মাত্র কাঁচা মাল এবং উৎপাদন রীতি সম্পর্কে নহে, বাজার সম্পর্কেও একটা সুদূরপ্রসারী সুসম্বদ্ধ সরকারী নীতি থাকা প্রয়োজন। বস্তুতঃ শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতি এবং জাতীয় স্বার্থের সহিত জড়িত সকল জরুরী বিষয়ের সহিতই উহাকে সংশ্লিষ্ট থাকিতেই হইবে। ভারতে কেবল প্রাদেশিক আপিস খুলিলেই যে খুব বড় কিছু একটা ফল পাওয়া যাইবে—তাহাতে সন্দেহ আছে।"

(ডি. এইচ. বুকানন :"দি ডেভেলপমেণ্ট অব ক্যাপিটালিস্ট এণ্টারপ্রাইজ ইন ইণ্ডিয়া" ১৯৩৪, পৃঃ ৪৬৩-৬৪)

আরও পরে "শিল্প সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ ও গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় দফ্‌তর" প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন বছরের জন্য ইহার বরাদ্দ ছিল ৩৭ হাজার ৫ শত পাউণ্ড। ঘোষণা করা হইল প্রধানতঃ রেশমের চাষ এবং তাঁত শিল্পের উপরই ইহা মনোযোগ দিবে।

"এ পর্য্যন্ত যে বাস্তব ফলাফল ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা হইল এই যে, শিল্প সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ ও গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় দফ্‌তর প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। আগামী তিন বছরে ইহার উপর ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে এবং এই নূতন দফ্‌তরের কাজ হইবে রেশমের চাষ এবং তাঁত শিল্পের উপর মনোযোগ দেওয়া। বর্ত্তমান সময়ে যাহা সবচেয়ে বেশী দরকার সেই গুরু শিল্পকেই বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং দেশের আর্থনীতিক উন্নতির জন্য যদি দূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলেও উহা অনির্দ্দিষ্ট এবং রহস্যাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে।"

(স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া : "প্ল্যানড ইকনমি ফর ইণ্ডিয়া" ১৯৩৬ সাল, পৃঃ ২৪৭)

১৯২৪ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য রক্ষামূলক শুল্কের বন্দোবস্ত করিবার পর শুল্ক বোর্ড অন্যান্য শিল্পের নিকট হইতেও রক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য আরও

অনেক দরখাস্ত পাইয়াছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে সব দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই। তাহাদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল সিমেণ্ট ও কাগজ উৎপাদনের শিল্প। দিয়াশলাই শিল্পের বেলায় একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। উহা রক্ষামূলক শুল্কের সুযোগ পাইয়াছিল। দিয়াশলাই শিল্পে কিন্তু ভারতে বিদেশী পুঁজি খাটিতেছিল।

১৯২৭ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের রক্ষামূলক ব্যবস্থার নূতন করিয়া মেয়াদ বৃদ্ধির সময় যে ভাবে উহা বিচার করিয়া দেখা হইল তাহা আরও তাৎপর্য্যপূর্ণ। মৌলিক শুল্ক কমাইয়া দেওয়া হইল, অর্থ সাহায্য একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইল। সবচেয়ে জরুরী কথা এই যে, একটা নূতন নীতিই আমদানী হইয়া গেল—তাহা হইতেছে ইম্পিরীয়াল প্রেফারেন্সের নীতি—অর্থাৎ সুবিধাজনক হারে বৃটিশ মালপত্র ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে দিবার নীতি।

এই 'ইম্পিরীয়াল প্রেফারেন্স' এখন শুল্কব্যবস্থার প্রধান কথা হইয়া দাঁড়াইল। ১৯৩০ সালের মধ্যে তুলাজাত জিনিস ছিট ইত্যাদি ইম্পিরীয়াল প্রেফারেন্সের আওতায় আসিয়া পড়িল। ১৯৩২ সালে অটোয়া চুক্তি সম্পাদিত হইল এবং ভারতের সর্ব্বজনীন প্রতিবাদ এবং ভারতীয় আইন সভায় বিরোধিতা সূচক ভোট সত্ত্বেও ইম্পিরীয়াল প্রেফারেন্সের সাধারণ নীতি জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইল। ১৯৩১-৩২ সালে বৃটেন ভারত হইতে আমদানী করিত শতকরা ৩৫'৫ ভাগ, ১৯৩৪-৩৫ সালে উহাই বাড়িয়া হইল শতকরা ৪০'৬ ভাগ। জাপানী ও অন্যান্য অ-বৃটিশ তুলাজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক বাড়াইয়া শতকরা ৫০ টাকা করিয়া দেওয়া হইল (১৯৩৩ সালের তীব্র বাণিজ্যিক সংগ্রামের সময় উহা শতকরা ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল)—এবং বৃটেনে তৈয়ারী তুলাজাত পণ্যাদির উপর শুল্ক কমাইয়া করা হইল শতকরা ২০ টাকা। তুলা শিল্পে ইম্পিরীয়াল প্রেফারেন্সের বিরুদ্ধে ১৯৩১ সালে শুল্ক বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টকেও ডিঙ্গাইয়া কাজ করা হইল।

বৃটিশ শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক শক্তিকে সরাসরি সাহায্য দেওয়া ছাড়াও, ভারতের শুল্ক ব্যবস্থার ফলে বিদেশী স্বার্থেরই উপকার হইয়াছে; তাহাদের প্রায় সবই আবার বৃটিশ স্বার্থ। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, রক্ষামূলক ব্যবস্থার সুবিধা লইবার জন্য বড় বড় বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভারতে তাহাদের লেজুড়-কোম্পানী খুলিয়া ভারতের শিল্পোন্নতির পথের কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিককার শুল্ক ব্যবস্থা ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য করিবে বলিয়া গোড়াতে ঘোষণা করা হইলেও, পরের যুগে উহাই বৃটিশ শিল্পের সাহায্যকারী ইম্পিরীয়াল প্রেফারেন্সে রূপান্তরিত হইল। (উহার বদলে ভারতবর্ষ কাঁচা মাল ও আধা-কারখানাজাত মালপত্র রফতানী করিবার জন্য সুবিধাজনক রেট পাইল।—অর্থাৎ পিছন ফিরিয়া ১৯১৪ সালের আগেকার যুগের দিকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করা হইল।) ইহা যে শুল্ক ব্যবস্থার গুরুত্বকে বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট। ইম্পিরীয়াল প্রেফারেন্সের ফলে ভারতের মোটামুটি ক্ষতি হয় বলিয়া ১৯১৪ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতিক্রিয়াশীল কার্জ্জন গভর্নমেণ্ট পর্য্যন্ত উহার বিরোধিতা করিয়াছিল। ভারতের শিল্পপতিরা বিদেশী পণ্য প্রস্তুতকারকের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য যতটা সাহায্য চাহিতেন, ভারতের বাজারের সবচেয়ে বড় একচেটিয়া বৃটিশ ব্যবসাদার পণ্য প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে রক্ষামূলক ব্যবস্থা তাহার চেয়ে কিছু কম চাহিতেন না। বৃটিশ পুঁজিবাদ কিন্তু ভারতে এমন শুল্ক ব্যবস্থা চাহিত যাহাতে অবৃটিশ প্রতিযোগীরা ভারতের বাজারে তাহাদের অভিযান চালাইতে না পারে। ইহা হইতেই আসিল বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসের বাণিজ্যচুক্তি যখন ৬৬-৫৮ ভোটে পরাজিত হইল, তখনই ভারতের আইন সভার এই সংঘাত প্রত্যক্ষরূপ পরিগ্রহ করিল। উপরোক্ত চুক্তি অটোয়া-চুক্তিকে ইম্পিরীয়াল প্রেফারেন্সের প্রশস্ততর ব্যবস্থার ভিতর বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আইন সভার ভোটকে অগ্রাহ্য করিয়া চুক্তিকে জোর করিয়া কার্য্যকরী করিলেন। বিরোধিতাটা প্রকাশ্যেই আসিয়া পড়িল ; ১৯১৬-১৮ সালের "বদান্য" আবহাওয়া তখন অনেক দূরে।*

বৃহত্তর আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও ঐ এক রীতিই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের ঠিক পরে, ভারতের ব্যবসার বাজার অল্পকালের জন্য যেমন

* ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে যে নূতন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়, তৎসম্পর্কিত আলোচনার মধ্যেও এই সংঘাতের রূপ আরও দেখা যায়। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় আইন সভা কর্ত্তৃক এই চুক্তি ৫৯-৪৭ ভোটে অগ্রাহ্য করা হয় এবং 'কমিটি অব দি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স' ইহার বিরোধিতা করে। এবারেও কিন্তু আইন সভার ভোট অগ্রাহ্য করা হয় এবং ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের বিরোধিতা সত্ত্বেও বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এই বাণিজ্য চুক্তি কার্য্যকরী করে।

গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তেমন অন্যত্র হয় নাই। কাপড় ও পাটের কলগুলি এসময় প্রচুর মুনাফা করে। ১৯২০ সালের বোম্বাইয়ের বড় বড় কাপড়ের কলগুলি গড়ে শতকরা ১২০ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছিল; কোন কোন ক্ষেত্রে লভ্যাংশ শতকরা ২০০।২৫০ এমনকি ৩৬৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল (আরনো পিয়ার্স, "দি কটন ইণ্ডাসট্রি ইন ইণ্ডিয়া")। প্রধান প্রধান পাট কলগুলি গড়ে শতকরা ১৪০ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছিল। ইহাও কোন কোন ক্ষেত্রে আবার বোনাস সমেত শতকরা ৪০০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। একচল্লিসটি পাট কলের (এগুলি সবই বৃটিশ পরিচালিত এবং ইহাদের মূলধনের পরিমাণ হইল ৬১ লক্ষ পাউণ্ড) রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯১৮-২১ সালের মধ্যে রিজার্ভে ১৯০ লক্ষ পাউণ্ড রাখিয়াও তাহাদের মুনাফা দাঁড়াইয়াছে ২২৯ লক্ষ পাউণ্ড, অথবা ৪বছরে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনের উপর মোট ৪২০ লক্ষ পাউণ্ড আদায় আমদানী হইয়াছে।

এই পাহাড় প্রমাণ লাভে ভাগ বসাইবার আশায় যুদ্ধের ঠিক পরের বছরগুলিতে বৃটিশ মূলধন বন্যার বেগে ভারতে প্রবেশ করে। পূর্ব্বে স্যার জর্জ পেইস হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ১৯০৮-১০ সালে ভারতে এবং সিংহলে গড়ে ১৪০ হইতে ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড বৃটিশ মূলধন রফতানী হয়; উহা হইল রফতানী করা সমস্ত বৃটিশ মূলধনের শতকরা ৯ ভাগ। ১৯২১ সালে উহা বাড়িয়া হয় ২৯০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ সমস্ত রফ্‌তানীকৃত মূলধনের চার ভাগের এক ভাগেরও বেশী; ১৯২২ সালে ৩৬০ লক্ষ পাউণ্ড, এবারেও চার ভাগের এক ভাগের বেশী, এবং ১৯২৩ সালেও উহা ছিল ২৫০ লক্ষ পাউণ্ড অথবা পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ১৯২০-২১ এবং ১৯২১-২২ এই দুই বৎসরে আমদানী মোটমাট কিছু বেশী হয়। ১৮৫৬-৬২ সাল হইতে অর্থাৎ রেলপথে টাকা খাটাইবার সময় হইতে এই মাত্র একবার এইরূপ হইল। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে টাকার দর দুই শিলিংয়ের মত চড়া হারে বাঁধিয়া দিবার সরকারী চেষ্টার সর্ব্বনাশা ফলই ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে। তাহার ফলে ভারতে আমদানীর উপর একটা প্রিমিয়াম আসিয়া গেল। ভারতীয় রফ্‌তানী-কারকদের কপাল পুড়িল এবং এই বিনিময় হার রক্ষা করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় গবর্নমেণ্টকে কমসে-কম ৫৫০ লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইল।

কিন্তু ১৯২০ সালের শেষদিক এবং ১৯২১ সাল হইতে সর্ব্বনাশ শুরু হইয়া গেল। গবর্নমেণ্টের বিনিময় নীতি উহাকে আরও ঘোরাল করিয়া তুলিল।

টাকা পিছু ছুই শিলিং হার ত্যাগ করিয়া হঠাৎ টাকা পিছু এক শিলিং চার পেন্স বিনিময় হার প্রবর্ত্তিত হওয়ায় আমদানী-কারকদের সর্ব্বনাশ হইল এবং ৩০০ লক্ষ পাউণ্ডেরও উপর ঘাটতি পড়িয়া গেল। যুদ্ধের পর বাজার চড়িয়া যাওয়ার সময় সে যব কোম্পানী খোলা হইয়াছিল, তাহারা ইহার পর দেউলিয়া হইয়া পড়িল। যেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে, যুদ্ধের পরের চড়া বাজারের অস্বাভাবিক মুনাফা বজায় রাখা আশা করা যাইতে পারে না, অমনি কিন্তু বৃটিশ মূলধনের স্রোত শুকাইয়া গেল। ১৯২৪ সালে উহা কমিয়া দাঁড়াইল মোট ২৬ লক্ষ পাউণ্ড, অথবা সেই বৎসরের মোট বৃটিশ আমদানী মূলধনের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ; ১৯২৫ সালে হইল ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯২৬ সালে ২০ লক্ষ পাউণ্ড, এবং ১৯২৭ সালে ১০ লক্ষ পাউণ্ডেরও কম অর্থাৎ বৃটিশ আমদানী মূলধনের শতকরা ১ ভাগের অর্দ্ধেকেরও কম।

যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং পরে ভারত ও সিংহলে বৃটিশ মূলধন রফ্‌তানীর যে হিসাবপত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে অনেক কিছু বোঝা যায়। (যুদ্ধপূর্ব্ব হিসাবগুলি স্যার জর্জ পেইস-এর। যুদ্ধের পরের হিসাবগুলি মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের কাগজপত্র হইতে পাওয়া)।

ভারত এবং সিংহলে বৃটিশ মূলধন রফ্‌তানী

বাৎসরিক গড়	ভারত এবং সিংহলে প্রেরিত	সাগর পারে প্রেরিত	শতকরা ভারত এবং সিংহলে প্রেরিত
১৯০৮-১০	১৪৭ লক্ষ পাউণ্ড	১৭২৩ লক্ষ পাউণ্ড	৮.৫%
১৯২১-২৩	৩০২ " "	১২৯০ " "	২৩.৭%
১৯২৫-২৭	২১ " "	১২০৯ " "	১.৭%
১৯৩২-৩৪	৪২ " "	১৩৫১ " "	৩.১%
১৯৩৪-৩৬	১০ " "	৩০২ " "	৩.৩%

যুদ্ধের পরে অল্প দিন চড়া বাজার ছিল, কিন্তু বাজার বাড়িয়া যাইবার পর অনুপাতও যুদ্ধের আগের চেয়ে নামিয়া গিয়াছে।

সরকারী হিসাব মত ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত কোম্পানীগুলির মোট মূলধনের হিসাব হইতেও ইহার চেয়ে কম কিছু শেখা যায় না।

বৃটিশ ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত কোম্পানী-সমূহের আদায়ীকৃত মূলধন

ব্রহ্মদেশ বাদ দিয়া

	১৯১৪-১৫	১৯২৪-২৫	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৯-৪০
দশ লক্ষ টাকার হিসাবে	৭৪৪	২৩৯৮	২৬৬৬	২৮৮৫

১৯১৪ হইতে ১৯২৪ সাল—এই দশ বছরের ভিতর শতকরা ২২২ ভাগ অথবা গড়ে বছরে শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহার পরের দশ বছরে অর্থাৎ ১৯২৪ হইতে ১৯৩৪ সালের ভিতর বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা মাত্র ১১ ভাগ অথবা গড়ে বছরে ১ ভাগ। ১৯৩৪-৩৯ এই পাঁচ বছরে বাৎসরিক গড় ছিল শতকরা মাত্র ১'৫ ভাগ। মূল্য স্তরের পরিবর্ত্তন যে এই হিসাব পত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সে কথা ধরিয়া লইলেও, প্রভেদটা চোখে পড়িবার মত। যুদ্ধের পর অল্প দিন বাজার চড়া থাকিবার পর যে ধাক্কাটা লাগে, তাহার হাত এড়ান ছিল অসম্ভব।

১৯২৭ সালে 'স্ট্যাটিস্ট' পত্রিকা ১৯১৪ সালের হিসাবকে ১০০ ধরিয়া, ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত বৃটিশ কোম্পানীগুলির পুঁজির এক সূচক-সংখ্যা প্রকাশ করে।

বৃটিশ ভারতে নিয়োজিত নূতন পুঁজি

প্রত্যেক বৎসরে রেজেষ্ট্রীকৃত কোম্পানী সমূহের মূলধনের	১৯১৪	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৫	১৯৩৭
সূচক-সংখ্যা	১০০	২২১	১২১	৫১	৪০	৩১	৪৫	২৯

১৯১৪ সালের স্তর হইতে এই দ্রুত অধঃপতন সম্পর্কে লণ্ডনের এক অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা মন্তব্য করে:

> "দেশের আর্থনীতিক উন্নতির পথে একটা সুস্পষ্ট বাধাবিপত্তিই যে এই হিসাবের ভিতর প্রতিফলিত হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এইভাবে হটিয়া যাওয়ার জন্য ভারত গবর্নমেণ্টের মুদ্রা ও বিনিময় নীতিকে একেবারে দোষমুক্ত বলা যায় না।"

(স্ট্যাটিস্ট, ৬ই আগস্ট, ১৯২৭)

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বিশ্ব-সঙ্কটের পূর্ব্বেই ভারতের শিল্পোন্নতির পথে বাধাবিপত্তির চিহ্ন বেশ ভাল করিয়াই দেখা গিয়াছিল। ১৯২০-৩০ সালের মাঝামাঝি ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি খুব কষ্টের ভিতর দিয়াই কাটায়। বস্ত্র শিল্পের কথা বাদ দিলে শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে ভারতীয় মূলধনের অগ্রগতির নেতা হইল টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী। ১৯২৬ সালে সেই কোম্পানীই দেখিল যে, তাহার ১০০ টাকার শেয়ারের দর পড়িয়া দাঁড়াইয়াছে দশ টাকায়। ফলে উহা ২০ লক্ষ পাউণ্ড ডিবেঞ্চারের জন্য লণ্ডনের বাজারে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল। যুদ্ধের পরে গোড়ার দিকের বছরগুলিতে সাময়িক ভাবে রাশ আলগা করিয়া দিয়া, বৃটিশ পুঁজি এই সময়ে ভারতীয় ব্যবসায়ের উপর তাহার মুঠি শক্ত করিয়া ধরে।

ভারতের আর্থিক ও মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কিত হিলটন ইয়ং কমিশনের (১৯২৬) রিপোর্টের পরে ১৯২৭ সালে যুদ্ধের আগেকার ১ শিলিং ৪ পেন্সের বদলে ১ শিলিং ৬ পেন্সে টাকার দর ঠিক কবিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ভারতীয় শিল্পের উপর আরও এক তীব্র আঘাত আসিয়া পড়িল। ভারতের ধনকুবেরদের মতের সর্ব্ববাদিসম্মত প্রতিবাদের সামনেই মুদ্রাসঙ্কোচের এই নীতি কার্য্যে পরিণত করা হইল। ভারতীয় পুঁজিবাদীদের নেতা স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস তাঁহার কারেন্সী কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে মতভেদ সূচক মন্তব্যে বলেন, "ইহা ভারতীয় পণ্য প্রস্তুতকারকের উপর তাহার সহ্যের অতীত আঘাত হানিবে। দেশের লোকসংখ্যার পাঁচ ভাগের চার ভাগ—যাহারা কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে, তাহাদেরও ইহা প্রচণ্ড আঘাত করিবে।" সঙ্গে সঙ্গে আবার, ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ছাড়াও, হিলটন ইয়ং কমিশনের সুপারিশ মত এক নূতন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এইভাবে ভারতীয়দের প্রভাবের সুদূর সম্ভাবনা হইতে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরাইয়া লইবার বন্দোবস্ত করা হইল। ভারতীয় জনমতের দীর্ঘকালীন বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবস্থা ইতিমধ্যেই ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাথমিক প্রয়োজনের উৎপাদনের উপর ভারত একান্ত ভাবে নির্ভরশীল ছিল বলিয়া বিশ্বের আর্থনীতিক সঙ্কট অন্যান্য বড় বড় দেশগুলির চেয়ে ভারতের উপরই আরও

জোরে আসিয়া পড়িল। প্রাথমিক প্রয়োজনের দ্রব্যাদির উৎপাদনের উপরই ভারতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ লোক কার্য্যত নির্ভরশীল। সেই সব প্রাথমিক উৎপাদনের মূল্যই অর্দ্ধেক হইয়া গেল। ১৯২৮-২৯ এবং ১৯৩২-৩৩ সালের মধ্যে ভারতের রফ্‌তানী করা পণ্যের মূল্য ৩৩৯ কোটি টাকা হইতে ১৩৫ কোটি টাকায় আসিয়া ঠেকিল, ভারতের আমদানীর মূল্যও ২৬০ কোটি টাকা হইতে ১৩৫ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু কর, ঋণের উপর সুদ এবং হোম চার্জ বাবদ মোটা টাকা নির্ম্মমভাবে আদায় করা হইতে লাগিল। এদিকে দর পড়িয়া যাওয়ার ফলে উহা দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছিল। পাওনা টাকা দেওয়া স্থগিত রাখিবার ন্যায্য অধিকার ভারতের ছিল না; হুভারের কল্যাণে ইওরোপ সে সুবিধা পাইয়াছিল। জার্মানীর ন্যায় অর্থ আটক রাখার সুবিধা ভারত পায় নাই। বৃটেন যেভাবে মার্কিন ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, ভারত তাহাও পারে নাই। সোনা দিয়াই ভারতকে আর্থিক দায় মিটাইতে হইল। ১৯৩১-৩৫ সালের মধ্যে ২০৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ৩২০ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ (ইকনমিস্ট, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৩৬) অর্থাৎ সঙ্কটের পূর্ব্বে বৃটেনের সংরক্ষিত স্বর্ণ ভাণ্ডারের মোট পরিমাণেরও অধিক স্বর্ণ ভারত হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইল। ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালের মধ্যে আরও ৩৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ভারত হইতে রফ্‌তানী হইয়া যায় (ইকনমিস্ট, ২রা এপ্রিল, ১৯৩৮)। অর্থাৎ ১৯৩১-৩৭ এই সাত বৎসরের মধ্যে মোট ২৪১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ভারতের বাহিরে চলিয়া গেল। ভারতের জনসাধারণের কাছে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা বা অন্য কোন উপায়ে টাকা সঞ্চয় করার রীতি অপরিজ্ঞাত ছিল। কাজেই যে ঋণ দেশের বাহিরে চলিয়া গেল তাহা হইল দেশের কৃষক সমাজের এবং গরীব লোকদের সামান্য সঞ্চয়। ১৯৩১-৩৭ সালের ভিতর এইভাবে ভারতের স্বর্ণ বাহিরে পাঠাইয়া বৃটিশ পুঁজিপতিরা বৃটেনের স্বর্ণ ভাণ্ডার ফাঁপাইয়া তুলিবার জন্য দরিদ্র ভারতীয় কৃষকের সামান্য সঞ্চয় বৈজ্ঞানিক পন্থায় টানিয়া লইলেন। ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্টারন্যাশনাল সেট্‌লমেণ্টের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৩২ সালের শেষে বৃটিশের সংরক্ষিত স্বর্ণ ভাণ্ডারের মূল্য ছিল ৩০২১০ লক্ষ সুইডেনের স্বর্ণ ফ্রাঙ্ক; ১৯৩৬ সালের শেষে উহারই মূল্য হয় ৭৯১১০ লক্ষ সুইডেনের স্বর্ণ ফ্রাঙ্ক। এক্ষেত্রে বৃদ্ধির অনুপাত হইল শতকরা ১৬২ ভাগ। শিল্প-বিপ্লবের দিন-

গুলির মত আবার এক নূতন রূপে ভারতকে লুণ্ঠন করিয়াই ১৯৩৬-৩৭ সালে বৃটিশ পুঁজিবাদ সামলাইয়া সারিয়া উঠিল।

১৯৩৬ সালের শেষে "ইকনমিস্ট" পত্রিকার ভারত সম্পর্কিত ক্রোড়পত্রে "শিল্প প্রবর্ত্তনের" অগ্রগতি সম্পর্কে লিখিত হইল :

> "শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত কমের দিকেই গিয়াছে, এবং কোন কোন শিল্পে বিশেষ করিয়া পাট এবং বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কোনো কোনো বৎসরে খুবই কমিয়া গিয়াছে।...
>
> "ভারতবর্ষ তাহার শিল্পকে আধুনিক করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে-দেশে এখন 'শিল্পোন্নয়ন' চলিতেছে এমন কথা বলা যায় না।"

(ইকনমিস্ট পত্রিকার ভারত সম্পর্কিত ক্রোড়পত্র "এ সার্ভে অব ইণ্ডিয়া) টু-ডে", ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬]

৫। যুদ্ধের পূর্ব্বের বিশ বৎসরের হিসাব নিকাশ

এখন শিল্পোন্নয়নের আসল গালভরা প্রতিশ্রুতিগুলির কথা স্মরণে রাখিয়া, দুই মহা-যুদ্ধের ভিতরকার বিশ বছরের ভারতীয় আর্থিক উন্নতির ফলাফলের জমা খরচ লওয়া যাক।

এই বিশ বছরের ভিতর সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিস্ট শিল্পো-ন্নয়নের জয় বিঘোষিত হইয়া গিয়াছে—ইওরোপ এবং এশিয়ার সকল দেশে সেই শিল্পোন্নতি ছাড়াইয়া গিয়াছে। ভারতেও এই সময়ে কিছু শিল্পোন্নতি নিঃসন্দেহে হইয়াছে; ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে সরকারী বৃটিশ-বিরোধিতার সামনেই শিল্পের যে অগ্রগতি শুরু হইয়া গিয়াছিল, এ সময়ে তাহাই আরও কতকটা আগাইয়া গিয়াছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ বজারের স্তরে উপনীত হইবার পথে কতকগুলি শিল্পের অভিযান শুরু হইয়া গিয়াছে। ১৯১৪ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলি ভারতে ব্যবহৃত মিলের-তৈয়ারী তুলাজাত দ্রব্যাদির চার ভাগের এক ভাগ প্রস্তুত করিত, ১৯৩৪-৩৫ সালে কিন্তু তাহারা চার ভাগের তিন ভাগ চাহিদা মিটাইতে পারিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের ইস্পাত শিল্প কেবলমাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল বলিলে চলে, ট্যারিফ বোর্ডের ১৯৩৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাহাই ১৯৩২-৩৩ সালের মধ্যে ভারতের ইস্পাতের বাজারের চার ভাগের তিন ভাগ প্রয়োজন

মিটাইয়াছে। অবশ্য অনুন্নত শিল্পবৃদ্ধির মান নীচু থাকার দরুণ ভারতের ইস্পাতের বাজার যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, তাহারই পরিচয় এবং পরিমাপ ইহার ভিতর পাওয়া যাইতেছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতে ৮ লক্ষ ৭৯ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়; এত বেশী ইস্পাত আর কখনও উৎপন্ন হয় নাই। ঐ বছর কিন্তু পোল্যাণ্ডের মত দেশও ইহার চেয়ে বেশী ইস্পাত উৎপন্ন করিয়াছিল, অথচ পোল্যাণ্ডের জনসংখ্যা হইল ভারতের জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগেরও কম। জাপানে ঐ বছর যত ইস্পাত উৎপন্ন হয় ইহা তাহার ছয় ভাগের এক ভাগেরও কম, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের উৎপাদনের উনিশ ভাগের এক ভাগ।

বস্ত্র শিল্পের উন্নতি শিল্পবিস্তারের চূড়ান্ত লক্ষণ নহে; বস্ত্র শিল্প তো ১৯১৪ সালের পূর্ব্বেই ভারতে নিজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিয়াছিল। শিল্প বিস্তারের চূড়ান্ত নিদর্শন মিলে গুরু শিল্প, লৌহ, ইস্পাত এবং যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ শিল্পের উন্নতির ভিতর। যুদ্ধের পূর্ব্বে এইখানেই ছিল ভারতের দুর্ব্বলতা। এখনও কিন্তু ভারতকে যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশের উপরই নির্ভর করিতে হইল।

> "বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত কলকারখানায় লোকজনের ভীড় হইলেও ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বস্ত্র-শিল্পের প্রকৃতি গৃহ-শিল্পের প্রকৃতির ন্যায়। একটা কাপড়ের কলে তাঁতের পর তাঁত বা টাকুর পর টাকু যোগ দেওয়া হয়। মেরামতী কারখানার ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত ব্যক্তিগত ব্যাপার। লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প সাফল্য লাভ করিতে আরম্ভ করিলে, তবে দেশে আসল পরিবর্ত্তন আসে।...ধাতব শিল্পগুলির উন্নতির অর্থ হইল আসল শিল্প বিস্তার। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহারা সকলেই কাপড়ের কলকারখানা স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই আধুনিক ভাবে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠা করে।"
>
> (এল. সি. এ. নোলস: "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অব দি ওভার সীজ এমপায়ার," পৃঃ ৩৪৩

প্রকৃত শিল্প বিস্তারের জন্য যে কার্য্যক্রম প্রয়োজন, তাহা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরাট শিল্প বিপ্লবের ভিতর আরও ভাল করিয়া দেখা যায়। এখানে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরু শিল্পের উন্নতির উপর মনোযোগ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় লঘু শিল্পেও সেই উন্নতি

টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। **ভারতবর্ষে যাহা দেখা যায়, তাহা হইল পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশের উল্টা ধরণের আর্থনীতিক উন্নতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।**

এই সময়কার শিল্প এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যার অনুপাতের সহিত ১৯১৪ সালের পূর্ব্বের হিসাব তুলনা করিয়া দেখিলে, শিল্পোন্নতি যে কত নীচু স্তরে ছিল, তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। আদম শুমারীর হিসাব অনুযায়ী, ১৯১১ এবং ১৯৩১ সালের মধ্যে শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত হিসাব অনুযায়ী শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকের অনুপাত ১৯১১ সালের শতকরা ১১.২ হইতে কমিয়া ১৯২১ সালে হয় শতকরা ১০.৪৯ এবং ১৯৩১ সালে দাঁড়ায় শতকরা ১০.৩৮।

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রকৃত সংখ্যার সরকারী হিসাব আরও বেশী প্রনিধানযোগ্য।

মেহনতকারী লোকের মোট সংখ্যার অনুপাতে অব্যাহত গতিতে এবং আপেক্ষিক ভাবে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা যে কমিয়া যাইতেছে তাহা এই হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত

(১৯১১—৩১)

	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯১১-৩১ সালের মধ্যে—ব্যতিক্রমের হার (শতকরা)
জনসংখ্যা (দশ লক্ষের হিসাবে)	৩১৫	৩১৯	৩৫৩	১২.১
মেহনতকারীর লোকসংখ্যা (দশ লক্ষের হিসাবে)	১৪৯	১৪৬	১৫৪	৪.০
শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা (দশ লক্ষের হিসাবে)	১৭.৫	১৫.৭	১৫.৩	—১২.৬
মেহনতকারী লোকের তুলনায় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের শতকরা অনুপাত	১১.৭	১১.০	১০.০	—৯.১
মোট জন সংখ্যার তুলনায় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের শতকরা অনুপাত	৫.৫	৪.৯	৪.৩	—২১.৮

কাজেই এই বিশ বছরের মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কুড়ি লক্ষেরও অধিক কমিয়া গিয়াছে। জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ১২ ভাগ, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত শতকরা ১১ ভাগেও অধিক হারে কমিয়া গিয়াছে এবং মোট জনসংখ্যার তুলনায় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত পাঁচ ভাগের এক ভাগেরও অধিক হ্রাস পাইয়াছে।

১৯১১ সাল হইতে প্রধান প্রধান শিল্পগুলির হিসাবেও শ্রমিক সংখ্যা হ্রাসের ঐ একই চিত্র দেখা যাইবে।

প্রধান শিল্পগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাসের হিসাব

	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
বস্ত্র শিল্প	৪,৪৪৯,৪৪৯	৪,০৩০,৬৭৪	৪,১০২,১৩৬
পোশাক এবং প্রসাধন শিল্প	৩,৭৪৭,৭৫৫	৩,৪০৩,৮৪২	৩,৩৮০,৮২৪
কাঠ	১,৭৩০,৯২০	১,৫৮১,০০৬	১,৬৩১,৭২৩
খাদ্য শিল্প	২,১৩৪,০৪৫	১,৬৫৩,৪৬৪	১,৪৭৬,৯৯৫
মৃৎপাত্রাদি নির্ম্মাণ শিল্প	১,১৫৯,১৬৮	১,০৮৫,৩৩৫	১,০২৪,৮৩০

কাজেই যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের আসল চিত্র যাহা ছিল তাহাকে "শিল্পের উচ্ছেদ" বলাই ঠিক হইয়াছে। অর্থাৎ এই সময়ে পুরাতন হস্ত-শিল্পের অবনতি হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আধুনিক শিল্পের উন্নতি হয় নাই। কলকারখানার প্রসার হস্ত-শিল্পের ক্ষয়কে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। যে ক্ষয় উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা বিংশ শতাব্দীতে এবং ১৯১৮ সালের পরেও চলিয়াছে।

কাজেই এই সিদ্ধান্ত এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমলে ভারতের "শিল্পবিস্তারের" চিত্র এক কল্প-কাহিনী মাত্র। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধুনাতন যুগেও কৃষিক্ষেত্রে লোকবাহুল্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

> "অল্প কয়েকটি যে শিল্প কেন্দ্র আছে তাহারা বড় হইলেও, কলকারখানা হইবার পূর্ব্বে, হস্ত-শিল্পের উপর যত লোকে নির্ভর করিত, কারখানাগুলি তাহার চেয়ে কম লোককেই প্রত্যক্ষ সাহায্য দিয়া থাকে। দেশ এখনও বছরে রপ্তানীর চেয়ে অনেক বেশী পণ্যাদি আমদানী করিতেছে। অনুপাত ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন হইতে থাকিলেও, এখনও ভারতের আর্থনীতিক

জীবনের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ভারত কাঁচা মাল রফ্‌তানী করে এবং আমদানী করে তৈয়ারী জিনিস। ভারতের কলকারখানাগুলি থাকা সত্ত্বেও এবং তাহার জীবন যাত্রার মান নীচু থাকা সত্ত্বেও, তৈয়ারী জিনিসের বেলায় ভারত আজ এক শতাব্দী পূর্ব্বের চেয়েও কম আত্মনির্ভরশীল"।

(ডি. এচ. বুকানন: "ডেভেলপমেণ্ট অব ক্যাপিটালিস্ট এন্‌টারপ্রাইজ ইন্ ইণ্ডিয়া" ১৯৩৪, পৃঃ ৪৫১)

যাহারা ফ্যাক্টরী আইনের আওতায় পড়ে ১৯৩১ সালে তেমন শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ অথবা মেহনতকারী লোকদের শতকরা এক জনেরও কম। ইহার সহিত ২ লক্ষ ৬০ হাজার খনি-শ্রমিক এবং ৮ লক্ষ ২০ হাজার রেল শ্রমিক যোগ দিলেও, আধুনিক শিল্পে নিযুক্ত মোট ২৬ লক্ষ শ্রমিক মেহনতকারী লোকদের শতকরা মাত্র ১½ জনে আসিয়া ঠেকে।

শুধু তাহাই নহে; ১৯১৪ সাল হইতে শিল্পোন্নতির হার (দ্রুত শিল্প-বিস্তারের কথা দূরে থাক), কোন কোন দিক দিয়া ১৯১৪ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের শিল্প বিস্তারের তুলনায় কমিয়াই গিয়াছে। ফ্যাক্টরী আইনের আওতায় যাহারা পড়ে, তেমন শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র নিম্নলিখিত হিসাবে পাওয়া যাইবে। (১৯২২ সাল পর্য্যন্ত, যে সব প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ বা তাহারও বেশী শ্রমিক কাজ করিত, তাহারাই এই আইনের ভিতর পড়িত, তাহার পর হইতে, যে সব প্রতিষ্ঠানে কুড়ি বা তাহারও বেশী, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দশ বা তাহারও বেশী শ্রমিক কাজ করে, তাহারাও আইনের আমলে আসিয়া পড়িয়াছে। উপরোক্ত পরিবর্ত্তন যুদ্ধোত্তর যুগের হিসাবের বেলাতেই বেশী করিয়া পাওয়া যায়; কাজেই উহাতে আমাদের যুক্তি আরও জোরাল হইয়া উঠিয়াছে।)

কলকারখানায় শ্রমিকের গড়পড়তা দৈনিক সংখ্যা

১৮৯৭	৪২১,০০০
১৯০৭	৭২৯,০০০
১৯১৪	৯৫১,০০০
১৯২২	১,৩৬১,০০০
১৯৩১	১,৪৩১,০০০

১৮৯৭ হইতে ১৯১৪, এই সতের বছরের ভিতর কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র ৫৩০০০০ জন।

১৯১৪ হইতে ১৯৩১, এই সতের বছরের ভিতর কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র ৪৮০,০০০ জন।

কাজেই ১৯১৪ সালের আগেকার যুগের চেয়ে, ১৯১৪ সালের পরের যুগে বৃদ্ধির হার শুধু যে বেশ কমই ছিল তাহা নহে, মোট (absolute) বৃদ্ধিও ছিল কম।

বস্ত্র শিল্পে উন্নতি সব চেয়ে বেশী নজরে পড়িলেও, এই শিল্পেও ভারতের উন্নতি জাপান বা চীনের চেয়ে ঢের কম হইয়াছে। ১৯১৪ এবং ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারত, জাপান এবং চীনে টাকুর আপেক্ষিক সংখ্যা বৃদ্ধির পরিচয় নিম্নলিখিত হিসাবে পাওয়া যাইবে।

স্তা কাটিবার টাকুর সংখ্যা

	১৯১৪	১৯৩০	বৃদ্ধি
ভারত	৬,৩৯৭,০০০	৮,৮০৭,০০০	২,৪১০,০০০
জাপান	২,৪১৪,০০০	৬,৮৩৭,০০০	৪,৪২৩,০০০
চীন	৩০০,০০০	৩,৬৯৯,০০০	৩,৩৯৯,০০০

ভারতবর্ষে শতকরা ৩৭ ভাগ বাড়িয়াছে। জাপান ও চীনে ঐ একই সময়ে বৃদ্ধির হার হইতেছে শতকরা ১৮৮ ভাগ। চীন ও জাপানের টাকু জড়াইয়া ধরিয়াও যত হয় ১৯১৪ সালে তাহার দ্বিগুন টাকু ভারতবর্ষের ছিল। ১৯৩০ সালে জাপান ও চীন মিলিয়া ভারতকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়াছে। (চীনের উন্নতির অনেকখানিই হইয়াছিল জাপানীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে)।

সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ভারতে শিল্পবিস্তারের এই শ্লথগতির কারণ কি? আর্থনীতিক উন্নতির গতি রুদ্ধ হওয়ার জন্য ভারতের সমগ্র সামাজিক কাঠামোর ভিতর অনেক কারণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রধান কারণ নিহিত আছে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ভিতরেই। সেই ব্যবস্থার কার্য্যক্রম স্বতঃই স্বাধীন শিল্পোন্নতির বিরোধী। কাজেই ভারতের জনগণের যে শক্তি অন্য সব বাধা-বিপত্তিকে অভিভূত এবং অতিক্রম করিতে পারিত, তাহাকেই এই ব্যবস্থা শিথিল করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য শিল্পবিস্তারের সকল স্বপ্ন এবং প্রতিশ্রুতি ক্রমাগতই এই বিহ্বলকারী অসঙ্গতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতির আর্থনীতিক উন্নতি রুদ্ধ করা ও পিছাইয়া দিয়া উহা নিষ্ফল করাই হইল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের রীতি।

এই অসঙ্গতি এবং বিরোধ কেবল ভারতের শিল্পোন্নতিবিরোধী শক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ শক্রতার মধ্যেই নাই। যে কোন উপায়ে ভারতের বাজারে বৃটিশের ক্রমক্ষীয়মান অংশ রক্ষা এবং উহার বৃদ্ধি সাধনের সাফল্যের মধ্যেই শুধু উহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় এমন নহে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভিতর ভারতীয় শিল্পের আভ্যন্তরীণ বাজারের সমাধানহীন সমস্যা এবং কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার চরম দারিদ্র্যের ভিতরই এই অসঙ্গতি বিরাজ করিতেছে। শুল্ক ব্যবস্থা উহার সমাধান করিতে পারে না, বরং কৃষক সম্প্রদায়ের ঘাড়ে নূতন বাড়তি বোঝা চাপাইয়া অসঙ্গতি এবং বিরোধ আরও বাড়াইয়া তোলে। **কৃষির যে প্রশ্ন রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত্তিমূলে, তাহাকে বাদ দিয়া শিল্পের প্রশ্নের কোন জবাব মিলিবে না।** শেষ কথা এই যে, যে বৃটিশ 'ব্যাঙ্ক-পুঁজি' প্রত্যেকটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিজের আধিপত্য আঁকড়াইয়া রাখিয়া ভারতের শিল্প প্রচেষ্টাকে তাহার দয়ার সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে, সেই ব্যাঙ্ক-পুঁজির কৌশলপূর্ণ আধিপত্যের ভিতরেও এই অসঙ্গতি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

৬। ব্যাঙ্ক-পুঁজির ফাঁস

ভারতবর্ষের বাহিরে ভারত প্রসঙ্গে শিল্পবিস্তার, শুল্কের সুবিধা এবং ভারতের বাজারের উপর বৃটিশের মুঠি শিথিল হইয়া যাইবার কথা লইয়া অযথা অনেক বাগবিস্তার হইয়াছে; কিন্তু ভারতের অর্থনীতির উপর বৃটিশ ব্যাঙ্ক-পুঁজির মুঠি আসলে যে আরও জোরে চাপিয়া বসিতেছে এবং ভারতের উন্নতির বিরুদ্ধে উহা বজায় রাখিবার জন্য যে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, সে সম্পর্কে বাহিরের লোকে অপেক্ষাকৃত কমই জানে।

ভারতীয় পুঁজির উন্নতি সত্ত্বেও বৃটিশ পুঁজিই ব্যাঙ্কিং, বাণিজ্য, বিনিময়, বীমা, জাহাজের ব্যবসা, রেলপথ, চা, কফি এবং রবার চাষ, এবং পাট-শিল্পে কার্য্যতঃ একচেটিয়া ভাবে আধিপত্য করিতেছে (শেষোক্ত শিল্পে এখন ভারতীয় পুঁজি অঙ্কের দিক দিয়া বেশী হইলেও উহা বৃটিশের নিয়ন্ত্রণেই আছে)। এই আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য সমস্ত রাজনীতিক ব্যবস্থাই বর্ত্তমান। লৌহ এবং ইস্পাতে ভারতীয় পুঁজি বৃটিশ পুঁজির সহিত একটা রফা করিতে বাধ্য হইয়াছে। এমন কি ভারতীয় পুঁজির ঘাঁটি বস্ত্র-শিল্পেও "ম্যানেজিং এজেন্সী" ব্যবস্থা মারফৎ বৃটিশ পুঁজির

কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। সাধারণতঃ যেমন ভাবা হয়, সে কর্ত্তৃত্ব তাহার চেয়ে ঢের ঢের কড়া।

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা কেবল ভারতের এবং এশিয়ার অন্যান্য অংশে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য, এবং উহা ভারতের শিল্পোন্নতির উপর বৃটিশের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিবার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ারগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কোম্পানী এবং ব্যবসায় আরম্ভ করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং বহুলাংশে উহার পুঁজিরও যোগান দেয়; উহাদের কাজকর্ম্ম এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং মালপত্র বাজারে চালু করে। কোম্পানীগুলির ডিরেক্টরদের বোর্ড কেবল নামেমাত্র থাকে। মুনাফার দুধ-সরটুকু বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সবই গিয়া পড়ে ম্যানেজিং এজেন্সীর পাতে, অংশীদারদের কপালে আর উহা জুটে না। ১৯২৭ সালে ট্যারিফ বোর্ড কটন টেক্সটাইল এঙ্কোয়ারীর সমক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্য অনুযায়ী, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলি ১৯০৫ হইতে ১৯২৫ সাল এই বিশ বছরের ভিতর ম্যানেজিং এজেন্টদের বছর বছর গড়ে আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা ৫·২ টাকা কমিশন দিয়া আসিয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্সীর হাতে শেয়ারের উপর লভ্যাংশ এবং কেনা ও বেচার উপর কমিশন ছাড়াই এই পাওনা। এমন ঘটনারও বিবরণ পাওয়া গিয়াছে যে, কাপড়ের কলগুলি লোকসান দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কলের ম্যানেজিং এজেন্সী তাহার অধীনস্থ কলের মোট লোকসানের চেয়েও বেশী কমিশন পাইয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯২৭ সালে বোম্বাইয়ের ৭৫টি কাপড়ের কলের নীট ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩ শত ৯ টাকা লোকসান হয়; এবং উহাদের ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি ভাতা এবং কমিশন বাবদ লয় মোট ৩০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪ শত ৭৭ টাকা। (পি. এস. লোকনাথন—"ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গানিজেশন ইন্ ইণ্ডিয়া,"—১৯৩৫, পৃঃ ১৬৮)

ভারতীয় এবং ইংরেজ—উভয়েরই ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান আছে; কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী এবং পুরাতন যেগুলি, সেইগুলি হইল ইংরেজদের। গবর্নমেণ্ট ও লণ্ডনের সহিত তাহাদের যে সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ এবং কার্য্যকরী সম্পর্ক থাকিবে তাহা স্বাভাবিক। এণ্ড্রু ইয়ুল এণ্ড কোং, অথবা জার্ডিন এণ্ড স্কিনারের মত প্রতিষ্ঠান ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসের অংশ। বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে ১৯২৭ সালে "ট্যারিফ বোর্ড কটন টেক্সটাইল এঙ্কোয়ারী রিপোর্ট" বোম্বাইয়ের শতকরা ৯৯টি কাপড়ের কলের হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন

শক্তির যোগাযোগ এবং সম্বন্ধ সম্পর্কে এক তাপর্য্যপূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮, পরিশিষ্ট ৶০ ; নিম্নলিখিত হিসাব এই পরিশিষ্ট হইতে সংগৃহীত ; উহা ১৯২৮ সালের জুন মাসে "লেবর রিসার্চ-"এ প্রকাশিত হইয়াছিল)

বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল

	মিল	টাকু	তাঁত	মূলধন (দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)
ইংরেজ ম্যানেজিং এজেণ্ট-ওয়ালা কোম্পানী (৯)	২৭	১,১১২,১১৩	২২,১২১	৯৮·৯
ভারতীয় ম্যানেজিং এজেণ্ট-ওয়ালা কোম্পানী (৩২)	৫৬	২,৩৬০,৫২৮	৫১,৫৮০	৯৭·৭

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে ইংরেজ ম্যানেজিং এজেণ্টরা শতকরা ২২টি কোম্পানীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিলেও, উহারা শতকরা ৩৩টি মিল, ৩২টি টাকু, ৩০টি তাঁত এবং ৫০·৩ ভাগ মূলধন নিয়ন্ত্রণ করিত। (মূলধনের বেশীর ভাগই দেখা যাইতেছে উহাদের হাতে।) ভারতীয় পুঁজির উন্নতির সব চেয়ে বড় ক্ষেত্র বলিয়া যে শিল্প পরিগণিত হয়, তাহাতেই এই অবস্থা।

পরবর্ত্তী আর্থনীতিক সঙ্কটের ফলে ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি মিলগুলির উপর তাহাদের মুঠি আরও শক্ত করিয়া ধরিবার সুযোগ পায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় শেয়ার হোল্ডার বা অংশীদারদের শেয়ার বে-দখল করিয়া তাহা নিজেরা কুক্ষিগত করে। ১৯৩১ সালে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এঙ্কোয়ারী কমিটি বলেন :

> "বোম্বাই এখন যে সময়ের ভিতর দিয়া যাইতেছে, তেমন সঙ্কটের সময়ে, ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি তাহাদের অধীনস্থ মিলগুলিকে টাকা পয়সা যোগাইবার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ যে প্রচুর লোকসান সহিয়াছে—একথা সত্য হইলেও, এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে যে, এই সব এজেণ্টরা মিলগুলিকে প্রদত্ত ঋণকে ডিবেঞ্চারে পরিণত করিয়া লইয়াছে। ফলে এই সব প্রতিষ্ঠান তাহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে এবং অংশীদাররা তাহাদের সব মূলধনই হারাইয়াছে।"

('সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এঙ্কোয়ারী কমিটির রিপোর্ট, ১৯৩১, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯)

ভারতীয় শিল্পের উপর বৃটিশ পুঁজির কর্ত্তৃত্ব আজও রহিয়াছে। ভারতবর্ষে বৃটিশ সম্পত্তির ক্রয়বিক্রয়ের কোন সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও হিউ ডালটন সাহেব ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ভারতীয়দের নিকট বিশেষ কিছু সম্পত্তি হস্তান্তরিত করা হয় নাই। পক্ষান্তরে ঠিক উল্টা একটা জিনিস দেখা গিয়াছে। উহা হইতেছে এই যে, ভারতে বিদেশী পুঁজি ঢুকিতেছে। বিদেশী কোম্পানীরা ভারতে রেজেস্টারি করিয়া ভারতে তাহাদের শাখা খুলিয়াছে। লিভার ব্রাদার্স, ডানলপ, ইম্পিরীয়াল কেমিক্যালের ন্যায় বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলির শাখা এখানে আছে। আর "ইণ্ডিয়া লিমিটেডের" সংখ্যাও রোজই বাড়িয়া যাইতেছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৯৪৫ সালের বাজেট অধিবেশনে ভারত গভর্নমেণ্টের বাণিজ্যসচিব বলেন যে, ১৯৪২-৪৩ সালে যে ৪ বছর শেষ হইল, তাহার ভিতর বৃটিশ ভারতের বাহিরে রেজেস্ট্রীকৃত পাঁচটি কোম্পানী নামের পিছনে "ইণ্ডিয়া লিমিটেড" জুড়িয়া ভারতে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছে। তাহার উপর, ১৯৪৩-৪৪ সালে যে পাঁচ বছর শেষ হইয়াছে, তাহার ভিতর সকল ধরণের শিল্প ধরিয়া ১০৮টি "ইণ্ডিয়া লিমিটেড" ভারতে রেজেস্ট্রীকৃত হইয়াছে। অধ্যাপক ওয়াদিয়া এবং মার্চেণ্ট বলিয়াছেন, "প্রচুর মূলধনের সাহায্য পাইয়া অভারতীয় ফ্যাক্টরীগুলি প্রচুর পরিমাণে দিয়াশলাই, সিগারেট, সাবান, জুতা, রবার, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি উৎপাদন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট করিয়া দিতেছে। তাহারা যে শুধু বড় বড় শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করে তাহা নহে, আমাদের ছোটখাট শিল্পগুলিকেও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে।"

(ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট, "আওয়ার ইকনমিক্ প্রবলেম" ১৯৪৫, পৃঃ ৪৬৬)

ভারতীয় শিল্পের পক্ষে ভীতিজনক এই সব "ইণ্ডিয়া লিমিটেড" সম্পর্কে বোম্বাইয়ের শিল্প এবং আর্থনীতিক তদন্ত কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে (১৯৪০) বলেন :

"ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ প্রদানই যদি আমাদের শিল্পনীতির উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এই সব বড় বড় বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে বিনা বাধা ও বিবেচনায় এখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার অনুমতি দিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।"

(রিপোর্ট, ১৯৪০ সাল, পৃঃ ১৬৮)

অবশ্য বৃটিশ ব্যাঙ্ক-পুঁজির নিয়ন্ত্রণ-শক্তির পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক হইল বিদেশী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভূমিকা। উহার কাজ চলিয়াছে গভর্নমেণ্টের আর্থনীতিক এবং বিনিময় নীতির সঙ্গে তাল রাখিয়া। যতক্ষণ বৃটিশের হাতে একচেটিয়া আর্থনীতিক ক্ষমতা রহিয়া যাইতেছে ততক্ষণ ভারতীয়দের স্বাধীন ধনতান্ত্রিক উন্নতির কথা বলা ফাঁকা মিথ্যা বই কিছু নয়।

ভারতে আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসা চার রকম প্রতিষ্ঠান মারফৎ সংগঠিত।

(১) ১৯৩৪ সালে আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এই পিরামিডের চূড়া (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৩৫ সাল হইতে কাজ করিয়া যাইতেছে)। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ন্যায় ইহাও বেসরকারী মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বেসরকারী ভাবে নিয়ন্ত্রিত বটে, কিন্তু ইহার হাতে মুদ্রা প্রচলন, বিনিময়, নিয়ন্ত্রণ, গভর্নমেণ্টের ব্যাঙ্কিং এবং টাকা পাঠানোর কাজ থাকাতে ইহা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ন্যায় ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইহার গভর্নর, দুইজন ডেপুটি গভর্নর এবং পাঁচ জন ডিরেক্টর গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত, কিন্তু এই আটজনের মধ্যে মাত্র ছয়জনের ভোট দিবার ক্ষমতা আছে। গভর্নমেণ্ট-মনোনীত ব্যক্তিদের এই ছয়জন ছাড়া আরও আটজন ডিরেক্টর বেসরকারীভাবে নির্ব্বাচিত হন; ইঁহাদের ভোট হইল আটটি। এইভাবে আইনের সাহায্যে ইহা রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে রেহাই পাইয়া থাকে। গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট বা ভারত শাসন আইন চালু করিবার সময়, ১৯৩৫ সালে এই নূতন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পথে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টে ভারতীয় মতের আংশিক অভিব্যক্তিও যদি আসিয়া যায়, তাহা হইলেও আর্থনীতিক ক্ষমতার দুর্গ অনধিগম্য রহিয়া যাইবে, অথবা "লণ্ডন টাইমস" পত্রিকার কথায় (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮) "রাজনীতিক চাপের হাত হইতে" রক্ষা পাওয়া—যাহাতে ক্রেডিট ও মুদ্রানীতির রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হওয়া আবশ্যক।" বোর্ডের নির্ব্বাচিত সভ্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে কেবল বাহিরের জিনিস এবং আসল ক্ষমতা যে গভর্নমেণ্টের হাতে, তাহা যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী নীতির কাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরাজয় হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন উহা সাধারণ সরকারী বিভাগের ন্যায়ই কাজ করিয়াছে। সরকারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম দশ বছরের কাজকর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া "ইস্টার্ন ইকনমিস্ট" পত্রিকা লিখিয়াছিল :

"গভর্নমেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হইয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা কার্য্যকরী করা বিষয়ে হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার কর্ত্তব্য চমৎকারভাবে

সম্পন্ন করিয়াছে। ইহার কাজকর্ম্ম হইতে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় এবং উহা হইতে যে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা দেখিয়া আমরা এই মন্তব্য করিতে বাধ্য হইতেছি যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ড তাহার পূর্ণ দায়িত্ব পায় নাই।...প্রকৃত সত্য হইতেছে এই যে, গভর্নমেণ্টের ইচ্ছা ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে বিমুক্ত রহিবে, (রাষ্ট্রনীতি হইতে নহে)।"

(ইস্টার্ন ইকনমিস্ট, ২৫শে মে, ১৯৪৫)

(২) প্রাক্তন তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ককে এক করিয়া ১৯২০ সালের আইনের বলে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং উহা সেই হইতেই চালু আছে। সরকারী আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার মালিকানা বেসরকারী, ইহার নিয়ন্ত্রণ ভারও বেসরকারী লোকের হাতে। ইহার অনুমোদিত মূলধন হইল ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। গোড়াতে এই পরিকল্পনা ছিল যে, ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ চালাইবে এবং মুদ্রা প্রচলন করার এবং গভর্নমেণ্টের ব্যাঙ্কার রূপে কাজ করিবার ভার লইবে অথচ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের কাজকর্ম্মও চালাইবে। ১৯৩৪ সালের আইনের বলে ইহা এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করে, ব্যবসায়ের কাজকর্ম্মও চালায়। ইহার শাখা এবং সাব-এজেন্সীর সংখ্যা প্রায় চারশত, ভারতের সব "ব্যাঙ্ক ডিপোজিটের" প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ ইহারই হাতে। ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ইহার আধিপত্যও খুব। ১৯৩৬ সালে ইহার ডিরেক্টরদের মধ্যে এগারজন ছিলেন ইংরেজ এবং চার জন ছিলেন ভারতীয়।[১]

(৩) এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বা ভারতে অবস্থিত বেসরকারী বৃটিশ ও বিদেশী ব্যাঙ্ক সমূহ। এই ব্যাঙ্কগুলির সদর অফিস ভারতের বাহিরে এবং এগুলি পুরাপুরি অভারতীয়।[২] আমদানী রফ্‌তানী ব্যবসায়ের টাকাকড়ি যোগান দেওয়ার কাজটা

(১) ১৯৩০ সালে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মোট আদায়ীকৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটির কাছে এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর যে তথ্য পেশ করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে ইহার মধ্যে ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ছিল "অভারতীয়ের হাতে" এবং ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ভারতীয়ের হাতে, (রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৪)। ইহার ফলে "অ-ভারতীয়েরাই" অন্য নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়া যাইত। প্রকৃত পক্ষে প্রভাব প্রতিপত্তিসম্পন্ন কয়েকজন ইংরেজ অংশীদারদের হাতে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প অনুপাতে যে শেয়ার আছে, তাহাই বর্ত্তমান বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট।

(২) ১৯৩৬ সালে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক সেণ্ট্রাল একসচেঞ্জ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের এক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায়।

ইহারাই নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ১৯৪৩ সালে এই ধরনের ১৬টি ব্যাঙ্ক ছিল। তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়গুলি হইতেছে, দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এ্যাণ্ড চায়না ; দি মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ; দি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ; দি হংকং এ্যাণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন এবং লয়েডস ব্যাঙ্ক।

(৪) ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সবচেয়ে তলায় রহিয়াছে ভারতীয় জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্ক বা ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি। একমাত্র এইখানেই ভারতীয় মূলধনের কিছু করার হাত আছে। কিন্তু ইহাদেরও কতকগুলি বিদেশীর খপ্পরে গিয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের নাম করা যাইতে পারে। (এইটি সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক বটে, কিন্তু এখন উহা চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এবং চায়নার সহিত সংযুক্ত।) কাজেই ইহাদের মোট শক্তিকে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের শক্তির পরিমাপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অনেক ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে পীপলস ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, দি ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক এবং এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলার নাম করা যাইতে পারে। ১৯২২ এবং ১৯২৮ সালের মধ্যে কমসে কম একশ ভারতীয় ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে।

(ইকনমিস্ট. ১২ই এপ্রিল, ১৯৩০)

নিম্নলিখিত হিসাবের মধ্যে ১৯১৩, ১৯২০ এবং ১৯৩৪ সালে উপরোক্ত তিন ধরনের ব্যাঙ্কের—যথা ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (১৯২১ সালের পূর্ব্বে তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক), এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের অনুপাত দেওয়া যাইতেছে।

ব্যাঙ্কের আমানত

(দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)

	ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (অথবা প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলি)		এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক সমূহ		ভারতীয় জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্ক সমূহ	
	পরিমাণ	শতকরা	পরিমাণ	শতকরা	পরিমাণ	শতকরা
১৯১৩	৪২৪	৪৩.৫	৩১০	৩১.৮	২৪১	২৫.৭
১৯২০	৮৭০	৩৬.৯	৭৪৮	৩১.৬	৭৩৫	৩১.৬
১৯৩০	৭৪৯	৩৩.৬	৭১৪	৩২.০	৭৬৮	৩৪.৪

দেখা যাইবে যে বৃটিশ ও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি, ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক এবং এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলিই এক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেছে, এবং ভারতীয় জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্কগুলি সবচেয়ে বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছে ১৯১৩ এবং ১৯২০ সালের মধ্যে। এই সময়ে তাহাদের নিকট আমানতের পরিমাণ মোট আমানতের চার ভাগের এক ভাগ হইতে তিন ভাগের এক ভাগে গিয়া উঠে। তাহার পর ভারতীয় জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্কগুলি অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে, এবং এই সময়ের ভিতর যে একশ্রেণীর জয়েণ্ট স্টক বা যৌথ ব্যাঙ্ক বিদেশীর নিয়ন্ত্রণে গিয়া পড়ে—তাহাদের কথা ধরিলে ভারতীয় পুঁজির দিক দিয়া আসলে খুব সম্ভব পিছু হটিয়া আসাই হইয়াছে।

যুদ্ধের বছরগুলির ভিতরও এই অবস্থার খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৯৩৮ সালের পরে এই তিন ধরনের ব্যাঙ্কের জমার টাকার তুলনা করিয়া দেখা যাক।

আমানত*

(দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)

	১৯৩৮	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩
১) ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৮১৫'১	১০৮৯'২	১৬৩৪'৬	২১৪৫'৩
২,) এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক সমূহ	৬৭২'০	১০৬৭'৩	১১৬৮'৫	১৪০১'৯
মোট বিদেশী ব্যাঙ্ক	১৪৮৭'১	২১৫৬'৫	২৮০৩'১	৩৫৪৭'২
৩) শিডিউল ব্যাঙ্ক	৯১৮'৭	১২৯০'৪	১৮৯৩'৪	৩১৯৬'৫
৪) শিডিউল নহে এমন ব্যাঙ্ক	১৪৯'৪	২০০'৫	২৯০'১	৪০২'৩
মোট ভারতীয় জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্ক সমূহ	.১০৬৮'১	১৪৯০'৯	২১৮৩'৫	৩৫৯৮'৮

* এই হিসাবের অঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Statistical Tables relating to Banks in India & Burma for the years 1942 & 1943" হইতে গৃহীত।

১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক এবং এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আধিপত্যের ছবি উপরের হিসাবেই দেখা যাইবে। কেবল ১৯৪৩ সালেই ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি ইহাদের নাগাল ধরিয়াছে এবং তাহাদের মোট আমানত ইম্পিরীয়াল ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের চেয়ে শতকরা ১$\frac{১}{২}$ ভাগ বেশী হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের উপর বৃটিশের আধিপত্য যে ভারতের শিল্প এবং স্বাধীন আর্থনীতিক উন্নতির ক্ষতিসাধনের জন্য এবং বৃটিশের স্বার্থ সাধনকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে এ অভিযোগ ভারতীয় শিল্পপতিরা তীব্রভাবেই করিয়াছেন। বৈদেশিক মূলধন কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে টি. সি. গোস্বামীর যে মন্তব্য আছে তাহাকেই দৃষ্টান্ত স্থানীয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

"ঋণ দানের বেলায় জাতিগত এবং রাজনীতিক তারতম্য করিয়া যে বিচার বিবেচনা করা হয়, তাহাদের সম্পত্তির মূল্যের বলে ভারতীয়েরা যে ব্যবহার পাইবার অধিকারী, ঋন দানের সময়ে তাহারা যে তাহা পায় না, এবং অন্যদিকে ব্যবসায়ের সাধারণ নীতি হিসাবে তাহাদের যে পরিমাণ ঋণ পাওয়া উচিত ছিল, বৃটিশ ব্যবসায়ীরা যে তাহার চেয়ে বেশী ঋণ পান সেই সাধারণ ধারণার কথাই আমি বলিতে চাই। আমি জানি যে, এই ধারণার ভাল বনিয়াদ আছে।"

(টি. সি. গোস্বামী: এক্সটার্নাল ক্যাপিটাল কমিটির রিপোর্টে সংযুক্ত মন্তব্যলিপি, পৃঃ ২৪)

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এঙ্কোয়ারী কমিটির মাইনরিটি রিপোর্টেও এই অভিযোগ সমর্থিত হইয়াছে। তাৎপর্য্যপূর্ণ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া এবং "আরও সংবাদের অভাবে" রায় দান স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করিয়া মেজরিটি রিপোর্টে বলা হইল:

"ঋণের দরখাস্ত বিবেচনা করার সময় ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা যে জাতিগত তারতম্য করিয়াছেন—সে সম্পর্কে কিছু কিছু অভিযোগ করা হইয়াছে। ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে ব্যাঙ্কের ইউরোপীয় ম্যানেজাররা তাঁহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রার রীতির দরুণ ভারতীয়দের চেয়ে ইওরোপীয় মক্কেলদের সহিত ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার অধিকতর সুযোগ পাইয়া থাকেন। এবং এই ব্যক্তিগত সংবাদ আদান প্রদান এবং সংস্পর্শের ফলে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ইওরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলিই অধিকতর অনুকূল ব্যবহার পাইয়া থাকে।

"ইহার উপর আবার সাধারণতঃ এ বিশ্বাসও আছে যে উক্ত ব্যাঙ্ক ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেই অবাধে টাকা ধার দিয়া থাকে এবং ব্যাঙ্কের সাহায্যপ্রাপ্ত কয়েকটি ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাকি তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অধিক সাহায্য পাইয়া থাকে এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে ব্যাঙ্ক যে সাহায্য দিয়া থাকে তাহা নাকি অল্প এবং প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে, ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত অগ্রিম টাকার হিসাব আমরা পাইয়াছি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অধিকতর তথ্যের অভাবে আমরা এই অভিযোগ বিচার করিয়া দেখিতে পারিলাম না।"*

১৯২৫ সালে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত ভারতীয় আর্থনীতিক তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়াও লিখিতেছেন :

"ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠার একটা প্রধান বাধা হইতেছে মূলধন। দেশের আর্থিক শক্তি যে-গভর্নমেণ্টের নিয়ন্ত্রণে শিল্পনীতি সম্পর্কে তাহার দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে স্বতন্ত্র। ইহা হইতেই বাধার উৎপত্তি। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাঙ্কের সংখ্যা খুবই কম, এবং বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির বেশীর ভাগই হয় গভর্নমেণ্টের কর্তৃক প্রভাবান্বিত না হয় বৃটিশ- এবং অন্যান্য বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখা।"

(স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া—"প্ল্যান্ড্ ইকনমি ফর ইণ্ডিয়া" ১৯৩৪, পৃঃ ৯৫)

৭। ব্যাঙ্ক পুঁজি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে ভারতের স্বাধীন আর্থনীতিক উন্নতিকে বলি দিয়াই আধুনিক যুগে বৃটিশ ব্যাঙ্ক-পুঁজির প্রকৃত আধিপত্য দৃঢ়ভাবে বজায় রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তাহার জন্য ভারতকে প্রাচ্যে প্রধান সরবরাহ ঘাঁটি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে বদলাইতে পারে নাই। সারা যুদ্ধের ভিতরই, ভারতে

* ইণ্ডিয়ান সেনট্রাল ব্যাঙ্কিং এঙ্কোয়ারী কমিটির মেজরিটি রিপোর্ট, ১৯৩১, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭১-৭২

বৃটিশ নীতি ভারতে শিল্পবিস্তার বন্ধ করিবার দিকে পরিচালিত হইয়াছে। "ইস্টার্ন ইকনমিস্ট" পত্রিকা ১৯৪৫ সালে ৩১শে আগস্ট লিখেন :

"আমরা সবই করিতে পারিতাম, অথচ কিছুই করিতে পারি নাই। আমরা সব জিনিসেরই সরবরাহ করিয়াছি, পৃথিবীর সকল বস্তুই সারাইয়া মেরামত করিয়াছি, কিন্তু মূল জিনিস কিছুই তৈয়ারী করি নাই। আমাদের কোন ব্যবস্থা, কোন পরিচালনা ছিল না। একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিচালনা ছিল বটে, তাহা হইল যুদ্ধের পরের যুগে এদেশে শিল্পবিস্তার বন্ধ করার পরিকল্পনা।"

অবশ্য যুদ্ধের সময় শিল্পসংক্রান্ত কাজকর্ম্ম অনিবার্য্যভাবে কিছু বাড়িয়াছিল। ভারতে কারখানাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা (গভর্নমেণ্টের যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের ফ্যাক্টরীগুলি ধরিয়া) ১৯৩৯ সালে ছিল ১,৭৫১,১৩৭। ১৯৪৪ সালে উহা বাড়িয়া হয় ২,৫২০,০০০। বৃটিশ ভারতের যৌথ কোম্পানীগুলির আদায়ীকৃত মূলধন ১৯৩৯-৪০ সালে ছিল ২৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৪৩-৪৪ সালে উহা বাড়িয়া হয় ৩২৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। ভারতে বৃটিশ মূলধনের সাপ্তাহিক মুখপত্র "ক্যাপিটাল" পত্রিকার হিসাব অনুযায়ী শিল্পসংক্রান্ত কাজের সূচক সংখ্যা ১৯৩৯-৪০ সালের ১১৪'০ হইতে বাড়িয়া ইউরোপীয় যুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালের মে মাসে হয় ১২০'৫। এ সময়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা (১৩২'১) উঠে ১৯৪৫-এর জানুয়ারী মাসে। কোন কোন ধরনের জিনিসের উৎপাদনও বাড়িয়া যায়। যুদ্ধের আগেকার বৎসরের কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ ৫৯ হাজার টন হইতে বাড়িয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে দাঁড়ায় ৯০ হাজার টনে। (১৯৪৪-৪৫ সালে উহা আবার কমিয়া হয় ৭৫ হাজার টন)। মিলের কাপড়ের উৎপাদন ৩৮০০০ লক্ষ গজ হইতে বাড়িয়া যুদ্ধের সময় হয় ৪৭০০০ লক্ষ গজ (ইস্টার্ন ইকনমিস্ট, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৬)। যুদ্ধের সময় উৎসাহ পাওয়ার ফলে রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সালে বাৎসরিক ৭৫০,০০০ টন ইস্পাত তৈয়ারী হইত। ১৯৪৩-৪৪ সালে কিন্তু ইস্পাত তৈয়ারী হয় প্রায় ১,১২৫,০০০ টন। সঙ্কর ইস্পাত (alloy stee) এবং এ্যাসিড ইস্পাতের মত নূতন ধরনের ইস্পাতও এই সময় প্রথম তৈয়ারী হয়। বিমান, জাহাজ ইত্যাদি মেরামতের কাজও কিছু হয়।

কিন্তু ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির সভাপতি স্যার বদ্রীদাশ গোয়েঙ্কা ঠিকই বলিয়াছেন যে, ভারতে যুদ্ধের সময় যে পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধিই হইয়া থাকুক না কেন, উহা হইয়াছিল "বর্ত্তমান যন্ত্রপাতিকে

অত্যধিক পরিমাণে খাটাইয়া, এবং শ্রমিকদের শিফ্‌ট বাড়াইয়া। অথচ অন্যান্য যুধ্যমান দেশে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য শিল্পবিস্তারের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, এখানে তাহা একেবারে করা হয় নাই বলিলেই হয়।" (ইস্টার্ন ইকনমিস্ট, ৫ই মার্চ, ১৯৩৬)

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্পের অব্যবহৃত উদ্বৃত্ত শক্তির দুর্ভাগ্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাট শিল্পে বাড়তি শক্তি ছিল চার ভাগের তিন ভাগ হইতে তিন ভাগের দুই ভাগ। বোম্বাই মিলমালিক এসোসিয়েশনের হিসাব অনুযায়ী দেশের ৩৮৯টি কাপড়ের কলের মধ্যে, ২২টি ১৯৩৯ সালে যে বছর শেষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে হয় আংশিকভাবে, না হয় সম্পূর্ণ, বসিয়াছিল। (পি.সি. জৈন "ইণ্ডিয়া বিল্‌ড্‌স্ হার ওয়ার ইকনমি," ১৯৫৩ পৃঃ ৪)। যুদ্ধের সময় প্রথম দিকে এই অব্যবহৃত শক্তিকে ব্যবহার করা হয় এবং পরে বর্ত্তমানে যে সব যন্ত্রপাতি আছে, তাহার উপর ক্রমেই অধিকতর চাপ পড়িতে থাকে। কার্য্যতঃ কেবল নূতন শিল্প খুলিবার জন্যই নহে, চালু শিল্পকে নূতন সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করিয়া তুলিবার জন্যও কোন যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহার ফলে যে চাপ পড়িয়াছিল তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যেই বুঝা যাইবে। রেলপথে যানবাহনের কথাই ধরা যাক। যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় একটা যাত্রীবাহী গাড়ী শতকরা ৩২ ভাগ বেশী ভার বহিয়াছে, মালগাড়ী বহিয়াছে শতকরা ৮½ ভাগ বেশী। শেডে ঢুকিবার পূর্ব্বে ইঞ্জিনগুলিকে যুদ্ধের আগেকার সময়ের দ্বিগুণ পথ ছুটিতে হইয়াছে। যাহাদের কাজ করিবার নির্দ্দিষ্ট জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে, শতকরা এমন ২৯টি ইঞ্জিন এবং ঐরূপ বহু সংখ্যক ওয়াগন বদল না করিয়া, তাহাদের দিয়াই কাজ চালান হইয়াছে (ইস্টার্ন ইকনমিস্ট, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬)। কাপড়ের কলের কথাও ধরা যাক। আজ বয়ন যন্ত্রের শতকরা ২৫ ভাগ বদলাইয়া ফেলা দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ "ব্লো-রুম"এ এখন যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার শতকরা ১১·৫ ভাগ বসান হইয়াছিল ১৮৯০ সালের আগে; শতকরা ১১·১ বসান হয় ১৯০৬-১০ সালের মধ্যে; শতকরা ১৮·৬ ভাগ ১৯২১-২৫ সালের মধ্যে, এবং শতকরা ১১·৪ ভাগ ১৯৩৬-৪০ সালের মধ্যে। বর্ত্তমানে যত 'ড্র' ও 'স্পীড' ফ্রেম আছে, তাহার মধ্যে শতকরা ৩৫·৫ ভাগ বসান হয় ১৯১০ সালের পূর্ব্বে (ইস্টার্ন ইকনমিস্ট, ৭ই জুলাই, ১৯৪৪)। পুরান এই সব যন্ত্রপাতিকেই যুদ্ধের অপরিমেয় দাবী মিটাইতে হইয়াছে। মাল আনিবার জায়গা জাহাজে নাই—এই মিথ্যা অজুহাতে,

মূলধন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির সাহায্যে গভর্নমেণ্ট এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যাহাতে যুদ্ধের মধ্যে ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি কার্য্যতঃ আর ঢুকিতেই না পারে।

যুদ্ধ প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া দিবার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু দেশের সম্পদের বিরাট উৎসকে কাজে লাগাইবার তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই। যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধা * এবং মিলিটারির জন্য খরিদ করিবার অঙ্গীকার প্রদান না করায় মোটর গাড়ী এবং জাহাজ নির্ম্মাণের শিল্প প্রচেষ্টা কেবলমাত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাই নহে, ভারত গভর্নমেণ্ট মার্কিন টেকনিক্যাল মিশনের সুপারিশগুলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। (উক্ত মিশনও হাইড্রো ইলেকট্রিক পরিকল্পনা, বিমান, জাহাজ নির্ম্মাণ, বড় লাইনের রেল ইঞ্জিন তৈয়ারী ইত্যাদি প্রাথমিক শিল্প প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধেই সুস্পষ্ট সুপারিশ জানাইয়াছিলেন)।

মার্কিন মিশন দেখেন "বোম্বাই বন্দরে এক শতাধিক জাহাজ ছোটখাট ও বড় রকমের মেরামতের জন্য পড়িয়া আছে, অথচ বোম্বাইয়ে জাহাজ মেরামতের এক কারখানায় ঘোড়ার ক্ষুরের নাল, মিলিটারী বুটের নাল এবং রেলপথের সুইচ গীয়ার তৈয়ারী হইতেছে।" (রিপোর্ট, পৃঃ ৩)। অন্য সমস্ত শিল্পের উন্নতির সুপারিশ ছাড়াও মিশন ভারতে জাহাজ এবং বিমান মেরামত করিবার সুপারিশ জানাইয়া বলেন, "মিটার গেজ রেলপথের ইঞ্জিন, মালগাড়ী এবং অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় গাড়ী তৈয়ারীর" ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে যে সব যন্ত্রপাতি এবং টেকনিক্যাল সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা সবই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতিও মিশন দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন:

> "ভারতের শিল্পোৎপাদনের প্রসারকে অন্ততঃ আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র হইতে 'ঋণ ও ইজারা' সূত্রে প্রাপ্ত মালে এবং এই দেশের বিশেষজ্ঞগণ প্রদত্ত পরামর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।"

(মার্কিন টেকনিক্যাল মিশনের রিপোর্ট, পৃঃ ৬)

* এ সম্পর্কে মার্কিন টেকনিক্যাল মিশনের মন্তব্য লক্ষ্য করিবার মত। "ভারতের বিরাট প্রাকৃতিক এবং সামাজিক সম্পদ থাকার জন্য, ইহার শিল্পোৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনার" দিকে রিপোর্টের উপসংহারে মনোযোগ আকৃষ্ট করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে, "মিশন মনে করেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি পাওয়া গেলে উহা ঢের ভাল এবং বেশী করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভারতীয় কারিগরদের কার্য্যদক্ষতার প্রমাণও মিশন পাইয়াছেন ইহারা যথাযোগ্য উৎসাহ পাইলে এবং ইহাদের কাজের অবস্থা ভাল হইলে ইহাঁরা অল্প দিনের শিক্ষার পরেই সুদক্ষ কারিগর হইয়া উঠিতে পারিবে।"

মিশনের মূল সুপারিশগুলি পর্য্যন্ত কাজে পরিণত করিতে গভর্নমেণ্ট অস্বীকার করিলেন। শুধু তাহাই নহে। রিপোর্টটির উপরে তাহারা "একান্তভাবে গোপনীয়" এই ছাপ মারিয়া দিলেন।

কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিকে প্রাথমিক শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং আর্থনীতিক স্তরে উন্নীত করার কাজে সাহায্য দেওয়া হইল। কিন্তু ভারতের আর্থনীতিক প্রকৃতি যেমনটি ছিল ঠিক তেমনিটিই রহিয়া গেল। গুরু শিল্পেরও উন্নতি হইল না।

ভারতের উন্নতিতে বাধা দিবার এই নীতি সম্পর্কে প্রধানতঃ ইস্টার্ন গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিলের সাহায্য লওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের দফ্তর ছিল ভারতে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের সমর সরবরাহ এক করিয়া উহা ঠিকভাবে ভাগ করিয়া দিবার জন্যই ইহা গঠিত হইয়াছিল; এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে একই কাজ যাহাতে দুইবার না হয়, এই অজুহাতে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান মারফৎ গবর্নমেণ্ট পাকাপাকি ভাবে এমন ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি না হয়। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের সরবরাহের অর্ডার পেশ করিবার সময় এই ইস্টার্ন গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল স্পষ্টতঃ নানা প্রভেদাত্মক এবং তারতম্যসূচক ব্যবহার করিয়াছে। (এই সাপ্লাই কাউন্সিলে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন একজন সরকারী আমলা)। নিখিল ভারত মিল-মালিক সংগঠনের সভাপতি স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া বলিয়াছেন:

> "বর্ত্তমান যুদ্ধে যে সব জিনিস প্রয়োজন, তাহার অর্ডার বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন যুধ্যমান দেশের ভিতর রোজার মিশন এবং ইস্টার্ন গ্রুপ সাপ্লাই কনফারেন্সের পরামর্শ অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান বন্দোবস্ত মত, ভারতের কলকারখানার শিল্পপতিদের দেওয়া হইয়াছে কেবলমাত্র এমন কয়েকটি জিনিসের অর্ডার, যাহার জন্য উচ্চ শ্রেণীর কোন দক্ষতার দরকার নাই। যে সব জিনিসের জন্য গুরু শিল্প অথবা উঁচু দরের দক্ষতা প্রয়োজন, তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়াকেই দেওয়া হইয়াছে।"
>
> (এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া "প্রসপারিটি থ্রু ইণ্ডাষ্ট্রি" ১৯৪৩, পৃঃ ১৫)

ইস্টার্ন গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিলের প্রতিবন্ধক সৃষ্টির মতলব এবং কর্ম্মপদ্ধতি দেখিয়া ১৯৪০ সালের আগেই বৃটিশ কায়েমী স্বার্থ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়াছে। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে ইস্টার্ন গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিলের যে অধিবেশন

হয়, তাহাতে বৃটিশ বোর্ড অব ট্রেডের প্রতিনিধি মিঃ গাই লোকক্-এর যোগদান সম্পর্কে লণ্ডনের রেলওয়ে গেজেট লিখেন :

"মিশনে বোর্ড অব ট্রেডের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার (গাই লোকক্-এর) উপর যে কাজের ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতেছে, যুদ্ধের অত্যাবশ্যক সরবরাহের উপর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করিবার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া, ভাবী যুদ্ধকালীন শিল্প বিস্তারের যে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, বৃটিশ শিল্পের ভবিষ্যতের উপর তাহার ফলাফল কিরূপ হইবে তাহা পরিমাপ করিয়া দেখা।...সঙ্গে সঙ্গে মিঃ লোকক্ এই অভিমত পোষণ করেন যে, মিশনের সফরের ফলে, যুদ্ধের জন্য যে সব উৎপাদন অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে, তাহার উৎপাদন বাড়াইবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই এবং মোটামুটিভাবে ধরিতে গেলে, এক সময় যতটা মনে করা হইত যুদ্ধোত্তর কালে ভারতে বৃটিশ শিল্পের স্বার্থ ততটা ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

(স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়ার "রিকনষ্ট্রাকশন্ ইন পোস্ট-ওয়ার ইণ্ডিয়া" নামক বইয়ের ১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত—১৯৪৪)

মার্কিন টেকনিক্যাল মিশনও মনে করিয়াছিলেন যে, সামরিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের ফলে "সাগর পারের সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক কাউন্সিল মারফৎ ভারত গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয়ের দ্বারা আর কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।" এই মত অনুযায়ী, মিশন সুপারিশ করিয়া বলেন যে, "সাগরপার হইতে ভারতকে প্রদত্ত অর্ডার সমূহের কাজ ইস্টার্ন গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল মারফৎ না হইয়া সরাসরি ভারত গবর্নমেণ্টের সরবরাহ বিভাগ মারফৎ হওয়া উচিত এবং শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানকে কেবল উৎপাদন এবং সরবরাহ সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ এবং সমাধা করিবার যন্ত্র হিসাবে চলিতে দেওয়া উচিত।" (রিপোর্ট—পৃঃ ৭)

উপরোক্ত কারণ সমূহের জন্য ভারত গবর্নমেণ্টও স্বভাবতঃই নেতিবাচক উত্তর দিয়াছিলেন। মিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁহাদের স্মারকলিপিতে ভারত গবর্নমেণ্ট বলেন, ইস্টার্ন গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিলের গঠন অনুযায়ী "কাউন্সিলের কাজ হইতেছে (বিভিন্ন জিনিসের) চাহিদা বাঁটিয়া দেওয়া এবং কাউন্সিল এই দায়িত্ব পরিহার করিতে পারে না।"

ভারত গবর্নমেণ্ট কেবল ভারতে প্রাথমিক শিল্পগুলির উন্নতি বন্ধ করিয়াই দেন নাই, তাঁহারা বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্যান্য বহুবিধ কাজের ভার দিয়া

প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যুদ্ধের সময় ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের আদায়ী-কৃত মূলধন লইয়া 'ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন' নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তাহাকে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইল। অধিকন্তু ভারতে মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি সন্নিবেশ করার কাজের সম্পূর্ণ ঠিকাদারি দুইটি মাকিন কোম্পানীকে দেওয়া হয়। এই দুইটি কোম্পানী হইল জেনারেল মোটরস এবং ফোর্ড।

শিল্পোন্নতি হওয়া দূরে থাক, এই সময়ের ভিতর ভারত যে ভাবে শোষিত হইয়াছে, বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে তাহার নজির আর পাওয়া যায় না। এবার ভারতের জনসাধারণের ঘাড়ে পূর্ব্বের বিভিন্ন যুদ্ধের বোঝার চেয়ে গুরুতর বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে সম্রাটের গবর্নমেণ্ট দেশরক্ষার ব্যয় ভারতের সহিত ভাগাভাগি করিয়া পাইবার জন্য তাঁহাদের এজেণ্ট ভারত গবর্নমেণ্টের সঙ্গে এক আর্থনীতিক চুক্তি করেন। এই চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে, ভারতে দেশরক্ষা বাবদ মোট ব্যয়ের মধ্যে ভারতকে যাহা বহন করিতে হইবে বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইল :

(১) ভারতের শান্তিকালীন স্বাভাবিক দেশরক্ষা সম্পর্কিত ব্যয় বাবদ বাৎসরিক একটা টাকা ; এই টাকার পরিমাণ ৩৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। ইহার উপর—

(২) পণ্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য আরও কিছু টাকা ; তাহা ছাড়া

(৩) ভারতকে নিজের স্বার্থের খাতিরে যে সব সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে তাহার খরচ ; এবং,

(৪) সাম্রাজ্য রক্ষাকল্পে বৃটেনের বাহিরে অবস্থিত সৈন্যদের ব্যয় বরাদ্দ বাবদ ভারতের দেয় অংশ থোক ১ কোটি টাকা।

ভারতে যত স্থল সৈন্য ভর্ত্তি করা হয়, তাহারা যতদিন ভারতে থাকিবে এবং ভারতের রক্ষার জন্য যতদিন তাহাদের পাওয়া যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের ভর্ত্তি করা, শিক্ষা দেওয়া, সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া এবং খোরাক-পোশাক ইত্যাদি বাবদ সকল খরচ ভারতকেই বহন করিতে হইবে বলিয়া স্থির হয়। তাহারা সাগর পারে চলিয়া গেলে, তাহাদের শিক্ষা এবং সাজ-সরঞ্জামের খরচ সম্রাটের গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে আদায় করার কথা স্থির হয়। আরও স্থির হয় যে, সৈন্যদল বাহিরে যাইবার পর হইতে সম্রাটের গবর্নমেণ্ট তাহাদের অন্যান্য দায়িত্বও লইবেন। ইহা ব্যতীত, ভারতে অবস্থিত বিদেশী সৈন্যদের যে সব

জিনিসপত্র ও অন্যবিধ প্রয়োজন সরবরাহ বাবদ খরচ হয় তাহা বৃটেন বহন করিতে স্বীকৃত হয়। জাপান যুদ্ধে যোগ দিবার পরে এই ব্যয়ভার অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়।

আপাত দৃষ্টিতে এই চুক্তি অন্যায্য ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যে সাম্রাজ্য রক্ষার খরচপত্রের ভার যাহাতে ভারতের উপর না পড়ে, তাহার ব্যবস্থাই বুঝি ইহাতে করা হইয়াছে। আসলে কিন্তু সহজে চোখে না পড়ে এমন উপায়ে ভারতের ঘাড়ে খরচের ভার চাপাইয়া দিবার ব্যবস্থাই ইহার ভিতর ছিল।

সম্রাটের গবর্নমেণ্ট, ভারত গবর্নমেণ্ট এবং ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একই ঝাড়ের বাঁশ। এই তিনে মিলিয়া স্থির করিল যে, সম্রাটের গবর্নমেণ্টের জন্য এই ধরনের এবং অন্যান্য সব খরচদ্রব্যের বদলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতে আরও বেশী সংখ্যায় কাগজের নোট বাজারে ছাড়িবে এবং সম্রাটের গবর্নমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের খাতায় এই টাকার সমপরিমাণ স্টার্লিং জমা করিয়া যাইবেন। কাজেই সমস্ত যুক্তিটাই ঋণ শোধের একটা মামুলি প্রতিশ্রুতিতে পর্য্যবসিত হইল এবং ভারতকে প্রচুর ব্যয় বহন করিতে বাধ্য করা হইল।

এই চুক্তি অনুসারে ভারতের দেশরক্ষার ব্যয়ভার খুবই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন কোন বৎসরে, ভারতের যুদ্ধপূর্ব্ব মোট জাতীয় আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের দেশরক্ষার ব্যয়

(দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)

বৎসর	মূলধন খাতে	রাজস্ব খাতে	মোট ব্যয়
১৯৩৯-৪০	—	৪৯৫·৪	৪৯৫·৪
১৯৪০-৪১	—	৭৩৬·১	৭৩৬·১
১৯৪১-৪২	—	১০৩৯·৩	১০৩৯ ৩
১৯৪২-৪৩	৫২৫·১	২১৪৬·২	২৬৭১·৩
১৯৪৩-৪৪	৩৭৪·৬	৩৫৮৪·০	৩৯৫৮·৬
১৯৪৪-৪৫	৬২৮·৩	৩৯৫৪·৯	৪৫৮৩·২
১৯৪৫-৪৬*	১৪৯·৩	৩৭৬৪·২	৩৯১৩·৫
মোট	১৬৭৭·৩	১৫৭২০·১	১৭৩৯৭·৪

(রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া : "রিপোর্ট অন্ কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স" —১৯৪৫-৪৬)

* সংশোধিত হিসাব।

সম্রাটের গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে যে সব খরচপত্র আদায় করা যাইবে বলিয়া ধারণা করা হইয়াছিল তাহাও উপরোক্ত ভাবেই বাড়িয়া উঠে।

আদায়োপযোগী যুদ্ধের ব্যয়[১]

বৎসর	দশ লক্ষ টাকার হিসাবে
১৯৩৯-৪০	৪০·০
১৯৪০-৪১	৫৩০·০
১৯৪১-৪২	১৯৪০·০
১৯৪২-৪৩	৩২৫৪·০
১৯৪৩-৪৪	৩৭৭৮·৭
১৯৪৪-৪৫	৪১০৮·৪
১৯৪৫-৪৬ *	৩৪৭০·৭
মোট	১৭১২২·৬

(রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া "রিপোর্ট অন্ কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স" পৃঃ ৪৮)

১৯৪৬ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের খাতায় ভারতের পাওনা স্টার্লিং-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৯ কোটি ৬৯ লক্ষ পাউণ্ড অথবা ২১২৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। ভারতের পাওনা স্টার্লিং-এর পরিমাণ এখনও বাড়িয়া চলিয়াছে।

সারা যুদ্ধের সময় ভারতের এই পাওনা অর্থ ভারতের জনসাধারণের নাগালের বাহিরে রাখিয়া দেওয়া হয়। পণ্য বা স্বর্ণ কোন দিক দিয়াই এই বিপুল অর্থ ভারতের কাজে লাগে নাই। পাওনা স্টার্লিং-এর পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে থাকিলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য উহার ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত ভারত পায় নাই।

ভারতের প্রভু হিসাবে তাহার পদমর্য্যাদার সুবিধা বৃটেন বেশ ভাল করিয়াই খাটাইয়া লইল। দেশে বৃটিশ লগ্নির যে হাল হইয়াছিল তাহার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক। প্রাপ্য স্টার্লিংএর বিনিময়ে ভারতে অবস্থিত বৃটিশ ও বৈদেশিক লগ্নি ও ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্রয় করিয়া লওয়ার অনুমতি পর্য্যন্ত মিলিল না।

* সংশোধিত হিসাব।

১। যুদ্ধের ব্যয় বাবদ এই বিল, সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে আরও বিকট আকার ধারণ করে। এই নীতি হইল উপনিবেশগুলিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা না দেওয়া এবং তাহাদের জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা অফুরন্ত ধনসম্পদকে কাজে না লাগানো।

কেবল মাত্র ভারতের সরকারী ঋণ (স্টার্লিং-এ) ৩২ কোটি ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড ফেরত দিবার অনুমতি পাওয়া গেল ; বাকি ১২৭ কোটি ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ মান্ধাতার আমলের এই ঋণের ৪ গুণ তখনও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের কাছে পড়িয়া রহিল। যুদ্ধের পরে আবার নানা ছল-ছুতায় এই ঋণ আংশিক ভাবে অস্বীকার করার অথবা উহার পরিমাণ "কমাইয়া নামাইয়া আনিবার" প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৬ সালে ইঙ্গ-মার্কিন আর্থনীতিক চুক্তির একটা শর্ত্ত হিসাবে এই বিষয়ে ইংরেজ ও মার্কিনদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়।

ইহার উপর, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ভারতের ডলার মজুত পর্য্যন্ত পকেটজাত করিয়া ফেলেন। যুদ্ধের সময় "ডলার পুল এগ্রিমেণ্ট" নামে একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তির শর্ত্ত অনুযায়ী "স্টার্লিং এলাকার" সকল দেশ মার্কিনদের নিকট জিনিসপত্র বিক্রয়াদি হইতে প্রাপ্য সমগ্র ডলার একত্র করিয়া সকলে সেই মজুত ভাগাভাগি করিয়া লইতে বাধ্য হইল। ভারত এবং অন্যান্য দেশ এই ডলার মজুতের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সরাসরি কিছু কিনিতে পারিত না। বৃটেনের গবর্নমেণ্ট কেবল যুদ্ধ সংক্রান্ত জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিতেন। এই মজুতের সঠিক পরিমাণও কেহ জানে না। ইহার পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন হিসাবপত্রের ভিতর প্রচুর প্রভেদ আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের হিসাবপত্র হইতে জানা যায় যে, ১৯৪২-৪৫ এই চার বছরের ভিতর, ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balance of trade) ভারতেরই অনুকূলে ছিল। এই অনুকূল ভারসাম্যের পরিমাণ হইল ৪২১০ লক্ষ ডলার। মিঃ মানু সুবেদার বলিয়াছেন যে, ১১৪ কোটি টাকা মূল্যের ডলার এখনও ভারতের জমার খাতায় রহিয়াছে। "ইস্টার্ন ইকনমিস্ট" পত্রিকায় (৮ই মার্চ, ১৯৪৬) প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায় যে, "সাম্রাজ্যিক ডলার পুলে" ভারত অন্ততঃ ৯০ কোটি ডলার দিয়াছে। অবশ্য ভারত গবর্নমেণ্টের অর্থসচিবের মতে ভারত ১৯৪৫ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যিক "ডলার পুলে" মাত্র ৪৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিয়াছে।

কাজেই ১৯৪৫ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত একশত কোটি হইতে দুইশত কোটি টাকার মধ্যে যে কোন পরিমাণ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পরও উহা বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভারতের শিল্প বিস্তারকল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য এই টাকা যাহাতে ব্যবহার করা না যায়, সেজন্য উহা সাফল্যের সহিত দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। এমন কি আজও পর্য্যন্ত উহা ভারতের

ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। এদিকে ১৯৪৬ সালের বাজেট বক্তৃতাতেও অর্থসচিব ভারতের জনসাধারণকে এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে ছাড়েন নাই যে, "ডলার পুল" রাখাটা ভারতের জনসাধারণের স্বার্থেরই অনুকুলে।

ক্রমেই অধিকতর সংখ্যক নোট বাজারে ছড়াইয়া দেওয়াই ছিল সাম্রাজ্যবাদী সমর-অর্থনীতির রীতি। ফলে ভারতের অর্থনীতির উপর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যুদ্ধের পর দেখা গেল যে, ভারতের দারিদ্র্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। আর্থনীতিক দিক দিয়াও সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এবং যুদ্ধের প্রকৃত বোঝাটা চাপিয়াছে দেশের উপবাসক্লিষ্ট জনসাধারণের ঘাড়ে।

কি পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

চলতি নোটের মোট পরিমাণ

	(লক্ষ টাকার হিসাবে)
আগস্ট—১৯৩৯	১৭৮৮৯
১৯৩৯—৪০	২০৯২২
১৯৪০—৪১	২৪১৪১
১৯৪১—৪২	৩০৭৬৮
১৯৪২—৪৩	৫১৩৪৪
১৯৪৩—৪৪	৭৭৭১৭
১৯৪৪—৪৫	৯৬৮৬৯
১৯৪৫—৪৬	১১৬২৬৪
২৮শে জুন, ১৯৪৬	১২৩৭৮৪

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট হইতে গৃহীত উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যে যুদ্ধের বছরগুলিতে বাজারে প্রায় ছয়শত গুণ অধিক নোট ছাড়িয়া দেওয়া হয় (এই কাজ এখনও চলিতেছে)। অথচ ১৯৩৯-৪০ সালে যে-ক্ষেত্রে শিল্পের কর্ম্মতৎপরতার সূচক-সংখ্যা ছিল ১১৪·০ যুদ্ধের সময়ে সে-ক্ষেত্রে (১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসেই) উহা সবচেয়ে বেশী বাড়িয়া মাত্র ১৩২·৫ দাঁড়ায়।

এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে শিল্পপতিরা এবং যুদ্ধের ঠিকাদাররা প্রচুর মুনাফা লুটিয়াছেন।

বস্ত্রশিল্পের মুনাফার কথা ধরা যাক। এই শিল্পে সারা ভারতে মোট কত মুনাফা হইয়াছিল সে সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া না গেলেও, বোম্বাইয়ের মিল-

মালিকদের লাভের হিসাব হইতেই একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যায়। ১৯৪১ সালে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলি মোট ৬ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মুনাফা করে। ইহা ১৯৪৪ সালের মুনাফা হইতে শতকরা ১২৮৮ গুণ বেশী। বোম্বাইয়ের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কাপড়ের কলের মুনাফা ১৯৪০ সালের মুনাফা হইতে শতকরা ২২৫০ গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। (ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট—"আওয়ার ইকনমিক প্রবলেম", ১৯৪৫, পৃঃ ৭২০)। বোম্বাইয়ের ১৫টি বড় বড় কাপড়ের কল ১৯৪০ সালে মোট ৯০ লক্ষ টাকা মুনাফা করিয়াছিল। ১৯৪১ সালে উহাদের মুনাফা হয় ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, ১৯৪২ সালে মোট ৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকা, ১৯৪৩ সালে মোট ১৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, এবং ১৯৪৪ সালে মোট ১৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। (এইচ. টি. পারেখ—"কমার্স" পত্রিকা, ৭ই জুলাই, ১৯৪৫)।

শ্রীপ্রেম সাগর গুপ্তের হিসাব মত, বোম্বাই দ্বীপে অবস্থিত ৬১টি কাপড়ের কলের আদায়ীকৃত মূলধন হইতেছে ১৯৩৯ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের পাঁচ বৎসরে ইহারা ঐ টাকার প্রায় সাড়ে ছয় গুণ মুনাফা করে। এই বছরগুলির বাৎসরিক গড়পড়তা মুনাফার পরিমাণ ১৯৩৯ সালের মুনাফার ছাব্বিশ গুণ।*

বিভিন্ন শিল্পের মুনাফার সূচক-সংখ্যার ভিতর এই একই ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

গড়পড়তা নীট মুনাফার সূচক সংখ্যা

(১৯৩৯ সালের হিসাবকে ১০০ ধরা হইয়াছে)

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩
পাট	১০০	৫৯০	৬১৭	৮৯৬	৯২৬
তুলা	১০০	৭৩	২০৫	৩১৩	৬৪৫
চা	১০০	১১৮	২১৪	২৫২	৩৯২
চিনি	১০০	১৪৩	১২২	১৬০	২১৮
কয়লা	১০০	৮৮	১০৭	৯৫	১২৪
ইঞ্জিনিয়ারিং	১০০	১১৫	১৮০	৩৬	২২৫
বিবিধ	১০০	১০৪	৩২৬	৩৯৪	৪০১
পাঁচ মিশালি	১০০	১২৭	২৮২	২৫৯	৩২৭

(এম. এইচ. গোপাল : "১৯৩৯ হইতে শিল্পের মুনাফা" ইস্টার্ন ইকনমিস্ট ১২ই মে, ১৯৪৪, পৃঃ ৭৩০)

* এখানে কাজ চালু রাখা বাবদ খরচা, এজেন্টদের কমিশন ও পারিশ্রমিক বাদ দিয়া এবং ক্ষয়ক্ষতি ধরিয়া নীট মুনাফার হিসাব করা হইয়াছে।

এমন কি ভারত গবর্নমেণ্টের আর্থনীতিক উপদেষ্টা কর্ত্তৃক প্রদত্ত মুনাফার সরকারী হিসাবেও ব্যাপারটা স্পষ্টতঃই কম করিয়া দেখান হইয়াছে। উহাতে কেবলমাত্র ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এদিকে ১৯৪৩ সাল হইতেছে সবচেয়ে বেশী মুদ্রাস্ফীতির বছর—সুতরাং সবচেয়ে বেশী মুনাফারও বছর।

মুনাফার সূচক-সংখ্যা

(১৯২৮ সাল=১০০ এই ভিত্তিতে)

	১৯৩৯	১৯৪২
তুলা	১৫৪·৬	৭৬০·৭
পাট	১৩·৬	৪৯·২
চা	৯৬·২	২১৯·৫
কয়লা	১৩৯·১	১১০·৩
চিনি	১৭৯·৪	২১৯·৮
লৌহ এবং ইস্পাত	২৮৯·৩	৪০৩·৩
কাগজ	১৫১·৮	৪৮৮·৪
সকল শিল্প জড়াইয়া	৭২·৪	১৬৯·৪

এই ধরনের মুনাফা বৃদ্ধিতে শ্রমিক ও কৃষকেরা অবর্ণনীয় কষ্ট ও দুর্দ্দশায় পড়িলেন। দীর্ঘ ছয় বছর ধরিয়া ভারতের জনসাধারণকে বিভিন্ন উপায়ে মজুরি হ্রাস, খাদ্য এবং বস্ত্রের অভাব, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ এবং দুঃস্থতা সহিয়া যাইতে হইয়াছে। ভারত গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী দরের সূচক-সংখ্যার তথ্য হইতে দেখা যায় যে, উহা ১৯৩৯ সালের আগস্টের ১০০ হইতে বাড়িয়া ১৯৪১ সালের আগস্টে উঠে ১২২·৯ পর্য্যন্ত। ১৯৪২ সালের আগস্টে উহা বাড়িয়া হয় ১৬১·২ এবং ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে দাঁড়ায় ৩০০·২। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে উহা কমিয়া ২৩৩·০ হইয়াছে দেখান হয়; কিন্তু এই হ্রাসের প্রধান কারণ হইতেছে, বাজার দরের চেয়ে জিনিসপত্রের কণ্ট্রোল দর কম ধরা হইয়াছিল। ইহার পর সূচক-সংখ্যা অল্পই উঠিয়াছে নামিয়াছে। (১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের সূচক-সংখ্যা ছিল ২৩৮·৮)। আসলে জিনিসপত্রের দর আরও অনেক বেশী উঠিয়াছিল, কারণ কণ্ট্রোল দরে জিনিস খুব কমই পাওয়া যাইত। কাজেই চোরাবাজার সারা দেশে একটা স্বাভাবিক কাজ-কারবারের বাধা হইয়া দাঁড়াইল।

খুচরা দর আরও বেশী উঠে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বোম্বাইয়ে এক পাউণ্ড (প্রায় অর্দ্ধসের) দুধের দাম দুই আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বিলাতি বেগুনের দর দুই আনা পাউণ্ড হইতে দশ আনা পাউণ্ডে চড়িয়া যায়। আলুর দর এক আনা পাউণ্ড হইতে চার আনা পাউণ্ডে দাঁড়ায়। যুক্তপ্রদেশে গম খুবই উৎপন্ন হয়। এখানে যুদ্ধের পূর্ব্বে গমের দর ছিল চার টাকা মণ। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে উহা হয় আঠার টাকা মণ। যুদ্ধের পূর্ব্বে আট আউন্স ওজনের একখানা পাঁউরুটির দর ছিল এক আনা। পরে ছয় আউন্স ওজনের একখানা রুটির দাম দাঁড়ায় দশ পয়সা।

যুদ্ধের পূর্ব্বে এক পাউণ্ড ওজনের ড্রিলের দাম ছিল সাত আনা; ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে তাহা বাড়িয়া হয় দুই টাকা দশ আনা। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের সূচক-সংখ্যা ছিল ৯৩, ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উহা বাড়িয়া হয় ৫৩০।*

শ্রমিকশ্রেণীর জীবন ধারণের খরচপত্রের সূচক সংখ্যার কথা ধরা যাক। এই সূচক হিসাব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কণ্ট্রোল দর অনুপাতে করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ে উহা ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসের ১০০ হইতে ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে ২৩৮এ আসিয়া ঠেকে; ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে কমিয়া হয় ২১৪, আবার ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে বাড়িয়া ২৫৫ পর্য্যন্ত উঠে। আমেদাবাদের বেলায় উহা ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে হয় ৩২৯। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে এখানে সূচক-সংখ্যা ছিল ২৯৭।

কিন্তু দরদাম বাড়িয়া গেলেও শ্রমিকদের আয় বাড়িয়াছে খুবই কম। সমস্ত শিল্পের মালিকরাই জীবন ধারণের খরচপত্র বৃদ্ধির অনুপাতে মাগগী ভাতা দিতে অস্বীকার করেন। ভারত গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহাদের মাসিক "ইণ্ডিয়ান লেবর গেজেটে" প্রদত্ত হিসাব নির্ভরযোগ্য না হইলেও তাহা হইতেই দেখা যায় যে ১৯৪৪ সালে বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকদের মোট বাৎসরিক আয় শতকরা একশত ভাগের অল্প কিছু বেশী বাড়িয়াছে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে শতকরা একশত ভাগের কম বাড়িয়াছে, গবর্নমেণ্টের যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের ফ্যাক্টরীগুলিতে বাড়িয়াছে শতকরা ৫০ ভাগ এবং খনির মজুরদের বাড়িয়াছে শতকরা মাত্র ২০ভাগ।

* "ইণ্ডিয়াজ পোস্ট-ওয়ার রিকনষ্ট্রাকশন এণ্ড ইট্স ইণ্টারন্যাশনাল আসপেক্টস" পি. এস. লোকনাথন, ১৯৪৬, পৃঃ ৩১

শ্রমিকদের পূর্ব্বের স্বাভাবিক মজুরীতে যে তাহাদের উপবাসে কাটাইতে হইত একথা স্মরণ রাখিলে "রিয়েল ওয়েজ" বা প্রকৃত মজুরি যে কত ভয়াবহ ভাবে কমিয়া গিয়াছে তাহা বুঝা যায়।

আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, গ্রামের মানুষের অবস্থাও ইহার চেয়ে কিছু ভাল ছিল না।

কাজেই ভারতের অর্থনীতির প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিকূল মনোভাবের ফলে ভারত যুদ্ধের ভিতর হইতে পূর্ব্বের চেয়ে দরিদ্র হইয়াই বাহির হইয়া আসে। সাম্রাজ্যবাদীদের মনোগত অভিপ্রায় ছিল যে, সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের মত উন্নতিলাভ না করিয়া ভারত পশ্চাদপদ ঔপনিবেশিক দেশ হইয়াই পড়িয়াই থাক। কাজেই ভারতের অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবার সুযোগটাই যে কেবল নষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। যুদ্ধের চাপের ফলে ভারত আজ শিল্পক্ষেত্রেও এক ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে।

৮। ব্যাঙ্ক-পুঁজি এবং নূতন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা

এ পর্য্যন্ত বৃটিশ শাসকদের সকল শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ভিত্তি হইল ভারতে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা এবং উহাকে আরও জোরাল করিয়া তোলা। ১৯৪৬ সালে বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের শেষ রোয়েদাদ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের স্বাধীনতা সৌধের বাহিরের পারিপাট্যের আড়ালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখনও তাহার আর্থনীতিক আধিপত্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। বৃটিশ মূলধনের স্বার্থে ভারতের শিল্পোন্নতি বন্ধ করিবার চিরাচরিত নীতি যুদ্ধোত্তর কালেও অব্যাহত রাখা হইতেছে। এবার কিন্তু উহার রূপ হইল স্বতন্ত্র। ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে একজোট হইয়া বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহে ইঙ্গ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রতিষ্ঠার ভিতরই উহার বিশিষ্ট রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৩ ধারা হইতে ১২১ ধারায় ভারতে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের কয়েকটি আর্থনীতিক "রক্ষাকবচ" আছে। এই সব শর্ত্তের সাহায্যে অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারতম্যমূলক ব্যবহার বন্ধ করিবার নামে বৃটিশ গবর্নরদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়। ভারতীয় মন্ত্রিসভাগুলি বৃটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি আনুকূল্য

প্রদর্শন করিলে এই ক্ষমতা বলে তাঁহাদের সে সব কাজ গবর্নররা রোধ করিতে পারিতেন।

কিন্তু এখন বৃটিশ পুঁজির প্রতি এই ধরনের প্রকাশ্য আনুকুল্য প্রদর্শন আর সম্ভব নহে। এই সব "রক্ষাকবচ" উঠাইয়া দিবার দাবী বহুদিন হইল অপ্রতি-রোধ্য গতিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মিঃ মানু সুবেদার কর্তৃক কেন্দ্রীয় পরিষদে উত্থাপিত প্রস্তাব ১৯৪৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে পরিষদ বিনা ডিভিসনে পাস করিয়া ভারত শাসন আইন হইতে এই সব ধারা উঠাইয়া দিবার দাবী করেন। ১৯৪৫ সালের ২রা মার্চ্চ প্রস্তাব উত্থাপন কালে মিঃ সুবেদার বলিয়াছিলেন :

> "এদেশে ইওরোপীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যে অতিরিক্ত আঞ্চলিক অধিকার চাহিয়াছে, বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্য কোন দেশের আইনে তাহার তুলনা মিলিবে না।"

তাহার উপর যুদ্ধ একটা সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াই দিয়াছিল। ভারতের ঘাড়ে সমগ্র যুদ্ধের সমস্ত বোঝাটা চাপাইয়া দেওয়ার মতলবেই যুদ্ধকালীন অর্থনীতির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। এখন সেই নীতি কাজে পরিণত করার ফলেই এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে সাম্রাজ্যবাদ আর শিল্পবিস্তারের দাবী সরাসরি ভাবে আগেকার মত অগ্রাহ্য করিয়া ভারতের শিল্পোন্নতির গতি একেবারে রোধ করিতে পারিল না।

ভারতের শিল্পপতিরা আজ পূর্ব্বের চেয়ে ঢের শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। যুদ্ধের আমলে প্রচুর মুনাফা পাওয়ার ফলে, তাঁহাদের হাতে অনেক মূলধন জমিয়া গিয়াছে ; সে টাকা তাঁহারা অবিলম্বে খাটাইতে চাহেন। কাজেই শিল্পোন্নতির দাবী আজ খুবই জোরদার হইয়া উঠিয়াছে।

এই মূলধন পাওয়ার জন্য আজ ভারতীয় শিল্পপতিদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়াছে ; তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের পায়ের নীচের মাটি শক্ত। তাঁহারা ইতিমধ্যেই ভারতের জন্য স্বাধীন, অন্য নিরপেক্ষ আর্থনীতিক পরিকল্পনার কথা ভাবিতে শুরু করিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে কয়েকটি বেসরকারী পরিকল্পনা উপস্থাপিত হইয়াছে। ভারতের বড় বড় শিল্পপতিরাও নিজেদের পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। ইহার নাম "ভারতের আর্থনীতিক উন্নতির পরিকল্পনা।" সাধারণতঃ ইহা বোম্বাই পরিকল্পনা বলিয়া পরিচিত। এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করিয়া তাঁহারা পনের বছরের ভিতর

দেশের লোকের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করিতে চাহেন। এই পরিকল্পনা যতই প্রতিক্রিয়াশীল হোক না কেন, শিল্পোন্নতির জন্য দৃঢ় অপ্রতিরোধ্য দাবী ইহাতে অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য ইহা সারা দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া, হাতে যথোপযুক্ত মূলধন আছে বলিয়া, ভারতীয় শিল্পপতিরা আজ বৃটেনের তোয়াক্কা না রাখিয়া, সাহায্যের জন্য নিজেরাই আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের দিকে চাহিতেছেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সব পরিবর্ত্তন অস্বীকার করিতে পারে না। কমন্স সভায় বিতর্ক প্রসঙ্গে রক্ষণশীল সদস্য ও রয়্যাল সোসাইটির সেক্রেটারী স্যার এ. ভি. হিল বলেন :

"আমরা সাহস, বদান্যতা এবং দূরদৃষ্টি দেখাইলে ভারতের শিল্পের সহিত সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা এইসব গুণ না দেখাইলেও ভারতের শিল্প যে উন্নতি লাভ না করিবে তাহা নহে, ভারতীয়রা সাহায্যের জন্য তখন আমাদের দিকে না চাহিয়া মার্কিনদের দিকে চাহিবে।"

(ইণ্ডিয়ান এন্যুয়াল রেজিস্টার, ১৯৪৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২)

কাজেই এই সব নূতন পরিস্থিতি দেখিয়া, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রতি তাহার বিরোধিতার ভাব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন যুগের সহিত সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে যতটা খাপ খাওয়াইয়া লইতেছে, আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও তাহার চেয়ে কিছু কম করিতেছে না। এখন কেবল ভারতের বুর্জোয়াদের সহিত আপোস করিয়াই ভারতে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থকে বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে; এখন বাহির হইতে নহে, ভিতর হইতেই কেবল ভারতের শিল্প বিস্তারের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। কেবল ভারতের একচেটিয়া ব্যবসাদারদের সাহায্যেই এখন ভারতকে বৃটিশ পণ্যের সুরক্ষিত বাজার হিসাবে বজায় রাখা সম্ভব। কাজেই ভারতকে অতি প্রয়োজনীয় 'টেকনিক্যাল' সাহায্য দিবার অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদ তাহার আর্থনীতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করিয়া রাখিবার জন্য নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। সে কৌশল হইল ভারতের শিল্পপতিদের অংশীদার করিয়া লওয়া। সাম্রাজ্যবাদ এখন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সমস্বার্থের নূতন মতবাদ প্রচার করিতেছে। কিন্তু আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, সকল সাম্প্রতিক ঘোষণা এবং পরিস্থিতির ভিতর হইতেই একটি মূল তথ্য সুস্পষ্ট রূপে

বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহা হইল এই যে, এই যৌথ অংশীদারীর সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদ ভারত না ছাড়িয়া বরং ভারতের উপর তাহার আর্থনীতিক আধিপত্য আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতেছে। ভারতের স্বাধীন আর্থনীতিক উন্নতি হইতে না দিয়া, এই সব চুক্তির দ্বারা ভিতর হইতেই ভারতের শিল্পোন্নতির সর্ব্বনাশ সাধনের পরিকল্পনা চলিতেছে।

নূতন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রাক্তন অর্থসচিব স্যার আর্চিবল্ড রাওল্যাণ্ডস ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে বলেন যে, দুইটি দেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সম্পর্ক যাহাই হোক না কেন, শিল্প, বাণিজ্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব্বের চেয়ে বাঁধন শক্ত করিয়া দেওয়াই "উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হইবে।" (কমার্স, বোম্বাই, ৮ই জুন, ১৯৪৬)

লর্ড ওয়েভেল অবশ্য একটা বেশ খোলাখুলি ধরনের বিবৃতি দেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে সব "বাণিজ্যিক রক্ষা কবচ" আছে তাহা যে বাতিল করা হইবে না—বৃটিশ আর্থনীতিক স্বার্থকে এই আশ্বাস দিতে গিয়া তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে পূর্ণ নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে বৃটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে অংশীদারীর বন্ধনই বাঞ্ছনীয়। ১৯৪৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড ওয়েভেল বলেন :

> "যতদিন না শাসনতান্ত্রিক আইন সাধারণভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং গ্রেট বৃটেন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি হইতেছে ততদিন ভারত শাসন আইনের রক্ষাকবচের ধারাগুলি একেবারে উঠাইয়া দিবার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু যতদূর সম্ভব নিজেদের মূলধন এবং পরিচালনা দ্বারা মৌলিক শিল্পগুলির উন্নতি সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ভারতীয়দের স্বাভাবিক ইচ্ছা ভারত গভর্নমেণ্ট অবগত আছেন, তাঁহারা উহা উপেক্ষাও করিবেন না। আমার অবশ্য মনে হয় যে, বৃটিশ এবং ভারতীয় বাণিজ্য উভয়েরই নিকট শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ আইনের ধারাগুলির চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়, এবং এই ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে উভয়েরই স্বার্থের প্রকৃত রক্ষাকবচ হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, একটা শুভেচ্ছামূলক আবহাওয়ার ভিতর বৃটিশ ও ভারতীয় বাণিজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতাই সর্ব্বাপেক্ষা

দ্রুতগতিতে এবং ফলপ্রদভাবে ভারতের শিল্পোন্নতির পথ সুগম করিয়া দিবে।"

(টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

ইহা যে কেবল পারস্পরিক সহযোগিতার একটা পরহিতৈষণামূলক যুক্তি, একথা পাছে কেহ ভাবিয়া বসে, এইজন্য বৃটিশ পুঁজিবাদের অন্যান্য সুনির্দিষ্ট দাবীগুলিও অন্যান্য কয়েকজন মুখপাত্র কর্তৃক উপস্থাপিত হইল।

ভারতে বৃটিশ পুঁজির মুখপত্র "ক্যাপিটাল" ১৯৪৫ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে লিখিলেন :

"এখন বা পরে কোন সময়েই দেশ হইতে বৃটিশ বাণিজ্যের সরিয়া পড়িবার কোন ইচ্ছাই নাই। ভবিষ্যতে বৃটিশ বাণিজ্যকে অপ্রধান ভূমিকা দেওয়া হইবে বলিয়া অনেকের মনে হইলেও, যে দেশের সমৃদ্ধির জন্য বৃটিশ ব্যবসায়ীরা চিরস্থায়ী সাহায্য করিয়াছে, ঢাক ঢোল বাজাইয়া সেই দেশ হইতে বিদায়ের ব্যবস্থায় তাহারা সম্মতি দিতে পারে না।"

এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের সভাপতি স্যার রেনউইক হ্যাডো ১৯৪৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বলেন :

"বৃটেনে এমন অনেক শিল্পপতি আছেন, যাঁহারা ভালো ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি পাইলে ভারতে কলকারখানা তৈয়ার করিতে প্রস্তুত আছেন। তাহাতে দেশের স্থায়ী উপকার হইবে। কিন্তু অপর কেহ যে তাঁহাদের টাকা অধিকার করিয়া লইয়া খরচ করিবে, সেজন্য তাঁহারা টাকা ঢালিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছুক নহেন। বৃটেন যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞ দিবে অথচ নূতন ব্যবসায় খুলিবার জন্য পুরাতন যে ব্যবসায়গুলি আছে সেগুলি পরিচালনার জন্য ভারতে বৃটিশদের আনয়নে বৃটিশ সম্প্রদায়কে নিরুৎসাহিত করা হইবে, এমন একতরফা যুক্তি হইতে পারে না।"

(টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

রয়্যাল সোসাইটির সেক্রেটারি স্যার এ. ভি. হিল আরও স্পষ্ট ভাষায় বৃটিশ দাবী খুলিয়া বলেন :

"তাহাদের (ভারতীয়দের) অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, বৃটিশ ব্যবসায় শুধু ভালবাসার খাতিরেই এসব করিতে যাইতেছে না। যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বৃটিশ শিল্পের হাত অতি অল্পই থাকিবে, তাহা দক্ষতা এবং সম্পদ ব্যয় করিয়া বৃটিশরা গড়িয়া তুলিবে এ আশা ভারতীয়রা

করিতে পারে না। তাহারা যদি উন্নতিই করিতে চায়, তবে এদেশের লোককে তাহাদের আধাআধি বখরা দিতেই হইবে। আধাআধি বখরার কথাটা বেশ ন্যায্য প্রস্তাব বলিয়াই মনে হয়। ”

(ভারত জ্যোতি, ১লা এপ্রিল, ১৯৪৬)

বৃটিশ ব্যবসায়ীদের জোর করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অংশীদার করাইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের শাসক হিসাবে তাহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতেছে। যুদ্ধের ভিতর প্রচুর মুনাফা লুটিয়া ভারতীয় শিল্পপতিরা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিলেও, বৃটিশ পুঁজিওয়ালারাই এখন মাতব্বরি চালাইয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাহাদের হাতে; যন্ত্রপাতি আমদানী নিয়ন্ত্রণও তাহারাই করে, ভারতের স্টার্লিং ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণও তাহারাই করিয়া থাকে। সকল রকমের প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়া ভারতের বাজার তাহারা ভাসাইয়া দিতে পারে * এবং সে চেষ্টা তাহারা ইতিমধ্যেই করিতেছে। এই বিশেষ সুবিধার সুযোগ লইয়াই, তাহারা ভারতীয় শিল্পপতিদের দিয়া একটা রফা করাইতে চাহিতেছে।

ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলের প্রাক্তন বৃটিশ ট্রেড কমিশনার স্যার টি. এইন্‌স্‌কাফ বৃটিশ পুঁজিপতিদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সুবিধা কোথায় সে কথা খুলাখুলি ভাবেই আলোচনা করেন।

“...ভারতের ব্যবসায়ে আমাদের অতুলনীয় অভিজ্ঞতা এবং দেশের বিশেষ প্রয়োজন, বাজারে আমাদের কায়েমী স্বার্থ, ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন সংযোগ-ব্যবস্থা এবং আমাদের সুনাম এইসব পুরাপুরি বিচার করিয়া দেখিলে এবং তাহার সহিত **খাতক হিসাবে** আমাদের **বর্ত্তমান অবস্থাজনিত সুবিধা যোগ করিলে,** ভারত যে আবার আমাদের রফ্‌তানীর সবচেয়ে বড় বাজার হইয়া উঠিবে সে আশা করা নিশ্চয়ই বেশী কিছু নহে।”

(বোম্বে ক্রনিকেল, ৫ই মার্চ, ১৯৪৫)

* যুদ্ধের শেষাশেষি গবর্নমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদত্ত যুদ্ধের কণ্ট্রাক্ট ধীরে ধীরে গুটাইয়া লইবার সিদ্ধান্ত এবং বৃটেনে যুদ্ধের অর্ডার দেওয়া। ১৯৪৫ সালে যে হায়দারি-মিশন ইংলণ্ডে গিয়াছিল. তাহা ১৯৪৫ সালে ২০৬০ লক্ষ টাকার এবং ১৯৪৬ সালে ৪৮০০ লক্ষ টাকার বৃটিশ পণ্য আমদানীর ব্যবস্থা করে। প্রধানত: প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য জিনিসের জন্যই অর্ডার দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যেই বৃটিশ ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে কয়েকটি আদানপ্রদান হইয়া গিয়াছে।

১৯৪৫ সালের জুন মাসে ভারতের সর্ব্ববৃহৎ একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠান বিড়লা ব্রাদার্স এবং ইংলণ্ডের ন্যাফিল্ড প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারতে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ সম্পর্কিত এক চুক্তি হয়। এক শ্রেণীর সংবাদ-পত্রে বিড়লা-ন্যাফিল্ড চুক্তির যেটুকু সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে (আসল শর্ত্তাদি প্রকাশিত হয় নাই) তাহাতে জানা যায় যে, চুক্তি অনুযায়ী ভারতে এক যুক্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার মূলধনের শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগ ন্যাফিল্ডদের হাতে থাকিবে, মুনাফার ন্যায্য ভাগও তাঁহারা পাইবেন, পেটেণ্ট ইত্যাদি বাবদ রয়ালটিও তাঁহাদের প্রাপ্য থাকিবে। "ভারতে যন্ত্রপাতির যে সব অংশ সুলভ মূল্যে তৈয়ারী করা যায় না" ন্যাফিল্ড প্রতিষ্ঠান তাহা তৈয়ার করিয়া দিবেন "এবং কি জিনিস ভারতে এবং কি-ই বা বৃটেনে তৈয়ার হইবে, মনে হয়, তাহা ন্যাফিল্ডের বিশেষজ্ঞরাই স্থির করিবেন।"

(ক্যাপিটাল, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৪৬)

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের একটি বড় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান টাটা এবং বৃটেনের বৃহত্তম একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ইম্পিরীয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজের (আই. সি. আই.) মধ্যে ভারতে গুরু রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠাকল্পে এই ধরনের আর একটি চুক্তি হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ দেখিয়া মনে হয় যে, মূলধনের শতকরা ২৪ ভাগ দিবেন আই. সি. আই. এবং বাকিটার বেশীর ভাগই টাটার থাকিবে; ইহার উপর "দেশের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যতদিন না দেশেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জিনিস তৈয়ার হইতেছে, ততদিন এদেশের মার্কা দেওয়া রংয়ের মালমশলা এবং আই. সি. আই. কর্ত্তৃক আমদানী করা জিনিস এক সঙ্গেই বিক্রয় করা হইবে।" (এ-পি-আই কর্ত্তৃক পরিবেশিত সংবাদ, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫)। এই সময়টা পনের হইতে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে বলিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় এবং বৃটিশ ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই ধরনের আরও অনেক চুক্তি সম্পাদিত হইতেছে।

ভারতের বড় এবং মাঝারি দরের ব্যবসায়ের সঙ্গে এই ধরনের চুক্তি ছাড়া, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বৈরতান্ত্রিক দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাহাদের ভবিষ্যৎ আর্থনীতিক ঘাঁটি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য পরিকল্পনা করিতেছে।

দেশীয় রাজাদের শাসনব্যবস্থা ইহাতে অংশ গ্রহণ করুক বা না করুক, তাহারা দেশীয় রাজ্যগুলিতে ক্রমেই বেশী মূলধন পাঠাইতে চাহে। ১লা এপ্রিলে প্রকাশিত শিল্পনীতি সম্পর্কিত বিবৃতিতে ভারত গবর্নমেণ্ট দেশীয় রাজ্যগুলির শিল্পোন্নতির বিশেষ ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে :

> "ইহাও সমান স্পষ্ট যে লাইসেন্স ব্যবস্থার পরিচালনা এমন হইতেই হইবে যাহাতে দেশীয় রাজ্যগুলি আশ্বাস পায়, শিল্পোন্নতির জন্য তাহাদের বৈধ এবং স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত হইবে না।"

(হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

শিল্পোন্নতিকে ব্যাহত করিবার জন্য যে "লাইসেন্স" ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে উন্নতির পথগুলি নিয়ন্ত্রণ করা। এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল রাজাদের শাসনে বৃটিশ মূলধন সাদরে গৃহীত হইবে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের জন্য অধিক পরিমাণে লাইসেন্স এবং যন্ত্রপাতি দেওয়ার এই ব্যবস্থা।

ভারতে বৃটিশ পুঁজির মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' ১৯৪৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে খোলাখুলি ভাবেই বৃটিশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বলেন :

> "নিজেদের এলাকার মধ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে আকর্ষণ করিবার জন্য সকলেই (দেশীয় রাজ্যগুলি) উদ্‌গ্রীব; এবং বৃটিশ ভারতের অবস্থা এমনই খারাপ বলিয়া মনে হইতেছে যে, এখানে এমন সময় আসিবেই যখন নূতন শিল্প পরিকল্পনার রচয়িতারা রাজনৈতিক গণ্ডগোল এবং পার্টি ও ইউনিয়নের দাবীর ক্রমবর্দ্ধমান যোগাযোগ হইতে দেশীয় রাজ্যগুলির অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার ভিতর চলিয়া যাইতে প্রলুব্ধ হইবেন। শিল্পপতিদের ইচ্ছাটা এই যে, বাহিরের অবৈধ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারেন। তাঁহাদের পরিবেশ ও ঐতিহ্যের গুণে দেশীয় রাজারা শিল্পপতিদের এই ইচ্ছার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন বলিয়াই মনে হয়।"

দেশীয় রাজ্যের রাজারা এ আশ্বাস ইতিমধ্যেই দিয়াছে। পাতিয়ালা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী এবং বৃটেনে প্রেরিত দেশীয় রাজ্য শিল্প-প্রতিনিধি-দলের নেতা (এই প্রতিনিধি দল ভারতীয় শিল্পপতিদের দলের পর

বৃটেনে যান) মিঃ এইচ. এস, মালিক অংশীদারীর ভিত্তিতে উন্নত বিদেশী শিল্পপতিদের সহিত সহযোগিতা সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে অনুকুল মত প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ মালিক বলিয়াছেন :

"আমরা এটা বেশ বুঝি যে, যখন আপনারা ইংলণ্ড বা আমেরিকা হইতে একজন শিল্পপতিকে পাইলেন এবং এখানকার কোন শিল্পে তাঁহার কিছুটা ঝুঁকি বা দায়িত্ব আছেই—তা সে শতকরা ত্রিশ ভাগই হোক বা চল্লিশ ভাগই হোক—তখন তিনি সেই শিল্পের সাফল্য বিষয়ে নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত হইবেন। তাঁহাদের এইটুকু বিশ্বাস না করিয়া আপনারা যে কি করিয়া দক্ষ, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং উন্নত শিল্পপতিদের পূর্ণ সহযোগিতা আশা করিতে পারেন তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না।"

(টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৬)

ভারতীয় রাজন্য পরিষদের সেক্রেটারি মীর মকবুল আহ্‌মেদও 'এশিয়াটিক রিভিউ' নামক পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন :

"দেশীয় রাজ্যগুলির শিল্পোন্নতিতে ইঙ্গ-ভারত অংশীদারীর যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে।"

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, সাম্রাজ্যবাদ ভারতের মাটিতে আরও দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়া ভারতে বৃটিশ ব্যাঙ্ক-পুঁজির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত ও নিরাপদ করিতে চাহিতেছে। ভারতীয় শিল্পপতিদের সহিত আপোসের দ্বারা এমন ব্যবস্থা করা হইতেছে যাহাতে ভারতে বৃটিশ স্বার্থ সর্ব্বদাই নিরাপদে থাকে। তাহাদেব প্রার্থিত ফল এখনই দেখা যাইতেছে। ভারতে বৃটিশ পুঁজি সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুঁজিপতি এবং ম্যাফিল্ড চুক্তির অন্যতম নায়ক মিঃ জি. ডি. বিড়লা বলিয়াছেন :

"ইহাকে যে কোন কালে স্বাধিকার ভ্রষ্ট করা হইবে ঐ কথা আমি মনে করি না। বৃটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি চলিতেই থাকিবে।"

(হিন্দুস্থান টাইম্‌স, ১১ই এপ্রিল, ১৯৪৬)

বর্ত্তমানে যে টাকা খাটিতেছে তাহা রক্ষা করার কথাই কেবল হইতেছে না; দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বৈরতান্ত্রিক রাজাদের শাসন জীয়াইয়া

রাখিয়া, সেখানে নূতন করিয়া বৃটিশ পুঁজি আনার পরিকল্পনাও চলিতেছে।

এই সব ব্যবস্থায় কোনদিন ভারতে শিল্প বিস্তার হইবে না। বিড়লা-ন্যুফিল্ড এবং টাটা-আই. সি. আই. এই দুইটি বড় বড় চুক্তি হইতে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ে অংশীদারীর ফলে ভারতে গুরুশিল্প কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইংলণ্ডেই তৈয়ারী হইতে থাকিবে এবং ভারতীয় ট্রেড মার্ক লাগাইয়া ভারতের জন সাধারণের কাছে উহা বিক্রয় করা হইবে। তেমনি আবার ভারত বৃটিশের তৈয়ারী কলকব্জা এক সঙ্গে জোড়াতাড়া দিবার ওয়ার্কশপে পরিণত হইবে। বিড়লা-ন্যুফিল্ড চুক্তি অনুযায়ী "ভারতে প্রস্তুত" মোটর গাড়ীর স্বরূপ "হিন্দুস্থান টেনের" মধ্যেই দেখা গিয়াছে। খুব ঢাক পিটাইয়া ইহাকে "ভারতে তৈয়ারী" বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু ইহার সকল জিনিসই আসলে মরিস কোম্পানীর। সেগুলি কেবল ভারতে একসঙ্গে জোড়া দিয়া সাজানো হয়।

গুরুশিল্প, গুরু রাসয়নিক দ্রব্যাদি, এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠায় যতদূর সম্ভব বাধা দিয়া উহা সীমাবদ্ধ করিবার এবং ভারতকে বৃটিশ পণ্যের বাজার হিসাবে বাঁধিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই এখনও এইসব আপোস করা হইতেছে। 'বোম্বে ক্রনিকেল' পত্রিকা ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেন যে, এই সব নূতন ব্যবসায়-ব্যবস্থার ফলে "একটা নূতন ধরনের কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি হইবে। দেশের শিল্পবিস্তারের পথে উহা হইবে এক বিরাট বাধা... এবং অবশেষে যখন জাতীয় গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন সেই গবর্নমেণ্টের পক্ষেও উহাকে প্রতিহত করা অত্যন্ত শক্ত হইয়া দাঁড়াইবে।"

১৯৪৫ সালে ভারতের এবং বৃটেনের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের ভিতর এই ধরনের বহু আর্থনীতিক চুক্তি হইতে আরম্ভ হয়। ১৯৪৬ সালে রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য যে শাসনতান্ত্রিক আলাপ আলোচনা চালান হইয়াছিল এই সব চুক্তি হইল তাহার পটভূমি।

৯। ভারতে সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম

মার্ক্‌স্‌ যখন বলেন যে, বৃটিশ শাসন ভারতে এক "সামাজিক বিপ্লব সাধন করিতেছে" এবং যখন তিনি ইংলণ্ডকে "সেই বিপ্লব সাধনের পথে ইতিহাসের জড় যন্ত্র" বলিয়া বর্ণনা করেন, তখন তাঁহার মনে ছিল দুইটি কথা। তাহার ব্যাখ্যা হইতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রথমতঃ, প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থার ধ্বংস।

দ্বিতীয়তঃ, নূতন সামাজিক ব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।

অবশ্য আজ পূর্ব্বতন কার্য্যক্রম হইতে উদ্ভূত, সাম্রাজ্যবাদের নূতন পর্য্যায়ের বৈশিষ্ট্য দ্বারা এই দুইটি জিনিস ঢাকা পড়িয়া গেলেও, উহারা এখনও সক্রিয় রহিয়াছে।

ধীরে ধীরে আধুনিক শিল্পের উন্নতির দ্বারা শিল্পে নিযোজিত শ্রমিকের ক্রমাগত সংখ্যা হ্রাস ভারসাম্য লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া শ্রমিকদের এই সংখ্যা হ্রাসের ভিতর প্রাচীন হস্ত-শিল্পের ধ্বংসই প্রতিফলিত হইতেছে। (যুদ্ধের সময় অবশ্য শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস সাময়িক ভাবে ব্যাহত হইয়াছিল)। প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতির ধ্বংস আজ যে স্ববিরোধী পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে, তাহা এক সাধারণ কৃষি-সঙ্কটের দিকেই ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার মার্ক্‌সের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, বৃটিশ শাসন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাস্তব ভিত্তি হইতে আধুনিক শিল্পের গোড়াপত্তন অতি ধীরগতিতে হইলেও, ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা ভারতের সমাজে উহা এক নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে। সেই শ্রেণী হইল আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের যুগের শ্রমিকশ্রেণী। ইহারাই ভবিষ্যৎ ভারতের নূতন সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টিশক্তির প্রতিনিধি।

কিন্তু এই কার্য্যক্রমের পূর্ণতর বিকাশের ফলে আজ একটা নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতে এমন কয়েকটি শক্তি উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা মার্ক্‌সের রচনাকালে বর্ত্তমান ছিল না। আজ ভারতের উৎপাদন-শক্তিকে ব্যাপক এবং নূতন ভাবে নব স্তরে উন্নীত করিবার সময় পূর্ণ হইয়াছে, এবং প্রতিবৎসরই ইহা অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। অন্যদিকে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব্বের ন্যায় পুঁজিবাদী আধিপত্যের বাস্তব বৈপ্লবিক ভূমিকায় আর কাজ করিতে পারিতেছে না। আগের, সেই বৈপ্লবিক ভূমিকা ছিল ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার দ্বারা নূতন উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং সেই উন্নতি

লাভের প্রাথমিক বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করা। তাহার বদলে, ভারতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ উৎপাদনশক্তির অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক আধিপত্যের সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহাদের উন্নতি প্রতিহত করিয়া দিতেছে। ভারতে পুঁজিবাদী শাসনের বাস্তব বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা আর বলা যাইতে পারে না। ভারতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল।

পুরাতন উন্নতিশীল পুঁজিবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতের প্রাচীন সমাজের কাঠামোর উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত হানিয়াছিল, প্রাচীন ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার যে সব প্রতিক্রিয়াশীল প্রথা ইত্যাদি টিকিয়াছিল, সচেতনভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পর্য্যন্ত পরিচালনা করিয়াছিল; একের পর এক রাজাদের নতি স্বীকার করাইয়া তাহাদের রাজ্য এক বাঁধনে বাঁধিয়া দিয়াছিল; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং ভাবধারা বিস্তারের গোড়াপত্তন করিয়াছিল; এমন কি কিছুকালের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নীতি পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিল। এই সময়ে ভারতীয় সমাজের প্রগতিশীল অংশ অর্থাৎ অভ্যুত্থানশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃটিশ শাসনকে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রচেষ্টার সহায়তা করিয়াছিলেন। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন রামমোহন রায়। ক্ষয়িষ্ণু প্রতি-ক্রিয়াশীল অংশ, অসন্তুষ্ট রাজারা এবং সামন্ততান্ত্রিক শক্তি সমষ্টিই ছিল বিরোধী দলের পুরোভাগে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে তাহাদের নেতৃত্ব পরিণতি লাভ করে এবং শেষও হয়। তখন শোষিত এবং অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায়ের মনোভাবকে ভাষা দিবার শক্তি কাহারও ছিল না, বিদ্রোহ কেবল পরাজয়েই পর্য্যবসিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ভারতে বৃটিশ শাসন তাহার নীতির রূপান্তর সাধন করিতে শুরু করিয়া দিল। ভারতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ তাহাদের হাতের পুতুল দেশীয় রাজ্যের রাজাদের পোষণ করিতেছে, তাহাদের রক্ষা করিতেছে; এবং ক্রমেই তাহাদের রাজনৈতিক ভূমিকার গুরুত্বটা বাড়াইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার শেষ অভিব্যক্তি মন্ত্রিমিশনের রোয়েদাদের ভিতরই দেখা যায়। ভারতের প্রগতিশীল জনমত ধর্ম্ম এবং সমাজব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল প্রথা ইত্যাদি সংস্কারের দাবী করিতেছে; সে দাবীর উত্তরে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ সযত্নে সেই সব প্রথাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে: (দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিবাহের বয়স এবং অস্পৃশ্যদের বিধিনিষেধ তুলিয়া দেওয়ার প্রশ্নের

কথা ধরা যাইতে পারে।) দমননীতির এক বিরাট জালে বক্তব্যের স্বাধীনতা এবং চিন্তাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; সমাজ, শিক্ষা এবং শিল্পের উন্নতির জন্য ভারতের বিপুল দাবী রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদ যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার প্রধান দুর্গ—একথা উপরোক্ত লক্ষণসমূহ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

সেইজন্য আধুনিক যুগে ভারতের সকল প্রগতিশীল শক্তিই এক শক্তিশালী বিদ্রোহী জাতীয় আন্দোলনের পতাকাতলে আসিয়া মিলিয়াছে। প্রতিক্রিয়ার প্রধান দুর্গ এবং ভারতের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই সেই আন্দোলন; এবং দেশের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষয়িষ্ণু এবং প্রতিক্রিয়াশীল অংশই আজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা অনুগত সমর্থক।

সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ কর্ত্তৃক রক্ষিত আর্থনীতিক কাঠামোর বাঁধনের বিরুদ্ধে ভারতের অভ্যুত্থানশীল উৎপাদন-শক্তি সংগ্রাম করিতেছে। এই সংগ্রাম কৃষি-সঙ্কটের ভিতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির দেউলিয়াপনা উহাতেই সূচিত হইতেছে; উহাই হইল অমোঘ পরিবর্ত্তনের প্রধান শক্তি। জারের রুশিয়ার শেষ বছরগুলিতে অথবা ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃষি-বিপ্লবের লক্ষণগুলি যেমন লক্ষ্য করা যাইত, আজ ভারতের আগামী কৃষি-বিপ্লবের লক্ষণগুলিও তেমনি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান কৃষি-বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত; এবং এখন ভারতের ইতিহাসে যে নূতন যুগ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, তাহার চাবিকাঠি হইতেছে এই দুইয়ের মিলন এবং সমন্বয়।

সেইজন্য ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থা এবং জাতীয় সংগ্রামের সমস্যাগুলি পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, উহা কৃষি-সমস্যার আলোচনা করিয়াই শুরু করিতে হইবে।

নির্দেশিকা

* পাদটিকা